ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-২

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

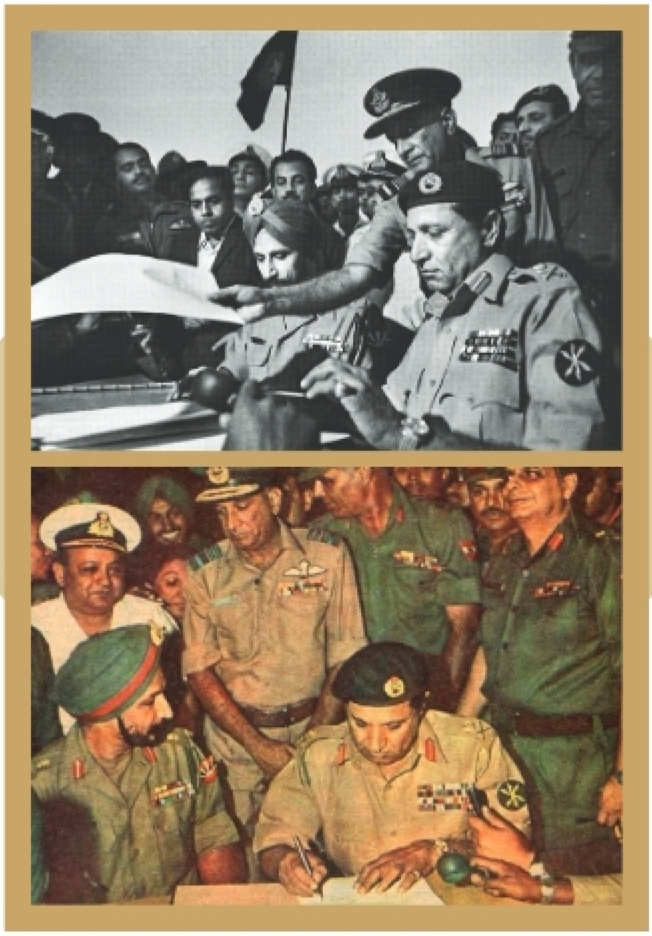

১৯৭১ সালে নভেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয় সম্পন্ন হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-২
Fruit and Vegetable Cultivation-2

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

প্রফেসর ড. জসিম উদ্দিন
ড. সৈয়দ নাসির উদ্দিন
ড. মো: সাহিনুল ইসলাম
ড. মোছা আখতার জাহান কাঁকন
মো: কবির হোসেন (প্যাডাগগ)
আবদুল্লা আল মাবুদ (সমন্বয়কারী)

সম্পাদক

প্রফেসর ড. ইমরুল কায়েস

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম প্রকাশ : , ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর , ২০২৩

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানবসম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনটিভিকিউএফ -এর আলোকে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ২৯টি ট্রেডের মধ্যে ১৩টি ট্রেডের ২৬টি পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টি ট্রেডের ৩২টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে কারিগরি শিক্ষায় সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে শ্রম বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র (নবম শ্রেণি)

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	কিউকারবিটেসি গোত্রের সবজি চাষ	১ - ৫৪
দ্বিতীয়	উচ্চ মূল্যের সবজি চাষ	৫৫ - ৮৬
তৃতীয়	ছাদে ফল ও সবজি চাষ	৮৭ - ৯৯
চতুর্থ	শিম, বরবটি ও ঢেঁড়স চাষ	১০০ - ১২৪
পঞ্চম	মাশরুম চাষ	১২৫ - ১৪৬

দ্বিতীয় পত্র (দশম শ্রেণি)

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	শরৎকালীন ফল চাষ	১৪৯ - ১৮২
দ্বিতীয়	হেমন্ত ও শীতকালীন ফল চাষ	১৮৩ - ২২২
তৃতীয়	উচ্চ মূল্যের ফলের চাষ	২২৩ - ২৬১
চতুর্থ	ফল ও শাকসবজি বিপণন	২৬২ - ২৭২

ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-২
Fruit and Vegetable Cultivation-2

প্রথম পত্র

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড: ৯৪১৪

প্রথম অধ্যায়
কিউকারবিটেসি গোত্রের সবজি চাষ
(Vegetable Cultivation of Cucurbitaceae Family)

আমরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৯০-১০০ গ্রাম বিভিন্ন শাকসবজি খেয়ে থাকি। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত শাকসবজির প্রায় ৬০-৭০% উৎপাদিত হয় রবি মৌসুমে, তাই এ মৌসুমে প্রচুর পরিমানে শাকসবজি বাজারে পাওয়া যায়। বাকী সবজি উৎপাদিত হয় খরিপ মৌসুমে বিধায় এ মৌসুমে শাকসবজির প্রাপ্যতা কম। আর খরিপ তথা গ্রীষ্ম-বর্ষাকাল জুড়ে চাষ করা হয় প্রধানত বিভিন্ন ধরনের কুমড়াগোত্রীয় বা কুমড়াজাতীয় ফসল (Cucurbit crop)। কিউকারবিটেসি গোত্রের (Cucurbitaceae Family) ফসলকে কুমড়া জাতীয় উদ্ভিদ বলা হয়। বাংলাদেশে অধিকাংশ কুমড়া জাতীয় সবজি বসতবাড়ির আঙিনাতে মাচায় অথবা ঘরের চালে জন্মানো হয়। এ জাতীয় সবজি নরম লতানো বর্ষজীবী এবং আরোহী। তাই স্বল্প জায়গায় চাষ করা সম্ভব। এ ফসলে আকর্ষির মাধ্যমে (Tendril) গাছ দ্রুত সামনে বা উপরের দিকে উঠতে সহায়তা দেয়। তাই নানা ধরনের ফল গাছ, বেড়া ও কাঠজাতীয় গাছে, পুকুর ও জলাশয়ের মাচায়/জাংলায়, রাস্তা ও বাঁধের প্রান্ত এবং আইলে এ সবজি চাষ হতে দেখা যায়।

এ জাতীয় সবজি শক্ত বাকলযুক্ত ফল এবং তরিতরকারি ও কাঁচা পাকা ফল হিসেবে খাওয়া হয়। খাদ্যমান ও ওজনের তুলনায় এ সবজি সস্তা ও সহজপ্রাপ্য। এর চাষ পদ্ধতি সহজ এবং বাড়তি পুঁজির প্রয়োজন হয় না। এ গোত্রের প্রায় ২০ রকমের সবজি রয়েছে। এ গোত্রের সবজির দলে আর যেসব ফল-সবজি অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেগুলির মধ্যে রয়েছে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শসা, করলা, চিচিঙ্গা, পটল, কাঁকরোল, তরমুজ, ফুটি বা বাংগি, খিরা, স্কোয়াশ এবং ঝিঙা। এসব সবজি অনাদিকাল থেকেই মানুষ আবাদ করছে। এ অধ্যায়ে এই গোত্রের ৭টি সবজির চাষ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো।

এই অধ্যায় শেষে-

- কিউকারবিটেসি গোত্রের লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শসা, করলা, চিচিঙ্গা, পটল ও কাঁকরোল সবজিগুলোর পুষ্টিগুণ ও ব্যবহার বলতে পারবে।
- উপরোক্ত সবজিগুলোর উৎপত্তিস্থল, উপযোগী জলবায়ু ও মাটি, বিভিন্ন জাত এবং সবজি চাষ মৌসুম সম্বন্ধে উল্লেখ করতে পারবে।
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে আধুনিক পদ্ধতিতে ৭টি সবজি যেমন- লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শসা, করলা, চিচিঙ্গা, পটল ও কাঁকরোল সবজিগুলোর চাষাবাদ এবং ফসলের আন্তঃপরিচর্যা করতে পারবে।
- উক্ত ফসলগুলো উপযুক্ত সময় ও পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

১.১ লাউ (Bottle gourd)

চিত্র: লাউ ক্ষেত

লাউ বাংলাদেশের মানুষের প্রিয় সবজিসমূহের একটি। বানিজ্যিক আবাদের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রায় পরিবারই বাড়ির আঙ্গিনা, এমনকি ছাদে এক/দুইটি লাউ গাছ লাগিয়ে থাকে। একই লাউ গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদাভাবে উৎপন্ন হয় ।

১.১.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

লাউয়ের পরিচিতি ও ব্যবহার: লাউ একটি জনপ্রিয় উপাদেয় সবজি। এটি প্রধানত: শীতকালীন ফসল। বর্তমানে এদেশে সারাবছরই লাউ হচ্ছে। লাউয়ের কচি ফল, কচি পাতা ও ডগা সবজি ও শাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি শরীর ঠান্ডা রাখে। কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর, হজমে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে। আমাদের প্রিয় নবী (স:) এ সবজি খেতে খুবই পছন্দ করতেন। এ দেশে লাউয়ের খোল দিয়ে বানানো একতারা একটি জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। মাছ ধরার জাল ভাসিয়ে রাখার জন্যও লাউয়ের শুকনো খোল ব্যবহার করা হয়।

বৈজ্ঞানিক নাম: প্রাচীনকালে লাউয়ের শুকনো খোলে বোতলের মতো মদ ও স্পিরিট রাখা হতো। এজন্য লাউয়ের ইংরেজি নাম হয়ে গেছে বটল গোর্ড (Bottle Gourd)। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Lagenaria siceraria*

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম লাউয়ে আছে কার্বোহাইড্রেট ২.৫ গ্রাম, প্রোটিন ০.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২০ মিগ্রা এবং ফসফরাস ১০ মিগ্রা ও পটাসিয়াম ৮৭ মিগ্রা। তবে কচি ডগা ও পাতার পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। এতে ফলিক এসিড, উচ্চ মাত্রার ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও আয়রন রয়েছে।

উৎপত্তি: লাউয়ের উৎপত্তি আফ্রিকা।

জলবায়ু ও মাটি: বাংলাদেশে শীতকাল লাউ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। দিনের বেলায় ২৫-২৮° সে. এবং রাতের বেলায় ১৮-২০° সে. লাউ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ বা এটেল দো-আঁশ মাটি লাউ চাষের জন্য উত্তম। লাউ চাষের জন্য মাটির উপযোগী p^H ৫.৫-৬.৮।

উৎপাদন মৌসুম: রবি ও খরিপ উভয় মৌসুম।

লাউ প্রধানত শীতকালিন সবজি। তবে ইদানিং সারাবছর লাউ উৎপাদন হয় এমন লাউয়ের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। লাউয়ের উদ্ভাবিত জাতগুলো হচ্ছে-

১। বারি লাউ-১

২। বারি লাউ-২

৩। বারি লাউ-৩

৪। বারি লাউ-৪

৫। বারি লাউ-৫

৬। বর্ষা হাইব্রিড

৭। ময়না (হাইব্রিড) ইত্যাদি

জাত পরিচিতি

বারি লাউ-১: সারা বছর চাষ করা যায়। লম্বাটে ও হালকা সবুজ রংয়ের। জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন। চারা রোপণের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল তোলা যায়। লাউ ২-৩ দিন পর পর সংগ্রহ করতে হয়।

চিত্র: বারি লাউ-১

বারি লাউ-২: এই লাউটি চালকুমড়া আকারের ও হালকা সবুজ রংয়ের। শীতকালে আগাম ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। জাতটি মূলত শীত মৌসুমের জন্য। লাউ কচি অবস্থায় সংগ্রহ করলে গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা এবং ফলন বেড়ে যায়। জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন।

চিত্র: বারি লাউ-২

২০২৪

চিত্র: বারি লাউ-৩

চিত্র: বারি লাউ-৪

চিত্র: বারি লাউ-৫

চিত্র: বর্ষা হাইব্রিড

বারি লাউ-৩: আগাম শীতকালীন জাত। সবুজ রঙের ফলে সাদা দাগ থাকে। জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন।

বারি লাউ-৪: তাপ সহনশীল ও অতি বৃষ্টি সহিঞ্চু এবং গ্রীষ্মকালে চাষ করা যায়। গাঢ় সবুজ রঙের ফলের গায়ে সাদাটে দাগ থাকে।

বারি লাউ-৫: ফল লম্বা ও বোতল আকৃতির। ফল গাঢ় সবুজ রঙের, ফলের নিচের দিকে সাদা ছিট ছিট দাগ আছে।

বর্ষা হাইব্রিড: বর্ষাকালীন জাত। তাপ, বৃষ্টি ও রোগ সহনশীল জাত। বপনের সময় মে-অক্টোবর। প্রতিটি ফলের ওজন ২.৫-৩.০ কেজি।

ময়না (হাইব্রিড): বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়। প্রায় সারা বছর ময়না লাউ চাষ উপযোগী।ময়না লাউ আকর্ষণীয় সবুজ বর্ণের সাদা ফোটাযুক্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি ময়না লাউয়ের গড় ওজন হয় ১.৫-২ কেজি। ময়না লাউয়ের ৩০-৩৫ টন/ একর ফলন হয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত বিইউ (BU) লাউ ১ ও বিইউ (BU) হাইব্রিড লাউ ১ নামে দুইটি বারমাসি লাউ উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বীজ বপনের সময়

শীতকালীন: আগষ্ট- অক্টোবর।

গ্রীষ্মকাল: ফেব্রুয়ারি- মে।

বর্ষাকাল: মে-অক্টোবর (বর্ষা হাইব্রিড জাত)।

বীজহার: পলি ব্যাগে চারা উৎপাদন করে রোপণ করলে শতক প্রতি ৩.২৫-৪.০ গ্রাম (একরপ্রতি ৩২৫-৪০০ গ্রাম) বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ শোধন: বীজবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং সবল সতেজ চারা উৎপাদনের জন্য বীজ শোধন জরুরী। কেজিপ্রতি ২ গ্রাম ভিটাভেক্স/প্রোভ্যাক্স/ক্যাপটান ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

লাউ চাষের জন্য পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করা উত্তম। এতে বীজের খরচ কম লাগে। এজন্য আলো বাতাস স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় এমন জায়গায় ২০-২৫ সেমি উঁচু বেড করে নিতে হবে। বীজ বপনের জন্য ৮ x ১০ সেমি বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ/পট ব্যবহার করা যায়। প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। মাটিতে বীজ গজানোর জন্য মাটির উপযুক্ত আর্দ্রতা ('জো` অবস্থা) নিশ্চিত করে (মাটি জো অবস্থায় না থাকলে পানি দিয়ে জো করে নিতে হবে) তা পলিব্যাগে ভরতে হবে। অত:পর প্রতিব্যাগে ১টি করে বীজ বুনতে হবে। বীজের আকারের ২ গুণ মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে। লাউয়ের বীজের খোসা কিছুটা শক্ত। তাই বীজ বপনের আগে ১৫-২০ ঘন্টা বীজ পানিতে ভিজিয়ে নিলে সহজে বীজের অংকুরোদগম হয়।

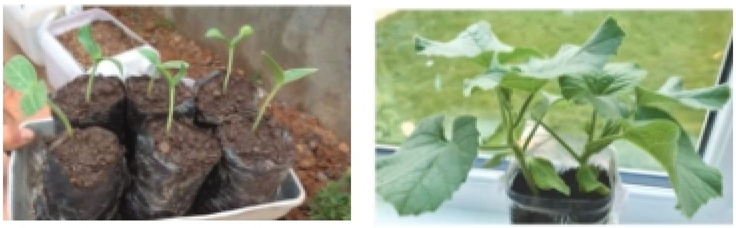

চিত্র: পলিব্যাগ বা পটে লাউয়ের চারা

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

ক) বেশি শীতে বীজ গজানোর সমস্যা হয়। এজন্য শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাস্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে রাখতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।

খ) রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বীজতলার উপর শেড বা ঢাকনা দিতে হবে।

গ) চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে। পলিব্যাগের মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

ঘ) লাউয়ের চারাগাছে 'রেড পাম্পকিন বিটল' নামে এক ধরনের লালচে রংয়ের পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়।

১.১.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি- জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। এরপর জমিকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের প্রস্থ ৩ মিটার এবং উচ্চতা ১৫-২০ সেমি হবে। দুটি বেডের মাঝে ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি করতে হবে।

মাদা (গর্ত) প্রস্তুতকরণ- বেডের কিনারা থেকে ৬০ সেমি ভিতরে মাদার কেন্দ্র ধরে ১.৫ মিটার দূরে দূরে ৫০-৫৫ সেমি x ৫০-৫৫ সেমি x ৪৫-৫০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

লাউ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে এবং অনেক লম্বা সময়ব্যাপী ফলন দেয়। কাজেই ফসলের সফল চাষ করতে হলে গাছের জন্য পর্যাপ্ত খাবার দিতে হয়। লাউ গাছের খাবার সংগ্রহের জন্য শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

লাউয়ের জন্য সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	মোট পরিমান (প্রতি শতক)	জমি তৈরির সময় (প্রতি শতক)	প্রতি মাদায় সারের পরিমান (মোট মাদা ১০টি)				
			চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পরে
গোবর/ কম্পোস্ট	৮০ কেজি	২০ কেজি	৬ কেজি	-	-	-	-
ইউরিয়া	১২০০ গ্রাম	-	-	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম
টিএসপি	৯০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	-	-		-
এমওপি	৮৫০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	২৫ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-		-
জিংক সালফেট	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-		-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৫০ গ্রাম	-	৫ গ্রাম	-	-	-	-

১.১.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

৩x ২ মিটার দূরত্বে বীজ বপন করতে হয়। মাদায় সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে, মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর প্রতি মাদায় ৩-৪টি করে বীজ বপন করতে হয়। গভীরতা হবে ২.৫ সেমি (১ ইঞ্চি)। বীজ বপণের ৪-৫ দিনের মধ্যেই গজাবে, ১০-১৫ দিন পর মাদা প্রতি সুস্থ ২টি চারা রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলতে হবে।

পলি ব্যাগে উৎপাদিত চারার বয়স ১৫-১৬ দিন হলে প্রতি মাদায় ১টি করে চারা রোপণ করতে হয়। চারা রোপণের আগের দিন বিকালে পানি দিয়ে মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরের দিন বিকালে চারা রোপণ করতে হয়। মাঠে প্রস্তুত মাদাগুলোর মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে, এককোপ দিয়ে চারা লাগানোর জন্য জায়গা করে নিতে হবে। অত:পর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি উক্ত জায়গায় লাগিয়ে চারপাশে মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে। চারা লাগানোর পর

মাদায় পানি দিতে হবে। পলিব্যাগ সরানোর সময় এবং চারা রোপণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং মাটির দলা না ভাংগে। নতুবা শিকড়ের ক্ষতস্থান দিয়ে ঢলে পড়া রোগের ছত্রাক জীবাণু ঢুকবে এবং শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ হলে গাছের বৃদ্ধি দেরিতে শুরু হবে। এছাড়া পানিতে ভাসমান কচুরীপানার স্তুপে মাটি দিয়ে বীজ বুনেও সেখানে লাউ জন্মানো যায়।

১.১.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): বপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে বীজ না গজালে বা চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া: লাউয়ের কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। যখন ১৫-২৫ সেমি লম্বা হবে তখনই মাচা দিতে হবে। এজন্য লাউয়ের জমিতে ১.৫ মিটার উঁচু করে মাচা বা জাংলা তৈরি করতে হয়। লাউ মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে বাজারমূল্য কমে যায়, ফলে পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কমে যায়। ফলে ফলনও কমে যায়।

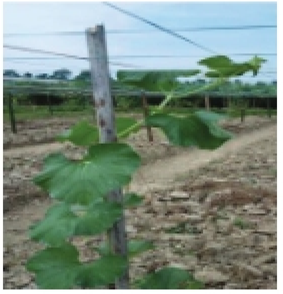

চিত্র: লাউ গাছের মাচা

আগাছা দমন: হাতিশুঁড় ও পানি লং আগাছা লাউয়ের বিভিন্ন রোগের বিকল্প পোষক (আশ্রয়দাতা)। ভাঁটফুল গাছ রেড পাম্পকিন বিটলের আশ্রয়স্থল। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। কাজেই চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

চিত্র: হাতিশুঁড়

চিত্র: পানি লং

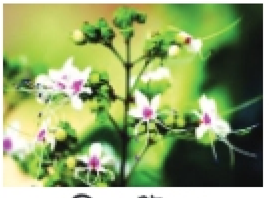

চিত্র: ভাঁটফুল

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদা প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ায় ১০-১৫ সেমি দূরে মাদার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ: লাউ ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। কাজেই সেচ নালা দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। লাউয়ের জমিতে কখনও সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আটকে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে। প্রয়োজনে সেচ নালা হতে ছোট কোন পাত্র

দিয়ে কিছু পানি গাছের গোড়ায় সেচ দেওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে লাউ ফসলে ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে।

মালচিং (আচ্ছাদন): বীজ বপনের পর মাদায় মালচিং করা হলে সহজে বীজ গজায়। প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিয়ে বায়ু চলাচল সহজ করতে হবে।

শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখা (ডালপালা) গুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে। চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর শাখা ভাঙ্গার কাজ শুরু করা যায়। এরপর ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার শাখা ছাঁটাই করা যায়।

কৃত্রিম পরাগায়ন: লাউয়ের পরাগায়ন প্রধাণত: মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রাকৃতিক পরাগায়নের মাধ্যমে বেশি ফল ধরার জন্য হেক্টরপ্রতি ২-৩ টি মৌমাছির কলোনী বা বাক্স স্থাপন করা যেতে পারে। নানা কারণে লাউয়ের সব ফুলে প্রাকৃতিক পরাগায়ন ঘটে না এবং এতে ফলন কমে যায়। হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করে লাউয়ের ফলন শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। লাউয়ের ফুল ঠিকমতো রোদ পেলে দুপুরের থেকে ফোটা শুরু হয়ে রাত ৭-৮টা পর্যন্ত ফোটে। কৃত্রিম পরাগায়ন ফুল ফোটার দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত করা যায়। তবে পরদিন সকালে পরাগায়ন করলে ফল কম ধরে, কিন্তু ফুল ফোটার দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত যে কয়টা ফুলে ফুলে পরাগায়ন করা হয় তার সব কয়টিতে ফল ধরে। তাই ফুল ফোটার দিন বিকেলে হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করে লাউয়ের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। কৃত্রিম পরাগায়নের নিয়ম হলো ফুল ফোটার পর পুরুষ ফুল ছিঁড়ে ফুলের পাপড়ি অপসারণ করা হয় এবং ফুলের পরাগধানী (Anther-যার মধ্যে পরাগরেণু থাকে) আস্তে করে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে (Stigma) ঘষে দেয়া হয়। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৪-৫টি স্ত্রী ফুলে পরাগায়ন করা যায়।

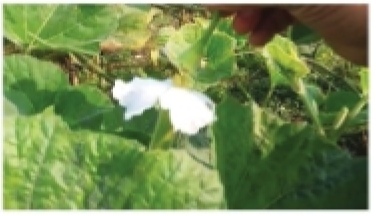

চিত্র: লাউ ফুলে কৃত্রিম পরাগায়ন

ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

ক) লাউয়ের মাছি পোকা

এ পোকা লাউয়ের ফলের মধ্যে প্রথমে ডিম পাড়ে, পরবর্তীতে ডিম থেকে কীড়া বা বাচ্চা (Larva) বের হয়ে ফলের ভেতরে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।

চিত্র: মাছি পোকা আক্রান্ত লাউ ফুল ও ফল

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা

১। **পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ**: মাছি পোকর কীড়া আক্রান্ত ফল দ্রুত পচে যায় এবং গাছ হতে মাটিতে ঝরে পড়ে। পোকা আক্রান্ত ফল কোনোক্রমেই জমির আশেপাশে ফেলে রাখা উচিত নয়। পোকা আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেললে মাছি পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

২। কচি ফলকে মাছি পোকা থেকে রক্ষা করার জন্য কাগজ বা পলিথিন দিয়ে ঢেকে ফেলতে হবে।

৩। ক্ষেতের মাঝে মাঝে কাঁঠালের মোথা দেয়া, এতে লাউয়ের পরিবর্তে স্ত্রী মাছি কাঁঠালের মোথায় ডিম পাড়বে এবং ক্ষতির পরিমান কমে আসবে।

৪। আম বা খেজুরের রসে সামান্য বিষ মিশিয়ে তা বোতলে রেখে জানালা কেটে দিয়ে ক্ষেতের মাঝে মাঝে স্থাপন করা।

৫। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার: কিউলিওর নামক সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে মাছি পোকার পুরুষ পোকা আকৃষ্ট করা সম্ভব। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে আকৃষ্ট মাছি পোকাগুলোকে মেরে ফেলা যায়। চারা লাগানোর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জমিতে ফাঁদ লাগাতে হবে। প্রতি ২.৫ শতক জমির জন্য ১টি ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

চিত্র: সেক্স ফেরোমন ফাঁদ

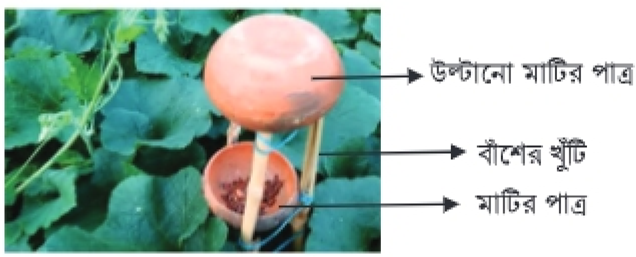

চিত্র: বিষটোপ ফাঁদ

সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদ কুমড়া জাতীয় ফসলের জমিতে ক্রমানুসারে ১২ মি. দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে। বিষটোপ ফাঁদে পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ মাছি পোকা আকৃষ্ট হয় এবং ফাঁদে পড়ে মারা যায়। ১০০ গ্রাম

পাকা মিষ্টি কুমড়া কুচি কুচি করে কেটে তা থেঁতলিয়ে ০.২৫ গ্রাম সপসিন বা মিপসিন ৭৫ পাউডার অথবা সেভিন ৮৫ পাউডার এবং ১০০ মিলি পানি মিশিয়ে ছোট একটি মাটির পাত্রে রেখে তিনটি খুঁটির সাহায্যে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বিষটোপের পাত্রটি মাটি থেকে ০.৫ মিটার উঁচুতে থাকে। বিষটোপ তৈরির পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করে তা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে তৈরি বিষটোপ ব্যবহার করতে হয়।

৬। সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

খ) রেড পাম্পকিন বিটল

রেড পাম্পকিন বিটল পোকা লাল, ছোট, ডিম্বাকার আকৃতির। এর পূর্ণ বয়স্ক পোকা চারাগাছের পাতায় ফুটো করে এবং পাতার কিনারা থেকে খেতে খেতে সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে এবং বয়স্ক গাছের পাতার শিরা উপশিরাগুলো রেখে সম্পূর্ণ সবুজ অংশ খেয়ে পাতা ঝাঝরা করে ফেলে। এ পোকা ফুল ও কচি ফলেও আক্রমণ করে। এদের কীড়া শিকড় বা মাটির নিচে থাকা কান্ড ছিদ্র করে ফলে গাছ ঢলে পড়ে এবং পরিশেষে শুকিয়ে মারা যায়।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা

১। চারা অবস্থায আক্রান্ত হলে হাত দিয়ে পূর্ণবয়স্ক পোকা ধরে মেরে ফেলতে হবে।

২। ক্ষেত সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৩। পাতার নিচের দিকে শুকনা ছাই ছিটাতে হবে।

৪। চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়।

৫। গাছের গোড়ার মাটি কুপিয়ে কীড়া (Larva) উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং ডাল পুঁতে পাখি বসার জায়গা করে দেওয়া হয়। একে পার্চিং বলে।

৬। ক্ষেতের আশপাশের বিকল্প পোষক অর্থাৎ কুমড়াজাতীয় সবজি নষ্ট করতে হবে।

৭। আক্রমণের হার বেশি হলে চারা গজানোর পর প্রতি মাদার চারদিকে মাটির সঙ্গে চারাপ্রতি ২-৫ গ্রাম অনুমোদিত দানাদার কীটনাশক (কার্বফুরান গ্রুপের কীটনাশক যেমন-ফুরাডান) মিশিয়ে গোড়ায় পানি সেচ দিতে হবে।

৮। ১ কেজি মেহগনি বীজ কুঁচি করে ৫ লিটার পানিতে ৪-৫ দিন ভিজিয়ে ছেঁকে ২০ গ্রাম সাবানের গুঁড়া ও ৫ গ্রাম সোহাগা মিশিয়ে ২০ মিনিট ফুটিয়ে শীতল করে ৫ গুণ পানিতে গুলে স্প্রে করতে হবে।

৯। সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট অথবা রিপকর্ড অথবা সিমবুশ ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর

পর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বাজারে বিক্রি করা যাবে না।

গ) লাউয়ের জাব পোকা

লাউ এর জাব পোকা খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।চারা, পূর্ণ বয়স্ক, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়ে এ পোকা আক্রমণ করে। পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়। তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা

১। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ ও আক্রান্ত অংশ পোকাসহ সংগ্রহ করে পুতে ফেলতে হবে।

২। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার ও শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।

৩। বেডে লাইনে দূরত্ব বজায় রেখে চারা রোপন করতে হবে।

২। ফসলের বৃদ্ধির শুরুতে এ রোগের বাহক জাব পোকার আক্রমণ রোধে কেরোসিন মিশ্রিত ছাই পাতায় ছিটিয়ে দিতে হবে।

৪। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৫। আক্রমণের মাত্রা ও পোকা দমনে হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে (হলুদ ফাঁদঃ ফসলের ক্ষেতে আঠা মিশ্রিত হলুদ কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হয়, পোকা সেখানে উড়ে এসে পড়ে এবং আঠাতে আঁটকে মারা যায়)।

৬। ডিটারজেন্ট ৩ গ্রাম/ লিটার পানি+নিম/ বিষকাঠাঁলী/ ধুতরা/আতা/পেঁপে/ নিশিন্দা/জবা/গাদা ফুলের ১ কেজি পাতা থেতিয়ে ১২ ঘন্টা ভিজে ১০ লিটার পানি স্প্রে করতে হবে অথবা ১০ গ্রাম তামাকের গুড়া, ৫ গ্রাম সাবানের গুড়া ও নিমের পাতার নির্যাস প্রতি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। অথবা প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি নিম তেল ও ৫ মিলি ট্রিক্স (ডিটারজেন্ট) মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ৩-৫ বার স্প্রে করতে হবে। অথবা আধাভাঙ্গা নিম বীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিম বীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

৭। যদি কোনো গাছে ৫০ টির বেশি পোকা দেখা দেয় তাহলে ইমিডাক্লোপিড ২০ এসএল (ইমিটাফ/ এডমায়ার/ টিডো) ০.৫মিঃলিঃ/ লিটার পানি স্প্রে করতে হবে। অথবা এসিফেট ৭৫ এসপি (এসাটাফ) ১.৫ গ্রাম/লিটার পানি স্প্রে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না।

রোগবালাই দমন

ক) মোজাইক রোগ

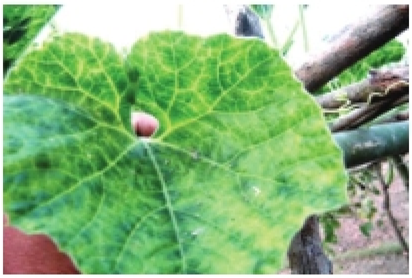

চিত্র: মোজাইক রোগে আক্রান্ত লাউ পাতা

চারা অবস্থায় বীজ গজানোর পর বীজপত্র হলুদ হয়ে যায় এবং পরে চারা নেতিয়ে পড়ে। বয়স্ক গাছের পাতায় হলুদ-সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইকের মতো দাগ দেখা যায়। দাগগুলো অসম আকারের। দ্রুত বড় হয়। আক্রান্ত পাতা ছোট, বিকৃত ও নিচের দিকে কোকড়ানো, বিবর্ণ হয়ে যায়। শিরা-উপশিরাও হলুদ হয়ে যায়। ফুল কম আসে এবং অধিক আক্রমণে পাতা ও গাছ মরে যায়। আক্রান্ত ফল বেঁকে যায় ও গাছের কচি ডগা জটলার মতো দেখায়। ফলের উপরি অংশ এবড়ো-খেবড়ো দেখা যায়।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা

১। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ ও জমি নিয়মিত পরিদর্শন করে রোগাক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে।

২। আগাছা ও বিকল্প আবাদী ফসল পরিষ্কার করতে হবে।

৩। জীবাণুমুক্ত যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

৪। ফসলের বৃদ্ধির শুরুতে এ রোগের বাহক জাব পোকার আক্রমণ রোধে কেরোসিন মিশ্রিত ছাই পাতায় ছিটিয়ে দিতে হবে।

৫। আক্রমনের মাত্রা জানতে এবং পোকা দমনে হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

৬। জমিতে জাব পোকা দেখা গেলে (বাহক পোকা) ডিটারজেন্ট ৩ গ্রাম/ লিটার পানি+নিম/ বিষকাটালী/ ধুতরা/আতা/পেঁপে/ নিশিন্দা /জবা/গাদা ফুলের ১ কেজি পাতা থেতিয়ে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ১০ লিটার পানি মিশিয়ে স্প্রে করা। অথবা প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি নিম তেল ও ৫ মিলি ট্রিক্স মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ৩-৫ বার স্প্রে করতে হবে। অথবা

যদি কোনো গাছে ৫০ টির বেশি পোকা দেখা দেয় তাহলে প্রতি লিটার পানিতে এডমায়ার ২০ এসএল ০.৫ মিলিলিটার মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. /২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

খ) পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew) রোগ

বয়স্ক পাতার উপর সাদা পাউডার এর মত দেখা যায়, হাত দিয়ে ধরলে পাউডার এর মত উঠে আসে । এর কারণে গাছ দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং ফলন হ্রাস পায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১) এই রোগ দমনের জন্য ক্ষেতের আশেপাশের যাবতীয় আগাছা ও বন্য গাছ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হবে।

২) রোগাক্রান্ত গাছের অংশ ভালভাবে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে।

৩) রোগের প্রাথমিক অবস্থায় গাছে গন্ধকচুর্ণ মাসে কমপক্ষে দুইবার করে ছিটালে রোগ প্রশমিত হয়।
অথবা

এই রোগটি দূর করতে ২ গ্রাম পরিমাণ থিয়োভিট ৮০ ডব্লিউপি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভাল করে পাতা ভিজিয়ে দিতে হবে। ঔষধ প্রয়োগের ১৫ দিনের মধ্যে কোন ফসল সংগ্রহ করা বা খাওয়া যাবে না।

গ) লাউয়ের ব্লোজম এন্ড রট রোগ

আক্রান্ত গাছে প্রথমে কচি লাউয়ের নিচের দিকে পঁচন দেখা দেয়। ধীরে ধীরে পুরো ফলটিই পঁচে যায়। সাধারণত অম্লীয় মাটিতে বা ক্যালসিয়ামের অভাব আছে এমন জমিতে এ রোগ দেখা যায়।

প্রতিকার

১. ক্ষেতে পরিমিত সেচ দিতে হবে ।

২. গর্ত বা মাদা প্রতি ৫০ থেকে ৮০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে ।

৩. একই জমিতে বার বার একই সবজি আবাদ না করা।

৪. জমিতে শতাংশ প্রতি চার কেজি হারে ডলোচুন (পাথুরে চুন) প্রয়োগ করলে পরপর আর তিন বছর প্রয়োগ করতে হবেনা।

৫. মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

১.১.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফলের পরিপক্কতা নির্ধারণ: ফলের পরিপক্কতা বোঝার উপায় হচ্ছে ফলের গায়ে প্রচুর ছোট ছোট শুং এর উপস্থিতি থাকবে এবং ফলের গায়ে নখ দিয়ে চাপ দিলে খুব সহজেই নখ ঢুকে যাবে। চারা গজানোর ৬০-৭০ দিন পর গাছে ফুল আসা শুরু হয়। পরাগায়নের ১২-১৫ দিন পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফল যত বেশি সংগ্রহ করা হবে ফলনও তত বেশি হবে। লাউয়ে খোসায় যে পর্যন্ত সহজেই চিমটি কাটা যায় ততদিন পর্যন্ত লাউ সবজি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পরবর্তী সময় থেকে লাউ পাকা অবস্থা পর্যন্ত সাধারণত: আর সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয় না।

ফসল সংগ্রহ: ফলের লম্বা বোঁটা রেখে ধারালো ছুরি দ্বারা ফল কাটতে হবে।

ফলন: প্রতি মাদায় ফলন ১৫০-২০০ কেজি/শতক (প্রতি একরে ১২-১৮ টন)।

সংরক্ষণ: লাউ কাটার পর ছায়ায় ও ঠান্ডায় ২/৩ দিন পর্যন্ত হালকা পানির ছিটা দিয়ে রাখা যায়। কার্টুন প্যাকেটে খাড়াভাবে সাজিয়ে বাজারজাত করা হলে লাউয়ের গুণাগুণ ও ভৌত অবস্থা ভাল থাকে।

১.২ মিষ্টিকুমড়া (Sweet gourd)

মিষ্টিকুমড়া একটি উপাদেয় সবজি।এদেশে প্রায় সব জেলাতেই মিষ্টিকুমড়ার আবাদ হয়। আগে মিষ্টিকুমড়া গ্রীষ্মকালের একটি প্রধান সবজি ছিল। এখন দেশে বেশ কিছু হাইব্রিড জাতের মিষ্টিকুমড়া সারাবছরই চাষ হচ্ছে। লাউয়ের মতো একই মিষ্টিকুমড়া গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদাভাবে উৎপন্ন হয় ।

১.২.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

মিষ্টিকুমড়ার পরিচিতি ও ব্যবহার: মিষ্টিকুমড়া ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ সবজি। এর ফল কাঁচা ও পাকা উভয়ই অবস্থায়ই সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। কুমড়ার পাতা, কচি ডগা ও ফুল খাওয়া যায়। পাকা মিষ্টিকুমড়ার শাঁস দিয়ে সস্, হালুয়া, মোরব্বা ইত্যাদি তৈরি করা যায়। পাকা ফল চোখের রাতকানা রোগ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

বৈজ্ঞানিক নাম: এর বৈজ্ঞানিক নাম *Cucurbita moschata*

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ১.৪ গ্রাম প্রোটিন, ১০০ মিগ্রা ক্যালসিয়াম, ৩০ মিগ্রা ফসফরাস, ৫০ মাইক্রোগ্রাম বিটা ক্যারোটিন, ২ গ্রাম ভিটামিন সি থাকে।

উৎপত্তি: মধ্য আমেরিকা অঞ্চল ।

জলবায়ু ও মাটি: মিষ্টিকুমড়া চাষের জন্য ১৬০-১৭০ দিনের মত উষ্ণ, প্রচুর সূযালোক, নিম্ন আর্দ্রতা উত্তম। তবে সবচেয়ে অনুকূল তাপমাত্রা ২০-২৫° সে.। উচ্চ তাপমাত্রা ও লম্বা দিনে পুরুষ ফুলের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং স্ত্রী ফুলের সংখ্যা কমে যায়। বন্যামুক্ত এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এমন দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটি কুমড়া চাষের জন্য উপযোগী। মাটির অম্লমান ৫.৫ উত্তম।

উৎপাদন মৌসুম: রবি ও খরিপ উভয়ই মৌসুম।

জাত পরিচিতি

বারি মিষ্টিকুমড়া-১, বারি মিষ্টিকুমড়া-২, বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-১, বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-২, বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-৩, থান্ডার বল, সুপ্রিমা, সুইটি ইত্যাদি।

বপন সময়

শীতকালীন: অক্টোবর- ডিসেম্বর।

গ্রীষ্মকালীন: ফেব্রুয়ারি-মে।

বীজহার

পলিব্যাগের চারা রোপণের ক্ষেত্রে: শতকপ্রতি ৪-৬ গ্রাম (হেক্টরপ্রতি ৪০০-৬০০ গ্রাম) বীজের প্রয়োজন।

মাদায় বীজ বপনের ক্ষেত্রে: শতকপ্রতি ২০-২৫ গ্রাম (হেক্টরপ্রতি ২.০-২.৫ কেজি)।

বীজ বপন ও চারা উৎপাদন: নার্সারিতে চারা পলিব্যাগে উৎপাদন করে নিলে ভাল হয়। বীজ বপনের জন্য ৮X ১০ সেমি বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে পলিব্যাগ ভরতে হবে। সহজ অংকুরোদগমের জন্য পরিষ্কার পানিতে ১৫-২০ ঘন্টা অথবা শতকরা ১ ভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট দ্রবণে বীজ এক রাত্রি ভিজিয়ে অত:পর পলিব্যাগে বপন করতে হবে। প্রতি ব্যাগে ১টি করে বীজ বুনতে হবে। বীজের আকারের দ্বিগুণ মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

১. শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাস্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে রাখতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।

২. চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন চারার গায়ে পানি না পড়ে।

৩. পলিব্যাগের মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

৪. চারা গাছে রেড পামকিন বিটল পোকার আক্রমণ হলে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত মাদায় লাগাতে হবে।

১.২.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিষ্কাশন ও সেচ সবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে জমি প্রস্তুতকরণ: সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সুর্যালোক পায় এমন জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ ও মই দিয়ে এমনভাবে জমি প্রস্তুত করতে হবে যেন জমিতে ঢেলা ও আগাছা না থাকে।

বেড ও মাদা তৈরি : এরপর জমিকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের প্রস্থ জাতভেদে ৩ মিটার এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে নিতে হবে। বেডের উচ্চতা কমপক্ষে ১৫-২০ সেমি হবে। দুটি বেডের মাঝে ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ এবং নিকাশ নালা তৈরি করতে হবে। ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা সংলগ্ন বেডের কিনারা থেকে ৫০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার দূরে দূরে এক সারিতে ৫০-৫৫ সেমি X ৫০-৫৫ সেমি X ৪৫-৫০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে। সারির অপর পার্শ্বে ২ মিটার খালি জায়গায় লতা বাইবার সুযোগ পাবে। মাদা থেকে মাদার দুরত্ব ২.৫ মিটার (রবি মৌসুম) এবং ৩.০ মিটার (খরিপ মৌসুমে)। প্রতি মাদায় বীজের সংখ্যা ২-৩টি (চারা হলে ১টি রাখতে হবে)।

সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি

মিষ্টিকুমড়া দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে থাকে এবং প্রচুর পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন। তাই সার প্রয়োগ হতে হবে পর্যাপ্ত।

নিম্নোক্ত হারে সারের পরিমান ও মাত্রা সুপারিশ করা যেতে পারে:

সারের নাম	মোট পরিমান (প্রতি শতাংশ)	জমি তৈরির সময় (প্রতি	প্রতি মাদায় (মোট মাদা ৭টি)				
			চারা রোপণের ৭-১০ দিন	চারা রোপণের ১০-১৫	চারা রোপণের ৩০-৩৫	চারা রোপণের ৫০-৫৫	চারা রোপণের ৭০-৭৫

২০১৪

		শতাংশ)	পূর্বে	দিন পর	দিন পর	দিন পর	দিন পর
পচা গোবর	৪৫ কেজি	১০ কেজি	৫ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	৭৭০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	-	-	-	-
ইউরিয়া	৮৪০ গ্রাম	-	-	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম
এমওপি	৬৫০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	২৫ গ্রাম			
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-
জিংক সালফেট	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	২৮০ গ্রাম	-	৪০ গ্রাম	-	-	-	-

১.২.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

২.৫ মিটার x ২.৫ মিটার দূরত্বে বীজ বপন করতে হয়। মাদায় সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ ও মাদা তৈরির ৭-১০ দিন পর প্রতি মাদায় ২-৩টি করে বীজ বপন করতে হয়। পলি ব্যাগে উৎপাদিত চারার বয়স ১৫-১৬ দিন হলে প্রতি মাদায় ১টি করে চারা রোপণ করতে হয়।

চারা রোপণের আগের দিন বিকালে পানি দিয়ে মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরের দিন বিকালে চারা রোপণ করতে হয়। মাঠে প্রস্তুত মাদাগুলোর মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে, এককোপ দিয়ে চারা লাগানোর জায়গা করে নিতে হবে। অত:পর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি উক্ত জায়গায় লাগিয়ে চারপাশে মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে। চারা লাগানোর পর মাদায় পানি দিতে হবে। পলিব্যাগ সরানোর সময় এবং চারা রোপণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং মাটির দলা না ভাংগে। নতুবা শিকড়ের ক্ষতস্থান দিয়ে ঢলে পড়া রোগের জীবাণু ঢুকবে এবং শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ হলে গাছের বৃদ্ধি দেরিতে শুরু হবে। এছাড়া পানিতে ভাসমান কচুরীপানার স্তুপে মাটি দিয়ে বীজ বুনেও সেখানে মিষ্টিকুমড়া জন্মানো যায়।

১.২.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): বপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে বীজ না গজালে বা চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া: মিষ্টি কুমড়ার কাংখিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। যখন ১৫-২৫ সেমি লম্বা হবে তখনই মাচা দিতে হবে। এজন্য মিষ্টি কুমড়ার জমিতে ১.৭ মিটার উঁচু করে মাচা বা জাংলা তৈরি করতে হয়। মিষ্টি কুমড়া মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে বাজারমূল্য কমে যায়, ফলে পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কমে যায়। ফলে ফলনও কমে যায়।

আগাছা দমন: মিষ্টিকুমড়ার জমিতে দ্বন্ড কলস, চাপড়া, মুথা, বনমরিচ, দুর্বা, প্রেমকাঁটা, শনঘাস ইত্যাদি আগাছা জন্মে। এসব আগাছা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয় এবং বিভিন্ন পোকার আশ্রয়স্থল ও রোগের বিকল্প পোষক। তাই চারা রোপণের পর থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদাপ্রতি সারের উপরি প্রয়োগ গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ দেওয়া: মিষ্টি কুমড়া ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। কাজেই সেচ নালা দিয়ে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। জমিতে কখনও সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আটকে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে । প্রয়োজনে সেচ নালা হতে ছোট কোন পাত্র দিয়ে পানি গাছের গোড়ায় সেচে দেওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে ৫-৭ দিন পর পর সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

মালচিং: প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

শোষক শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৫০ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখাগুলো সিকেচার/ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।

কৃত্রিম পরাগায়ন: মিষ্টি কুমড়ার পরাগায়ন প্রধাণত: মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। মিষ্টি কুমড়ার একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল ধরে। পুরুষ ফুলে শুধুমাত্র বোঁটার উপরে ফুলের পরাগদন্ড (Style) ও তাতে পরাগরেণু (Pollen) থাকে। স্ত্রী ফুলের পাপড়ির নিচে সবসময় ছোট আকারের একটি ফল থাকে। সকাল ৮-১০টা পর্যন্ত অথবা সকালে যতক্ষণ পযন্ত রোদের তাপ কম থাকে পুরুষ ফুল ছিঁড়ে ফুলের পাপড়িগুলো অপসারণ করে এবং ফুলের পরাগধানী (যার মধ্যে পরাগরেণু থাকে) স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডের কাছাকাছি নিয়ে সংস্পর্শ ছাড়াই পুরুষ ফুলে আস্তে করে টোকা দিতে হয়। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৪-৫টি স্ত্রী ফুলে পরাগায়ন করা যায়।

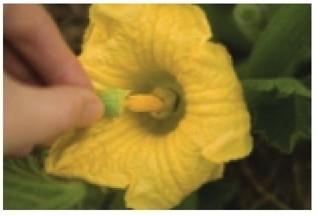

চিত্র: মিষ্টি কুমড়ার কৃত্রিম পরাগায়ন

পোকামাকড় দমন

ক) মাছি পোকা

মাছি পোকা সাধারণত: কুমড়া জাতীয় ফসলের কচি ফলে বেশী আক্রমণ করে। স্ত্রী মাছি তার লম্বা সরু ডিম পাড়ার নলের সাহায্যে কচি ফলের ভিতরে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ফলের শাঁস খেয়ে বড় হতে থাকে, ফলে আক্রান্ত ফল পঁচে যায় ও খাওয়ার অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকা আক্রান্ত ফল বিকৃত হয়ে যায় ঠিকমত বাড়তে পারেনা, ফলে বাজার দর একদম কমে যায়। এদের আক্রমনের ফলে প্রায় ৫০ -৭০ ভাগ ফল নস্ট হয়ে যায়।

১.২.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফসলের পরিপক্কতা নির্ধারণ: মিষ্টি কুমড়ার কাঁচা ফল পরাগায়ণের ২০-২৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে। তখনও ফলে সবুজ রঙ থাকবে এবং ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাবে। নখ দিয়ে ফলের গায়ে চাপ দিলে নখ সহজেই ভিতরে ঢুকে যাবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করে মিষ্টিকুমড়ার পূর্ণ পরিপক্কতা নির্ধারণ করা হয়ঃ

ক) ফলের রঙ হলুদ অথবা হলুদ-কমলা অথবা খড়ের রং ধারণ করবে।

খ) ফলের বোঁটা খড়ের রঙ ধারণ করবে। গাছের ডগা শুকাতে শুরু করবে।

ফসল সংগ্রহ: কাঁচা ফল পরাগায়নের ২০-২৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে। এ সময় ফলের রং সবুজ থাকে। ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখায়। নখ দিয়ে চাপ দিলে সহজেই ডেবে যাবে। ফল যখন হলুদ, হলুদ-কমলা বা খড়ের রং ধারণ করবে এবং ফলের ডগা শুকাতে শুরু করবে তখনই পাকা ফল সংগ্রহ করতে হবে। পাকা ফল সংগ্রহকালে বিশেষ সতর্কতা পাকা ফল সংগ্রহের দুই তিন সপ্তাহ পূর্বে সেচ দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। এতে ফলের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি হবে। একরপ্রতি ফলন ১২-২০ টন (১২০- ১৮০ কেজি/শতাংশ)।

ফসল সংরক্ষণ: ফলের ত্বক মোটামুটি শক্ত বিধায় অন্যান্য সবজির তুলনায় এর পচনশীলতা কম। পরিবারের অসময়ের সবজি এবং বাজার মূল্যের কথা বিবেচনায় পাকা ফল দীর্ঘদিন (১ থেকে ৬ মাস) সংরক্ষণ করা যায়। মাচা অথবা মেঝেতে পাটাতন তৈরি করে সংরক্ষণ করা হয়। আড়তদাররা গোলা করে সংরক্ষণ করে থাকেন।

১.৩ শসা (Cucumber)

শসা পৃথিবীর সকল দেশে জন্মানো হয়। এমনকি শীতপ্রধান দেশে কাঁচ-ঘরের নিয়ন্ত্রিত তাপ ও আর্দ্রতায়ও শসা ফলানো হয়ে থাকে। চীনে বিশ্বের প্রায় ৬০% শসা উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশে আগে শসা শুধু গ্রীষ্মকালেই হতো। বর্তমানে হাইব্রিড জাতের কল্যানে সারাবছরই শসা চাষ হয়ে থাকে। সবজির ফুল সহবাসী (Monoecious) অর্থাৎ একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদাভাবে উৎপন্ন হয় । তাই ফল ধরার জন্য পরপরাগায়ন অত্যাবশ্যক।

শসা ও খিরা খেতে প্রায় একই রকম হলেও দুটি একটু আলাদা। শসা বড় ও লম্বা, শাঁস পুরু ও অপেক্ষাকৃত শক্ত, বিচি বড়। খিরা ছোট, শাঁস শসার চেয়ে নরম ও বিচি ছোট।

চিত্র: খিরা

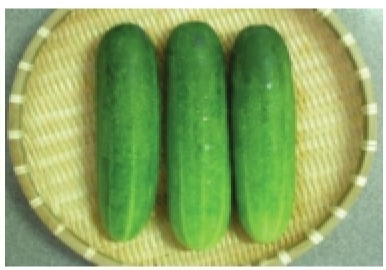

চিত্র: শসা

১.৩.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

শসার পরিচিতি ও ব্যবহার: শসা এক প্রকারের ফল। লতানো উদ্ভিদে জন্মানো ফলটি লম্বাটে আকৃতির এবং প্রায় ১০-১২ ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। এর বাইরের রঙ সবুজ। তবে পাকলে হলুদ হয়ে থাকে। ভেতরে সাদাটে সবুজ রঙের হয় এবং মধ্যভাগে বিচি থাকে। সরাসরি খাওয়া, সালাদ ও তরকারির জন্য শসা বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়। উন্নত দেশে এটি প্রচুর পরিমানে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। পাকা শসার পায়েস ও মোরব্বা সুস্বাদু।

বৈজ্ঞানিক নাম: এর বৈজ্ঞানিক নাম *Cucumis sativus.*

পুষ্টিমান: ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য শসায় ৯৬ গ্রাম জলীয় অংশ, ০.৬ গ্রাম আমিষ, ২.৬ গ্রাম শ্বেতসার, ১৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.২ মিলিগ্রাম লৌহ, ৪০ মিলিগ্রাম ক্যারোটিন, ১০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে।

উৎপত্তি: শসার উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে নেপাল মতান্তরে ভারত।

জলবায়ু ও মাটি: ২৫-৩০° সে. তাপমাত্রায় শসা সবচেয়ে ভাল জন্মে। শসার অধিক ফুল উৎপাদনের জন্য উচ্চ তাপমাত্রা, দীর্ঘদিবস এবং প্রখর আলো প্রয়োজন। উর্বর দো-আঁশ মাটি শসা উৎপাদনের জন্য ভাল। মাটির অম্লমান (PH) ৫.৫-৬.৮ শসা চাষের জন্য উত্তম।

উৎপাদন মৌসুম: সারাবছর

জাত পরিচিতি

স্থানীয় জাত: বারোমাসি ও পটিয়া জায়েন্ট (খিরার জাত-লাকি-৭, বাঁশখালী, মধুমতি, নওগাঁ গ্রীন ইত্যাদি)।

উফশীজাত: শীলা, গ্রীনকিং, গ্রীনজায়েন্ট।

হাইব্রিড: হীরা-৯০৪, আলভী গ্রীন, এভারগ্রীন, তিতুমির, বুলবুল

বপন সময়: ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস পর্যন্ত শসার বীজ বুনার উপযুক্ত সময়।

বীজহার: সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে- ৩-৪কেজি/হেক্টর (১২-১৬ গ্রাম/শতক)।
পলিব্যাগের চারা রোপণের ক্ষেত্রে- ২.৫-৩.৫কেজি/হেক্টর (১০-১৪ গ্রাম/শতক)।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

শসা চাষের জন্য পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করার জন্য ৮ x ১০ সেমি বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ নিতে হবে। অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে জো অবস্থায় সেই মাটি পলিব্যাগে ভরতে হবে। পলিব্যাগে মাটি সম্পূর্ণ না ভরে পলিব্যাগের উপর থেকে ১-২ সেন্টিমিটার খালি রেখে দিতে হবে।। তারপর পলিব্যাগগুলোকে একটা বেডে সুন্দর করে সাজিয়ে একটি ব্যাগে ১টি করে বীজ বুনতে হবে।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

- রোদ ও বৃষ্টির হতে থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বীজতলার উপর শেড বা ছাউনি দিতে হবে।

- চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে। পলিব্যাগের মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- শসার চারাগাছে 'রেড পাম্পকিন বিটল' নামে এক ধরনের লালচে পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। চারা বের হওয়ার পর থেকে চারা উঠানোর আগ পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়।

১.৩.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে জমি প্রস্তুতকরণ- জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। এরপর জমিকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের প্রস্থ ১.৫ মিটার এবং উচ্চতা কমপক্ষে ১৫-২০ সেমি হবে। দুটি বেডের মাঝে ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ এবং নিকাশ নালা থাকতে হবে এবং প্রতি দুই বেড অন্তর ৩০ সেমি প্রশস্ত ১টি করে নিষ্কাশন নালা তৈরি করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জমি প্রস্তুতকরণ- বেডের কিনারা থেকে ৫০ সেমি ভিতরে মাদার কেন্দ্র ধরে ১.৫ মিটার দূরে দূরে ৪৫X৪৫X৪০সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সার প্রয়োগ/শতক

সারেরনাম	মোট পরিমান	শেষ চাষের সময়	চারা রোপণের ৫-৭ দিন পূর্বে গর্তে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পরে	ফুল আসার সময়	ফল ধরার সময় (২ বার ১৫ দিন অন্তর)
গোবর/ কম্পোস্ট	৬০কেজি	৩০কেজি	৩০কেজি	-	-	-
ইউরিয়া	৭০০গ্রাম	-	২০০গ্রাম	২০০গ্রাম	১০০গ্রাম	১০০গ্রাম + ১০০গ্রাম
টিএসপি	৬০০গ্রাম	৩০০গ্রাম	৩০০গ্রাম	-	-	-
এমওপি	৭৫০গ্রাম	২০০গ্রাম	৩৫০গ্রাম	৫০গ্রাম	৫০গ্রাম	৫০গ্রাম + ৫০গ্রাম
জিপসাম	৪০০গ্রাম	৪০০গ্রাম	-	-	-	-
জিংকসালফেট	৫০গ্রাম	৫০গ্রাম	-	-	-	-
বোরাক্স	৪০গ্রাম	৪০গ্রাম	-	-	-	-

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৫০ গ্রাম	-	৫০ গ্রাম	-	-	-	

১.৩.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

বপন/রোপণের সময় ও পদ্ধতি

বছরের যে কোন সময় শসার বীজ বপন করা যায়। সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত শসার বীজ বপন করার উপযুক্ত সময়। বীজ বোনার পুর্বে বীজ কয়েক ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে অংকুরোদগম দ্রুত হয়। শসার বীজ সরাসরি অথবা চারা তৈরি করে মাদায় রোপণ করা যায়।

পলিব্যাগে চারা তৈরি করে জমিতে লাগানো উত্তম। ৫০:৫০ অনুপাতে পচা গোবর বা কম্পোস্ট ও মাটি একত্রে মিশিয়ে ৮ x ১০ সেমি সাইজের পলিথিনের ব্যাগে ভরতে হবে। প্রতিব্যাগে ২টি করে বীজ বপন করতে হবে। চারার বয়স ১৬-২০ দিন হলে মাদায় স্থানান্তর করতে হবে। প্রতিব্যাগে ২টি চারা থাকলে মাঠে রোপণের ৬-৭ দিন পর অপেক্ষাকৃত দুর্বল চারাটি তুলে প্রতিমাদায় ১টি করে চারা রাখতে হবে। রোপণের সময় ১.৫ মিটার x ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

১.৩.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুন্যস্থান পূরণ: বপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে বীজ না গজালে বা চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে। চারা মাটিতে প্রতিস্থিত হওয়ার পর এর চারিদিকের মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে।

মাচা তৈরি বা জাংলা দেওয়া: গাছ ২০-২৫ সেমি লম্বা হলে খুঁটি ও জিআই তারের নেট বা নাইলনের রশি দিয়ে মাচা তৈরি করে দিতে হবে। পাট কাঠি বা ধৈঞ্চা গাছের শলাও এ কাজে ব্যবহার করা যায়। মাচা মাটি থেকে ১.৫ মিটার উঁচু হবে। দুই বেডের মাঝে একটি মাচা দিলেই চলবে।

আগাছা দমন: হাতিশুঁড় ও ঝিলমরিচ আগাছা শসার বিভিন্ন রোগের বিকল্প পোষক (আশ্রয়দাতা)। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। কাজেই চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে বিশেষ করে মাদায় কোন আগাছা রাখা যাবে না।।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদাপ্রতি সারের উপরি প্রয়োগ গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা: শসা পানির প্রতি খুব সংবেদনশীল। মাটি শুকিয়ে গেলে গাছ ঢলে আসে ও ফুল ঝরে যায়। তাই খরা দেখলে দ্রুত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আবার বর্ষাকালে ক্ষেতে পানি জমে থাকাও শসার জন্য ক্ষতিকর। কয়েকদিন পানি জমে থাকলে গাছের গোড়া পচে যেতে পারে। সেজন্য নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

মালচিং বা আচ্ছাদন: বীজ বপনের পর মাদায় মালচিং করা হলে সহজে বীজ গজায়। প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিয়ে বায়ু চলাচল সহজ করতে হবে।

ছাঁটাইকরণ: গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৫০ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখাগুলো সিকেচার/ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।

কৃত্রিম পরাগায়ন: ফল ধারণ বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য সকাল ৯.০০ টার মধ্যে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হবে। এজন্য হাত দিয়ে পুরুষ ফুল স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে নিয়ে হালকা করে ঘষা দিতে হবে।

ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

ক) শসার রেড পাম্পকিন বিটল পোকা

পামকিন বিটলের পূর্ণবয়স্ক পোকা চারা গাছের পাতায় ফুটো করে এবং পাতার কিনারা থেকে খাওয়া শুরু করে সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে। এ পোকা ফুল ও কচি ফলেও আক্রমণ করে।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

খ) শসার মাছি পোকা দমন

এ পোকা কচি ফলের খোসার ভিতর ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা বা কীড়া ফল খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।

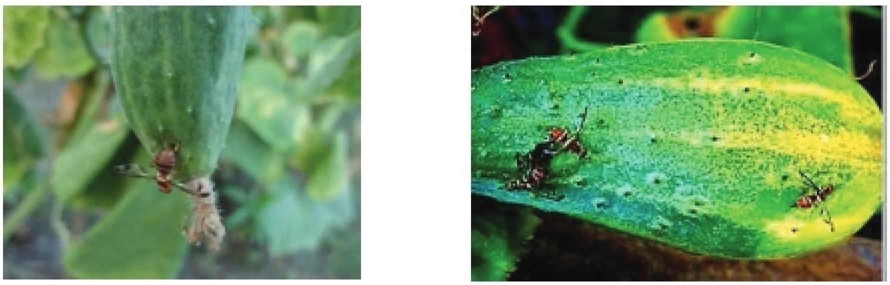

চিত্র: শসার মাছি পোকা

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা: লাউ, মিষ্টিকুমড়ার অনুরুপ।

সাবধানতা: স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না।

করনীয়: উত্তমরুপে জমি চাষ দিয়ে পোকার পুত্তলি পাখিদের খাবার সুযোগ করে দিতে হবে।

গ) শসার সাদা মাছি পোকা:

খুব ছোট হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট। গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ শুকিয়ে যায় । পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পরতে পারে। এই পোকা এক ধরণের রস ছড়িয়ে দেয়, যেখানে বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে । ফলে দূর থেকে আক্রান্ত গাছকে নিস্তেজ ও কালো দেখায়। গাছের বৃদ্ধি খুবই কম হয়।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা

১। আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করতে হবে ।

২। আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

৩। সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০ গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫ গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

৪। Azadirectin গ্রুপের বায়োনিম প্লাস ১মিলি/লিটার হিসেবে ৭ দিন পর পর স্প্রে করা যেতে পারে ।

৫। আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ঘ) শসার জাব পোকা:

পূর্ণবয়স্ক ও বাচ্চা (নিম্ফ) উভয় পাতা, কচি কান্ড ও ফুলের রস চুষে খায়।গাছ দুর্বল ও হলুদ হয়, পাতা কুঁকড়ে যায়, ফুলের কুড়ি ও কচি ফল ঝরে যায়।পোকা মধু রস নিঃসরণ করে, তাতে সুটিমোল্ড ছত্রাক জন্মে।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

রোগ দমন

ক) শসার মোজাইক ভাইরাস রোগ:

হলুদ বা হালকা সবুজ এবং ছোপছোপ হলুদ দাগ পাতা ও ফলে দেখা যায়। কম বয়সী পাতা সরু হয়ে কুঁচকে যায় এবং সমগ্র ফসলের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যহত হয় ও ফলন কমে যায়।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

খ) পাউডারি মিলিডিউ রোগ:

এই রোগে পাতার উপর সাদা পাউডার এর মত দেখা যায়, হাত দিয়ে ধরলে পাউডার এর মত উঠে আসে । এর কারণে গাছ দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং ফলন হ্রাস পায়।

দমন ব্যবস্থাপনা:

এই রোগটি দূর করতে ২ গ্রাম পরিমাণ থিয়োভিট ৮০ ডব্লিউপি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভাল করে পাতা ভিজিয়ে দিতে হবে। বড় ক্ষেতে প্রতি বিঘার জন্য ১২০ গ্রাম ঔষধ দরকারা হবে। ঔষধ প্রয়োগের ১৫ দিনের মধ্যে কোন ফসল সংগ্রহ করা বা খাওয়া যাবে না।

গ) অ্যানথ্রাকনোজ রোগ

এই রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে পাতায় হলদে দাগ হয়, পরে দাগগুলো বাদামি বা কালো হয়ে ঐ অংশ পচে যায়। ফলের বাইরের আবরনে এই বাদামি দাগ দেখা যায় ও ফল পচে যায়।

চিত্র: শসার অ্যানথ্রাকনোজ রোগ

২০১৪

দমন ব্যবস্থাপনা

১। এর প্রতিকারের জন্য বীজ লাগানোর পুর্বে বীজ শোধণ করতে হবে। ১ কেজি বীজ ২.৫ গ্রাম ভিটাভেক্স ২০০ নামক ঔষধ দ্বারা উত্তমরূপে মিশিয়ে নিতে হবে।

২। রোগের মাত্রা বেশি হলে ডায়থেন ৪৫ গ্রাম ১০ লিটার পরিমাণ পানির সংগে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ক্ষেতে রাসায়নিক ঔষধ দেবার অন্তত ৭ দিন পর্যন্ত ঐ ক্ষেতের ফসল বিক্রি অথবা খাওয়া যাবে না।

অথবা, এই রোগ দমনের জন্য ঘরে তৈরি বোর্দ মিশ্রণ (ছত্রাকনাশক) আক্রান্ত গাছে ছিটানো যেতে পারে। এক শতাংশ জমির জন্য এই বোর্দ মিশ্রণ তৈরির করতে ১৭.৫ লিটার পানির সাথে ৩৫০ গ্রাম পাথুরে চুন ও অন্য ১৭.৫ লিটার পানির সাথে ৩৫০ গ্রাম তুঁতে আলাদা আলাদা ভাবে মাটির পাত্রে মিশাতে হবে। পরবর্তীকালে এই দুই মিশ্রণ পুনরায় অপর এক মাটির পাত্রে ভালোভাবে মিশাতে হবে এবং আক্রান্ত গাছে ছিটাতে হবে। ১৫ দিন পর পর এভাবে নতুন মিশ্রণ তৈরি করে ছিটাতে হবে।

৩) ফসল তোলার পর গাছের পরিত্যাক্ত অংশ পুড়ে ফেলতে হবে।

১.৩.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

জাতভেদে বীজ বপনের ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করতে হয়। প্রতিদিনই বা ২/১ দিন পর পর শসা সংগ্রহ করা যায়। কচি অবস্থায় শসা সংগ্রহ করলে গাছে অধিক সংখ্যক ফলে। সালাদ, আচার ইত্যাদির জন্য কচি অবস্থায় তোলা উচিত। শসার তরকারী করতে হলে সেগুলো কিছু বয়স্ক করে তোলা উচিত। উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করলে হেক্টরপ্রতি ১০-২০ টন শসা সংগ্রহ করা যায়।

শসা পচনশীল বলে দ্রুত বাজারজাত করতে হয়। গাছে ভালোভাবে পাকানো শসা প্রায় সপ্তাহখানেক সংরক্ষণ করা যায়।

১.৪ করলা (Bitter gourd)

করলা একবর্ষজীবি উদ্ভিদ। এটি তিতা হলেও খাদ্যমান ও ঔষধি গুণাবলীর ধরুন অনেকের কাছে বেশ উপাদেয় একটি সবজি। এটি বহুমূত্র (Diabetes), বাত, হাঁপানি ও চর্মরোগের চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নরসিংদী জেলায় প্রচুর করলার চাষ হয়। একই করলা গাছে আলাদাভাবে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল ফোটে। ফুলের রং হলুদ। বাংলাদেশে দুই ধরণের করলার চাষ হয়ে থাকে। আকারে বড় ও লম্বা হলে তাকে করলা বলা হয় এবং আকারে অত্যন্ত ছোট, প্রায় গোলাকার বা কিছুটা লম্বা (ডিম্বাকৃতির) হলে তাকে উচ্ছে বলা হয়।

১.৪.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

সবজির পরিচিতি ও ব্যবহার: করলা তিতা হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সবজি। করলা এদেশে গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে চাষ হয়। করলা সাধারণত কাঁচা ও কচি অবস্থায় সবজি হিসেবে রান্না করে খাওয়া হয়। এর কচি

ডগা পার্বত্য চট্টগ্রামে শাক হিসেবে রান্না করে খাওয়া হয়। কচি পাতা ও কাঁচা করলার রস বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসেবে খাওয়া হয়। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে পেঁয়াজ ও আলু-করলার ভাজি একটি জনপ্রিয় খাবার। করলায় কিউকারবিটাসিন নামক রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতির কারণে স্বাদ তিতা হয়। জাপান ও চীনে অনেকে করলাকে দীর্ঘ জীবন লাভের গোপন রহস্য বলে মনে করে।

বৈজ্ঞানিক নাম: বৈজ্ঞানিক নাম *Momordica charantia*

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম করলায় ৮৩.২ গ্রাম জলীয় অংশ, ১.৪ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ১.৭ গ্রাম আঁশ, ৬০ কিলোক্যালরি খাদ্য শক্তি, ২.১ গ্রাম আমিষ, ১.০ গ্রাম চর্বি, ১০.৬ গ্রাম শর্করা, ২৩ মিগ্রা ক্যালসিয়াম, ২.০ মিগ্রা লৌহ, ১২৬ মাইক্রো গ্রাম ক্যারোটিন এবং ৯৬ মিগ্রা ভিটামিন-সি রয়েছে।

উৎপত্তি: উৎপত্তি ভারতীয় উপমহাদেশ।

জলবায়ু ও মাটি: উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় করলা ভাল হয়। শুষ্ক আবহাওয়াতে এটি জন্মানো যায়। করলা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। আবার অতিবৃষ্টি পরাগায়নে বাধা সৃষ্টি করে। বীজ অংকুরোদগমের জন্য ৩০-৩৫° সে. তাপমাত্রা উত্তম। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে করলা ভাল হয়। সারাদিন রোদ পড়ে এমন উঁচু জায়গায় করলা চাষ উত্তম। এটি সামান্য ক্ষারযুক্ত মাটিতে এবং কিছুটা অম্লীয় মাটিতেও চাষ হয়। করলা চাষের জন্য মাটির উপযোগী p^H ৫.৫-৬.৭।

উৎপাদন মৌসুম: খরিপ মৌসুম।

জাত পরিচিতি: বারি করলা-১, বারি করলা-২, বারি করলা-৩, বারি করলা-৪, গজ করলা, বারি হাইব্রিড করলা-২, বারি হাইব্রিড করলা-৩, টিয়া

বীজ বপনের সময়: ফেব্রুয়ারি-মার্চ (ফাল্গুন-চৈত্র)

বীজহার: প্রতি শতক বীজতলায় করলার বীজের পরিমান ২৪ - ২৮ গ্রাম(হেক্টরপ্রতি ২৪০০-২৮০০ গ্রাম)। করলা ও উচ্ছের জন্য হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৬ থেকে ৭.৫ ও ৩ থেকে ৩.৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ শোধন: বীজবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং সবল সতেজ চারা উৎপাদনের জন্য বীজ শোধন জরুরী। কেজিপ্রতি ২ গ্রাম ভিটাভেক্স/ক্যাপটান ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

বীজ বপনের জন্য ৮ x ১০ সেমি বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ/পটে ব্যবহার করা যায়। প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। মাটিতে বীজ গজানোর জন্য মাটির উপযুক্ত আর্দ্রতা (`জো` অবস্থা) নিশ্চিত করে (মাটি জো অবস্থায় না থাকলে পানি দিয়ে জো করে নিতে হবে) তা পলিব্যাগে ভরতে হবে। অত:পর প্রতিব্যাগে ১টি করে বীজ বুনতে হবে। বীজের আকারের ২ গুণ মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে। করলার বীজের খোসা কিছুটা শক্ত। তাই বীজ বপনের আগে ১৫-২০ ঘন্টা বীজ পানিতে ভিজিয়ে নিলে সহজে বীজের অংকুরোদগম হয়।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

ক) রোদ ও বৃষ্টির হতে থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বীজতলার উপর শেড দিতে হবে।

গ) চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে। পলিব্যাগের মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

ঘ) করলার চারাগাছে 'রেড পাম্পকিন বিটল' নামে এক ধরনের লালচে পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়।

১.৪.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি- সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। এরপর জমিকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের প্রস্থ ১.০ মিটার এবং উচ্চতা ১৫-২০ সেমি হবে। দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি করতে হবে।

মাদা (গর্ত) প্রস্তুতকরণ- করলার ক্ষেত্রে সারিতে ১.৫ মিটার এবং উচ্ছের ক্ষেত্রে ১.০ মিটার দূরে দূরে ৪০ সেমি x ৪০ সেমি x ৪০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে।

করলার সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	মোট পরিমান (প্রতি শতক)	জমি তৈরির সময় (প্রতি শতক)	প্রতি মাদায় সারের পরিমান (মোট মাদা ২০টি)				
			চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পরে
গোবর/ কম্পোস্ট	৮০ কেজি	৪০ কেজি	২ কেজি	-	-	-	-
ইউরিয়া	১০০০ গ্রাম	-	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম
টিএসপি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	১৮ গ্রাম	-	-		-
এমওপি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-		-
জিংক সালফেট	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-		-

ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৫০ গ্রাম	-	২.৫ গ্রাম	-	-	-	-	-

১.৪.৩ বীজ বপন/চারা রোপণ: করলার বীজের ত্বক পুরু ও শক্ত বিধায় ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে বীজ তাড়াতাড়ি গজায়। উচ্ছে ও করলার বীজ সরাসরি মাদায় (৪০X৪০X৪০ সেমি) বোনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি মাদায় কমপক্ষে ২টি বীজ বপন অথবা পলিব্যাগে উৎপাদিত ১৫-২০ দিন বয়সের চারা রোপণ করতে হবে। মাদায় বীজ বুনতে বা চারা রোপণ করতে হলে অন্তত: ৭-১০ দিন আগে মাদায় নির্ধারিত সার প্রয়োগ করে তৈরী করে নিতে হবে। ৭-১২ দিনের মধ্যে বীজ গজায়।

১.৪.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): বপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে বীজ না গজালে বা চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া: করলার কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। এতে করলার গুণগত মানও ভাল হয়। চারা ২০-২৫ সেমি লম্বা হলে করলার জমিতে ১- ১.৫ মিটার উঁচু করে মাচা বা বাউনি তৈরি করতে হয়। উচ্ছে গাছের জন্য মাচা তৈরি না করে মাটিতে খড় বিছিয়ে তার উপর গাছ লতিয়ে দেয়া যায়।

আগাছা দমন: হাতিশুঁড় আগাছা দমন করতে হবে। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। কাজেই চারা গজানো বা রোপণের পর থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদা প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ার ১০-১৫ সেমি দূরে মাদার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ: পানির অভাবে করলা গাছে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন- চারার বৃদ্ধি কমে যাওয়া, গাছ নেতিয়ে আসা, ফুল কম ফোটা ও ঝরে যাওয়া, ফল ঝরে যাওয়া, কচি ফল বড় না হওয়া ইত্যাদি। সেচ দিলে এসব সমস্যা কেটে যায়। মাদার মাটি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই সেচ দিতে হবে। সাধারণত: খরার সময় সেচ দিতে হয়। জুন-জুলাই মাসে বর্ষা শুরু হলে আর সেচ দিতে হয় না। তখন নিকাশ নালার ঘাস পরিষ্কার রাখতে হয় যাতে বৃষ্টির পানি সহজে ক্ষেত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

মালচিং (আচ্ছাদন): বীজ বপনের পর মাদায় মালচিং করা হলে সহজে বীজ গজায়। প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিয়ে বায়ু চলাচল সহজ করতে হবে। বর্তমানে প্লাস্টিক মালচ ব্যবহার করা হচ্ছে।

শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখা (ডালপালা) গুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে দিলে শারীরিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং আন্তঃকর্ষণের কাজে সহায়তা করে। চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর শাখা ভাঙ্গার কাজ শুরু করা যায়। এরপর ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার শাখা ছাঁটাই করা যায়।

কৃত্রিম পরাগায়ন: অধিক ফলনের জন্য সকাল ৯.০০ টা হতে দুপুর ২.০০ টার মধ্যে কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

করলার মাছি পোকা

এ পোকা করলার ফলের মধ্যে প্রথমে ডিম পাড়ে, পরবর্তীতে ডিম থেকে কীড়া বা বাচ্চা (Larva) বের হয়ে ফলের ভেতরে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।

রোগবালাই দমন

ক) লিফ কার্ল রোগ

এটি একটি ভাইরাস জনিত রোগ। সাদা মাছি দ্বারা ভাইরাস ছড়ায় । আক্রান্ত গাছ খর্বাকৃতি হয় । পাতার গায়ে টেউয়ের মত ভাজের সৃষ্টি হয়, কুঁচকে যায় । বয়স্ক পাতা পুরু ও মচমচে হয়ে যায় । অতিরিক্ত শাখা প্রশাখা বের হয় ও ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা

১. আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধ্বংস করা। ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে।
২. রোগাক্রান্ত গাছ থেকে কোনো বীজ সংগ্রহ ও ব্যবহার না করে রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে ।
৩. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত ব্যবহার করতে হবে ।
৪. সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।
৫. আক্রমনের মাত্রা জানতে হবে এবং পোকা দমনে হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।
৬. জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি নিম তেল ও ৫ মিলি ট্রিক্স মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ৩-৫ বার স্প্রে করতে হবে। অথবা ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন ডায়ামেথয়েট, এসাটাফ, এডমায়ার, টিডো এর যে কোন একটির ১০ মিলি /২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

গ) মোজাইক রোগ:

এটি ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগ হলে গাছে হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয়।

দমন

- ক্ষেত থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে।

- জাব পোকা ও সাদা মাছি এ রোগের বাহক, তাই এদের দমনের জন্য ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক যেমন: এডমায়ার ১ মি.লি. / লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে।
- সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

১.৪.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

করলা সংগ্রহের সময় নির্ধারণ: করলা তোলার সঠিক সময় হল ফলের চামড়া হলুদ হওয়ার ঠিক পূর্বে সংগ্রহ করতে হয় এবং জাতভেদে প্রায় ৮ থেকে ১৫ সেমি (৩ থেকে ৬ ইঞ্চি) আকারের হয়। চারা গজানোর ৩৫-৪০ দিন পর গাছে ফুল আসা শুরু হয়। চারা গজানোর ৪৫-৪৫ দিন পর উচ্ছের গাছ ফল দিতে থাকে। করলার বেলায় প্রায় ২ মাস লেগে যায়। স্ত্রী ফুলের পরাগায়নের ১৫-২০ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। ফল আহরণ একবার শুরু হলে তা দুমাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

ফসল সংগ্রহ: সাধারণত হাত দিয়ে ধারালো চাকু দিয়ে করলা সংগ্রহ করতে হয়।

ফলন: উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে উচ্ছে ও করলার হেক্টর প্রতি ফলন যথাক্রমে ৭-১০ টন (৩০-৪০ কেজি/শতাংশ) এবং ২০-২৫ টন (৮০-১০০ কেজি/শতাংশ) পাওয়া যায়।

সংরক্ষণ: স্বল্প পরিসরে সাধারণত ৩-৪ দিন সংরক্ষণ করা যায়। প্যাকেজিং এর জন্য র‍্যাপিং পেপার, পারফোরেটেড পেপার, ঝুড়ি, খাঁচা, প্লাস্টিক কেস ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

১.৫ চিচিঙ্গা (Snake gourd)

চিচিঙ্গা গাছ একবর্ষজীবী লতানো গুল্ম প্রকৃতির উদ্ভিদ। ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, চীন প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে চিচিঙ্গার চাষ হয়। এটি বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই চাষ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বনে ও জুমে বুনো প্রকৃতির চিচিঙ্গা দেখা যায়। চাষকৃত চিচিঙ্গার ফল লম্বা, কিন্তু বুনো চিচিঙ্গার ফল খাটো।

১.৫.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

সবজির পরিচিতি ও ব্যবহার: চিচিঙ্গা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের একটি অন্যতম প্রধান সবজি। এর অনেক ঔষধী গুণ আছে। চিচিঙ্গা বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে রেখা, কুশি, কইডা, কইধা, কইড্যা ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই লম্বা, সর্প-সদৃশ সবজিটি আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয় এবং বাজারেও অধিক পরিমানে পাওয়া যায়।

এ সবজিটি বেশ পুষ্টিকর। প্রধানত: সবজি হিসেবে রান্না করে খাওয়া হয়। চিংড়ি চিচিঙ্গা চচ্চড়ি বা ভাজি একটি উপাদেয় খাবার। চিচিঙ্গা দিয়ে স্যুপ তৈরি করা হয়। চিচিঙ্গা পাতার রস মাথার খুশকি দূর করতে ব্যবহার করা হয়।

বৈজ্ঞানিক নাম: বৈজ্ঞানিক নাম *Trichosanthes cucumerina*

পুষ্টিমান: চিচিঙ্গার প্রায় ৯৫ শতাংশই পানি। বাকী ৫ শতাংশের মধ্যে ৩.২-৩.৭ শতাংশ আছে শর্করা ও ০.৪-০.৭ শতাংশ আছে আমিষ। প্রতি ১০০ গ্রাম চিচিঙ্গায় আছে ৩৫-৪০ মিগ্রা ক্যালসিয়াম ও ০.৫-০.৭ মিগ্রা লৌহ। চিচিঙ্গার কিছু ভেষজ গুণ আছে।

উৎপত্তি: দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চিচিঙ্গার উৎপত্তি।

জলবায়ু ও মাটি: উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় চিচিঙ্গা ভালো জন্মে। বীজের অংকুরোদগম ও গাছের ভালো বৃদ্ধির জন্য উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োজন। যেমন, দিনের বেলায় ২৫-২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং রাতের বেলায় ১৮-২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। মোটামুটি শুষ্ক আবহাওয়াতেও ভালো জন্মে।

চিচিঙ্গা চাষের জন্য যেমন অধিক পানির প্রয়োজন হয়, অন্য দিকে এটি আবার জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে এর পরাগায়ন বিঘ্নিত হতে পারে। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি চিচিঙ্গা চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। চিচিঙ্গা চাষের জন্য মাটির উপযোগী p^H ৬.৫-৭.৫।

উৎপাদন মৌসুম: খরিপ মৌসুম।

জাত পরিচিতি

১। বারি চিচিঙ্গা-১: এটি উচ্চফলনশীল জাত এবং সারাদেশে চাষ উপযোগী। জাতটিতে গাছ প্রতি গাঢ় সবুজ রংয়ের ৪০-৪৫ টি ফল ধরে। প্রতি ফলের গড় ওজন ১০০-১৩০ গ্রাম যা লম্বায় ২৭-৩০ সেমি এবং ব্যাস ৫-৬ সেমি।হেক্টর প্রতি ফলন ২৫-৩০ টন পাওয়া যায়।বীজ বপনের ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে ১ম ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল সাধারণত ১৬০-১৭০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়।

২। বিইউ (BU) চিচিঙ্গা-১

৩। **ঝুম লং:** বিএডিসি এ জাতের বীজ উৎপাদন করছে। এর ফল নীলাভ কালচে সবুজ ও দীর্ঘ। হালকা সবুজ ও অপেক্ষাকৃত খাটো (৩০-৪০ সেমি) ফলধারী 'সাদা সাভারী' নামে আরো একটি জাত অনেকের কাছে বেশ জনপ্রিয়।

তাছাড়া তিস্তা, তুরাগ, সুরমা, রূপসা, বিভিন্ন জাত এদেশে চাষ হয়।

বীজ বপনের সময়: শীতের দু'তিন মাস বাদ দিলে বাংলাদেশে বছরের যেকোনো সময় চিচিঙ্গা চাষ করা যায়। ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে চিচিঙ্গার চাষ করলে সবচেয়ে ভালো ফলন হয়। তবে শীতকালে চাষ করলে গাছের বৃদ্ধি কম হওয়ায় ফলনও একটু কম হয়।

বীজহার: চিচিঙ্গার জন্য হেক্টর প্রতি ৪-৫ কেজি (১৬-২০ গ্রাম/শতাংশ) বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ শোধন: বীজবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং সবল সতেজ চারা উৎপাদনের জন্য বীজ শোধন জরুরী। কেজিপ্রতি ২ গ্রাম ভিটাভ্যাক্স/প্রোভ্যাক্স ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

পলিব্যাগে অর্ধেক গোবর ও অর্ধেক মাটি মিশিয়ে ভরে প্রতিটি পলিব্যাগে একটি করে চিচিঙ্গার বীজ পুঁতে চারা তৈরি করে নেয়া যায়। বীজের খোসা শক্ত হলে বীজ বোনার আগে ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে বীজ তাড়াতাড়ি গজায়। চারা ১৫ থেকে ২০ দিন বয়সের হলে তা জমিতে লাগানোর উপযুক্ত হয়।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

ক) রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বীজতলার উপর শেড দিতে হবে।

গ) চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে। পলিব্যাগের মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

ঘ) চিচিঙ্গার চারাগাছে 'রেড পাম্পকিন বিটল' নামে এক ধরনের লালচে পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়।

১.৫.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি- সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। এরপর জমিকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের প্রস্থ ১.০ মিটার এবং উচ্চতা ১৫-২০ সেমি হবে। দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি করতে হবে।

মাদা (গর্ত) প্রস্তুতকরণ- চিচিঙ্গার ক্ষেত্রে সারিতে ১.৫ মিটার দূরত্বে ৪০ সেমি x ৪০ সেমি x ৪০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে। বীজ বপন/ চারা রোপণের ১০ দিন আগে মাদা তৈরি করে নির্ধারিত সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	মোট পরিমান (প্রতি শতক)	জমি তৈরির সময় (প্রতি শতক)	প্রতি মাদায় সারের পরিমান				
			চারা রোপণের ১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পরে
গোবর সার	৮০ কেজি	৪০ কেজি	২ কেজি	-	-	-	-
ইউরিয়া	৯০০ গ্রাম	-	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	৫ গ্রাম
টিএসপি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	১৮ গ্রাম	-	-		-
এমওপি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-		-
জিংক সালফেট	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-		-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৫০ গ্রাম	-	২.৫ গ্রাম	-	-	-	-

বীজ/চারা বপন/রোপণ: চিচিঙ্গার বীজের ত্বক পুরু ও শক্ত বিধায় ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে বীজ তাড়াতাড়ি গজায়। চিচিঙ্গার বীজ সরাসরি মাদায় (৪০X৪০X৪০ সেমি) বোনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি মাদায় কমপক্ষে ২টি বীজ বপন অথবা পলিব্যাগে উৎপাদিত ১৫-২০ দিন বয়সের চারা রোপণ করতে হবে। মাদায় বীজ বুনতে বা চারা রোপণ করতে হলে অন্তত: ১০ দিন আগে মাদায় নির্ধারিত সার প্রয়োগ করে তৈরী করে নিতে হবে। ৮-১২ দিনের মধ্যে বীজ গজায়।

১.৫.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): বপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে বীজ না গজালে বা চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া: চিচিঙ্গার কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। এতে চিচিঙ্গার গুণগত মানও ভাল হয়। চারা ২০-২৫ সেমি লম্বা হলে চিচিঙ্গার জমিতে ১- ১.৫ মিটার উঁচু করে মাচা বা বাউনি তৈরি করতে হয়।

আগাছা দমন: হাতিশুঁড় আগাছা দমন করতে হবে। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। কাজেই চারা গজানো বা রোপণের পর থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদা প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ার ১০-১৫ সেমি দূরে মাদার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ: পানির অভাবে চিচিঙ্গা গাছে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন- চারার বৃদ্ধি কমে যাওয়া, গাছ নেতিয়ে আসা, ফুল কম ফোটা ও ঝরে যাওয়া, ফল ঝরে যাওয়া, কচি ফল বড় না হওয়া ইত্যাদি। সেচ দিলে এসব সমস্যা কেটে যায়। মাদার মাটি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই সেচ দিতে হবে। সাধারণত: খরার সময় সেচ দিতে হয়। জুন-জুলাই মাসে বর্ষা শুরু হলে আর সেচ দিতে হয় না। তখন নিকাশ নালার ঘাস পরিষ্কার রাখতে হয় যাতে বৃষ্টির পানি সহজে ক্ষেত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সার উপরিপ্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে।

মালচিং (আচ্ছাদন): বীজ বপনের পর মাদায় মালচিং করা হলে সহজে বীজ গজায়। প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিয়ে বায়ু চলাচল সহজ করতে হবে। বর্তমানে প্লাষ্টিক মালচ ব্যবহার করা হচ্ছে।

শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখা (ডালপালা) গুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে দিলে শারীরিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং আন্তঃকর্ষণের কাজে সহায়তা করে। চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর শাখা ভাঙ্গার কাজ শুরু করা যায়। এরপর ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার শাখা ছাঁটাই করা যায়।

কৃত্রিম পরাগায়ন: অধিক ফলনের জন্য কৃত্রিম পরাগায়ণ অবশ্যই সকাল ৬.০০ ঘটিকা থেকে ৯.০০ ঘটিকার মধ্যেই সমাপ্ত করতে হবে।

ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগ দমন

ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

ক) চিচিঙ্গার মাছি পোকা

এ পোকা লাউয়ের ফলের মধ্যে প্রথমে ডিম পাড়ে, পরবর্তীতে ডিম থেকে কীড়া বা বাচ্চা (Larva) বের হয়ে ফলের ভেতরে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।

চিত্র: মাছি পোকা আক্রান্ত চিচিঙ্গা

চিত্র: রেড পাম্পকিন বিটল পোকা

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

খ) রেড পাম্পকিন বিটল: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

গ) চারা গাছে কাটুই পোকার আক্রমণ: কাটুই পোকার আক্রমণ ঠেকাতে- “সাইকন” ১০ লি: পানিতে ২০ মিলি “সাইকন” মিশিয়ে বিকেল বেলা স্প্রে করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

ঘ) পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকাঃ এই পোকা পাতার উপর বসে রস চুষে খেয়ে পাতার উপর থেকে নিচ বরাবর সুড়ঙ্গ করে ফেলে। এর ফলে পুরো পাতাই আঁকাবাঁকা দাগের মত দেখায় এবং পরিশেষে পাতাটি মারা যায়।

দমন

টোপাম্যাক ৭০ ডব্লিউ জি কীটনাশক প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ শতক জমির জন্য ২ গ্রাম, মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। প্রবাহমান গুণসম্পন্ন হওয়ায় দ্রুত গাছের ভিতরে প্রবেশ করে ফলে আক্রান্ত ফসলের ভিতরে থাকা পোকা মারা যায়। টোপাম্যাক স্প্রে করার ১৪ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া যাবেনা। সকল ধরণের বালাইনাশক বিকেলে ব্যবহার করা উত্তম।

রোগবালাই দমন

ক) পাতা কোকড়ানো রোগ: এ রোগ হলে পাতা কুঁকড়ে যায় এবং পাতা ছোট হয়ে যায়। পাতা হলদে হয়ে যায়, বয়স্ক পাতা শক্ত ও মচমচে হয় এবং গাছ খাটো হয়ে যায়। বাহক পোকার মাধ্যমে চিচিঙ্গার পাতা

কোকড়ানো রোগ হয়। তাই বাহক পোকা দমন-ই ভাইরাস ঠেকানোর একমাত্র উপায়। বাহক পোকা দমনে ব্যবহার করুন টোপাম্যাক ৭০ ডব্লিউ জি। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ শতক জমির জন্য ২ গ্রাম, একর প্রতি মাত্রা ৪০ গ্রাম, হেক্টর প্রতি মাত্রা ১০০ গ্রাম।

খ) হোয়াইট মোল্ডঃ এ রোগের আক্রমনে কান্ড ও ফলে সাদা তুলার মত দাগ দেখা যায় এবং ওখান থেকে ফলটি পচে যায়। হোয়াইট মোল্ড দমনে ট্রিয় অত্যন্ত কার্যকরী ছত্রাকনাশক।

চিত্র: হোয়াইট মোল্ড রোগ

অধিক ফলন পেতে স্প্রে করুন "ফসলি গোল্ড" ২০ মিলি ফসলি গোল্ড ১০ লি: পানিতে মিশিয়ে প্রতি ২০-২৫ দিন পর পর স্প্রে করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

১.৫.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

চিচিঙ্গা সংগ্রহের সময় নির্ধারণ: চিচিঙ্গা তোলার সঠিক সময় হল ফলের চামড়া হলুদ রঙের কিছুটা দাগের সাথে সবুজ হয়ে যায় এবং জাতভেদে প্রায় ৭.৫ থেকে ১৫ সেমি (৩ থেকে ৬ ইঞ্চি) আকারের হয়।

ফসল সংগ্রহ: চারা গজানোর ৬০-৭০ দিন পর চিচিঙ্গার গাছ ফল দিতে থাকে। স্ত্রীফুলের পরাগায়নের ১০-১৩ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। শাঁস নরম ও কচি থাকা অবস্থায় ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল আহরণ একবার শুরু হলে তা দুই আড়াই মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। চিচিঙ্গা জমি থেকে উঠানোর পর ২ দিন পর্যন্ত সজীব থাকে। চিচিঙ্গা গাছে বয়স্ক হলে ফেটে যায়। সবজি সংগ্রহের সময় যাতে আঘাত না পায় সেজন্য প্লাস্টিকের বাক্স বা ছালার বস্তা ব্যবহার করা যায়।

ফলন: উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে চিচিঙ্গার হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৫ টন (৮০-১০০ কেজি/শতাংশ)। সাধারণত হাত দিয়ে ধারালো চাকু দিয়ে করলা সংগ্রহ করতে হয়।

সংরক্ষণ: উপরে খড়ের ছাউনি এবং বাঁশ/পাটখড়ির বেড়া দিয়ে ঘর তৈরি করে মাঝে মাঝে তার দেয়াল ও ছাদ পানি দিয়ে সে ঘরে ২/১ দিন রাখা যায়, কেননা তাতে ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ঠান্ডা হয়।

১.৬ পটল (Pointed gourd)

পটল একটি জনপ্রিয় সবজি। পটল বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সবজিসমূহের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের সর্বত্র পটল জন্মেনা অথবা জন্মানো হয় না। রংপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বগুড়া, পাবনা, যশোর, খুলনা এলাকায় বানিজ্যিকভাবে পটলের চাষ হয়। বসতবাড়িতে পটলের চাষ কদাচিৎ দেখা যায়। বাংলাদেশের মোট সবজির চাহিদার প্রায় ২০ শতাংশ পটল পূরণ করে থাকে।

১.৬.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

পটলের পরিচিতি ও ব্যবহার

পটল একটি দীর্ঘমেয়াদী ফসল, যা মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত উৎপাদন করা যায়। শীত বেশি হলে গাছের কান্ড মারা যায়, কিন্তু এর কন্দাল শিকড় সুপ্ত অবস্থায় বেঁচে থাকে। পটল খরিপ মৌসুমের সবজি হলেও বর্তমানে সারাবছর ধরেই পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বাজারে যখন অন্যান্য সবজি কম পাওয়া যায়। তখন পটল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পটলের পুরুষ ও স্ত্রীফুল আলাদা আলাদা গাছে উৎপন্ন হয়। তরকারি, পটলের খোসার ভর্তা এবং ভাজি করে পটল খাওয়া হয়ে থাকে। পটল সহজেই হজম হয়। অনেকের ধারনা এটি গ্যাস্ট্রিক ও হৃদরোগের জন্য উপকারী।

বৈজ্ঞানিক নাম: বৈজ্ঞানিক নাম *Trichosanthes dioica.*

পুষ্টিমান: ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য পটলে ৯৪% জলীয় অংশ, ৪.১ গ্রাম শ্বেতসার, ২.৪ গ্রাম আমিষ, ২০মিগ্রা ক্যালসিয়াম, ১.৭ মিগ্রা লৌহ, ০.৩ মিগ্রা ভিটামিন বি-১, ০.০৩ মিগ্রা ভিটামিন বি-২, ২.০ মিগ্রা ভিটামিন সি, ক্যারোটিন ৭৯০ মাইক্রোগ্রাম রয়েছে।

উৎপত্তি: ভারত উপমহাদেশ পটলের উৎপত্তি স্থল।

জলবায়ু ও মাটি

প্রখর তাপমাত্রা ও প্রচন্ড রোদ পটল আবাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বৃষ্টিপাতের পরিমান বেশি হলে ফুলের পরাগায়ন ব্যাহত হয়। পটল বেশ খরা সহিষ্ণু তবে পানির ঘাটতি দীর্ঘায়িত হলে ফলন কমে যায়। বন্যামুক্ত ও সুনিষ্কাশিত পলি, দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ মাটি পটল চাষের জন্য উত্তম। মাটির অম্লমান (pH) ৬.০-৬.৫ পটল চাষের জন্য উত্তম।

উৎপাদন মৌসুম: পটল একটি গ্রীষ্মকালীন সবজি।

জাত পরিচিতি

উচ্চ ফলনশীল জাত: বারি পটল-১, বারি পটল-২

স্থানীয় জাত: বালি, মুর্শিদাবাদী, কানাইবাঁশী ইত্যাদি।

বপন সময়

ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ৪-৫টি গিট বিশিষ্ট পটল লতা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসেও (আগাম) রোপণ করা যায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে পানের বরজে ছায়াদানকারী গাছ হিসেবে অক্টোবর মাসে পটল লাগানো হয়। চরাঞ্চলে বর্ষজীবী ফসল হিসেবে প্রতি বছর অক্টোবর মাসে পটল চাষ করা হয়।

চারা উৎপাদন

জমিতে রোপণের পর মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা না থাকলে শাখা কলম শুকিয়ে মারা যায়। এক্ষেত্রে পলিব্যাগে চারা গজিয়ে জমিতে রোপণ করে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রতি পলিব্যাগে ১ গিটবিশিষ্ট ২টি কাটিং রোপণ করে খড় বিছলির আস্তর দিয়ে তার উপর প্লাস্টিকের আবরণ দেয়া হয়। এতে যে চারা তৈরি হয় তাতে চারার জীবন কাল বৃদ্ধি পায় এবং ফলন ভালো হয়।

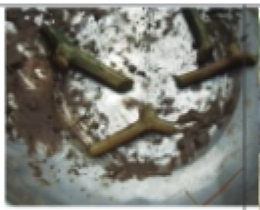

পটলের কাটিং

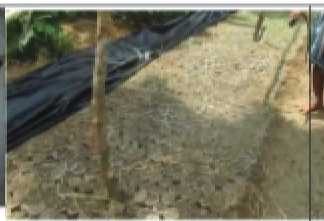

পলিব্যাগে মাটি ভরাটকরন মাটি ভরাটকরণ

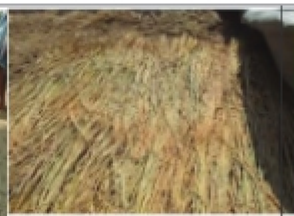

রোপণের পর খড়ের আস্তরণ মাটি ভরাটকরণ

পটলের কাটিংকৃত চারা

চিত্র: পলিব্যাগে শাখা কলমের মাধ্যমে চারা উৎপাদন

৪ দিন পর প্লাস্টিক অপসারণ করা হয়। ৫ দিন পর থেকে চারা গজানো শুরু হয়। ৫দিন পর খড় বিছলির আস্তর সরিয়ে দেয়া হয়। ৫-৮ দিনের মধ্যে প্রায় সব চারা গজিয়ে যায়।

বীজহার: লতা বা মোথার সংখ্যা একরে ৪,০০০টি (শতকে ৪০টি)।

১.৬.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে জমি প্রস্তুতকরণ- জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে। বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির হাত থেকে চারাকে রক্ষা করতে বেড করে পটলের মাদা তৈরি করতে হবে। জমিকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের প্রস্থ ১.০০ মিটার এবং উচ্চতা কমপক্ষে ১৫-২০ সেমি হবে। দুটি বেডের মাঝে ৫০ সেমি প্রশস্ত সেচ এবং নিকাশ নালা থাকতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জমি প্রস্তুতকরণ/মাদা তৈরি-বেডের কিনারা থেকে ৫০ সেমি ভিতরে মাদার কেন্দ্র ধরে ১.০ মিটার দূরে দূরে ৫০X৫০X৫০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	মোট পরিমান	জমি তৈরির সময়	মাদায় প্রয়োগ	উপরিপ্রয়োগ		
				১ম কিস্তি রোপণের ২০ দিন পর	২য় কিস্তি রোপণের ৬০ দিন পর	৩য় কিস্তি রোপণের ৯০ দিন পর
গোবর/ কম্পোস্ট	২০ কেজি	১০ কেজি	১০ কেজি	-	-	-
ইউরিয়া	৮০০ গ্রাম	-	-	২০ গ্রাম	২০ গ্রাম	২০ গ্রাম
টিএসপি	৬০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম			
এমওপি	৮০০ গ্রাম	-	-	২০ গ্রাম	২০ গ্রাম	২০ গ্রাম

জিপসাম	৪০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	-	-	-	-
জিংক সালফেট	২০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	-	-	-	-
খৈল	২ কেজি	২ কেজি	-	-	-	-	-

** পটলের ফলন প্রথম দিকে বেশি হয় এবং গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ফলনও কমতে থাকে। এ জন্য ফসল সংগ্রহের পর প্রতি মাসে, ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে গাছের চারপাশে ২০-৩০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০- ৩৫ গ্রাম টিএসপি ও ২০-৩০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করলে গাছে নতুন কুশি ও ফুল আসবে।

১.৬.৩ বীজ বপন/চারা রোপণ

বীজ, কন্দমূল, শাখা কলম/কাটিং (পুরাতন লতার খন্ড) দিয়ে পটলের বংশবিস্তার করা হয়। বীজ দ্বারা এর বংশবিস্তার করা হয় না কারণ- বীজের অংকোরদগম বা গজানো অনিয়মিত, শতকরা ৫০ ভাগ গাছ পুরুষ হয়। বীজ থেকে জন্মানো গাছে ফুল আসতে প্রায় ২ বছর সময় লাগে। অধিক ফলনের জন্য শাখাকলম (কাটিং) বা কন্দমূল ব্যবহার করা ভাল। কাটিং এর ক্ষেত্রে পরিপক্ক কান্ড ব্যবহার করা হয়। পটল গাছের কান্ড মারা গেলেও শিকড় জীবিত থাকে। ফলে এই শিকড় থেকেই আবার গাছ জন্মে। রোপণের আগে পটলের শিকড় গজিয়ে নিলে বেশি ভাল হয়।

সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে ১৫ সেমি গভীরতায় জমি খনন করে কাটিং রোপণ করতে হবে। কাটিং লাগানোর আগে কাটিংয়ের অগ্রভাগ মাটির উপর রেখে গোড়া জমির মধ্যে চেপে লাগাতে হয় এবং অগ্রভাগকে খড় বা বিচালী দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। প্রায় ২ সপ্তাহ পর চারা বা সাকার বের হয়। মাদার মাটি খুঁড়ে একপার্শ্বে রেখে তাতে নির্ধারিত মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার ভালভাবে মিশিয়ে ঐ সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে মাদা ভরাট করতে হবে এবং ৫-৭ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে। পলিব্যাগে চারা করে মূল জমিতে আগষ্ট মাসে লাগানো হলে ডিসেম্বর মাসে ফলন পাওয়া যায়। কাটিং এর ক্ষেত্রে, প্রায় ১ বছর বয়সের মোটা আকারের লতা ৫০ সেমি বা একটু বেশি লম্বা করে কেটে নিয়ে রিংয়ের মতো করে পেঁচিয়ে মূল জমিতে বেড়ে লাগানো যায়। এতে ৪-৫টি গিট মাটির নিচে থাকে এবং একটি গিট মাটির উপরে থাকে।

রোপণদূরত্ব: সারি-সারির দূরত্ব ১.৫ মিটার এবং লতা-লতার দূরত্ব ১.০-১.৫ মিটার। চারা বা মোথা রোপণের সময় ১০ টি স্ত্রীগাছের জন্য ১টি পুরুষ গাছ সুষ্ঠু পরাগায়নের জন্য রোপণ করতে হবে এবং পুরুষ গাছগুলো সমান দূরত্বে ছড়িয়ে লাগাতে হবে। পুরুষফুল স্ত্রীফুলের ১৫-২০ দিন পর জন্মায়। তাই পুরুষগাছ স্ত্রীগাছের ১৫-২০ দিন আগে রোপণ করা উচিত।

১.৬.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শূন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): বপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে বীজ না গজালে বা চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া: পটল লতানো প্রকৃতির উদ্ভিদ, তাই এগুলো মাটির উপর কিংবা খড় বিছিয়ে উৎপাদন করলে গায়ে সাদা সাদা ফ্যাকাশে বা হলুদ বর্ণের হয়ে পড়ে। এতে পটলের বাজারমূল্য এবং রফতানিযোগ্যতা কমে যায়। মাচা সাধারণত দুধরনের হয়- বাঁশের আনুভূমিক মাচা ও রশি দিয়ে তৈরি উলম্ব মাচা। প্রতি মাদার

২০১৪

জন্য ১টি করে মাচা দেওয়া হলে ফসলের পরিচর্যা ও পটল সংগ্রহ সুবিধা হয়। পটল গাছ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে জমিতে মাচা তৈরি করে এর গোড়ায় বাঁশের কঞ্চি বা কাঠি পুঁতে মাচায় তুলে দিতে হবে।
মাচার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে বেডের সমান এবং মাচার উচ্চতা হবে। ভূমি হতে ৮০ থেকে ১০০ সেমি। পটলের আকর্ষি তুলনামূলক ছোট হওয়ায় ছাউনি যত চিকন আকারের দেয়া যায় ততই ভাল। খাড়া বা উলম্ব মাচার ক্ষেত্রে, ৩ বেড পর পর একটি করে ২ মিটার উচ্চতার বাঁশের খুঁটি বসাতে হয়। মাটি হতে ৫০ সেমি উপরে রশির দ্বারা তৈরি ১.৫ মিটার উচ্চতার জালে (ছিদ্র ৫- ৭ সেমি আকারের) পটলের লতা বাইতে দেয়া হয়। বাউনি থেকে লতা সরে গেলে মাঝে মাঝে বাউনিতে পটলের লতা তুলে দিতে হয়।

আগাছা দমন: পটলের জমিতে সাধারণত হেলেঞ্চা, দূর্বা, দন্ডকলস এসব আগাছার উপদ্রব দেখা যায়। এসব আগাছা জমি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে পটল গাছকে দুর্বল করে দেয় এবং ফলন কমে যায়। মাঝে মাঝে নিড়ানি দিয়ে গাছের গোড়ার চারিদিকের মাটি আলগা করা ও আগাছা দমন করা উচিত। পটল গাছ একাধিক বছর বাঁচে, সেজন্য প্রথম বার ফসল সংগ্রহের পর গাছের যত্ন নিতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদা প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ার ১০-১৫ সেমি দূরে মাদার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ: পানির অভাবে পটল গাছে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন- চারার বৃদ্ধি কমে যাওয়া, গাছ নেতিয়ে আসা, ফুল কম ফোটা ও ঝরে যাওয়া, ফল ঝরে যাওয়া, কচি ফল বড় না হওয়া ইত্যাদি। সেচ দিলে এসব সমস্যা কেটে যায়। মাদার মাটি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই সেচ দিতে হবে। সাধারণত: খরার সময় সেচ দিতে হয়। জুন-জুলাই মাসে বর্ষা শুরু হলে আর সেচ দিতে হয় না। তখন নিকাশ নালার ঘাস পরিষ্কার রাখতে হয় যাতে বৃষ্টির পানি সহজে ক্ষেত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সার উপরিপ্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে।

মালচিং (আচ্ছাদন): পটল বপন করা বা চারা লাগানো হয় শুকনা মৌসুমে। তাই কলম বা চারা লাগানোর পর মাদায় বা গাছের গোড়ায় খড় বিছিয়ে দেয়া উচিত। মালচিং মাদায় আর্দ্রতা সংরক্ষণে সহায়তা করে।

প্রুনিং বা অংগছাঁটাই: পটল গাছ মাচায় উঠার আগ পর্যন্ত পার্শ্বশাখা ছাঁটাই করে দিতে হবে। পরবর্তিতে প্রতিবার ফসল সংগ্রহের পর মরা, রোগ ও পোকামাকড় আক্রান্ত পাতা ও শাখা ছাঁটাই করতে হবে। এতে ফলধারী নতুন শাখার সংখ্যা বেড়ে যায় এবং ফলন বেশি হয়।

কৃত্রিম পরাগায়ন: চারা লাগানোর ৯০ দিনের মাথায় পটলের ফুল আসতে শুরু করে। পটলের পরাগায়ন বাতাস ও কীটপতঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন হয়। পরাগায়ন না হলে ফুল শুকিয়ে ঝরে যায়। জমিতে শতকরা ৫-১০ ভাগ পুরুষ গাছ সুষম দূরত্বে থাকলে অধিক পরাগায়নের সম্ভাবনা থাকে। পরাগায়নের সময়কাল ভোর ৫টা থেকে সকাল ৮টা। পুরুষ ফুল সংগ্রহ করে পুংকেশর ঠিক রেখে পাঁপড়িগুলো ছিঁড়ে সদ্যফোটা স্ত্রীফুলের গর্ভমুন্ডে লাগিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করা যায়। এছাড়া পুরুষ ফুলের পরাগরেণু পানিতে মিশিয়ে ড্রপার দিয়ে এক

ফোঁটা করে প্রতি স্ত্রীফুলের গর্ভমুন্ডে লাগিয়েও ভাল ফল পাওয়া যায়। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৮-১০টি স্ত্রী ফুল পরাগায়ন করা যায়।

মুড়ি ফসল হিসেবে পটল

পটল গাছ থেকে প্রথম বছর ফসল সংগ্রহ করার পর গাছের গোড়া নষ্ট না করে রেখে দিয়ে পরবর্তী বছর পরিচর্যার মাধ্যমে গুড়ি চারা থেকে যে ফসল পাওয়া যায়, তাকেই মুড়ি ফসল বলে। উঁচু জমিতে পটলের মুড়ি ফসল করা হয়। এক্ষেত্রে অক্টোবর মাসে পটলের জমির আগাছা ও শুষ্ক পুরনো লতা ছেটে দেয়া হয়। কোদাল দিয়ে জমি কুপিয়ে দিতে হয়। এতে গাছ নতুনভাবে হয়। মুড়ি ফসলে মূল ফসলের অনুরুপ সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে হয়। মুড়ি ফসলে মূল ফসলের চেয়ে বেশি ফলন হয়। পটল গাছ একবার লাগালে ৩ বছর পর্যন্ত ফলন দিয়ে থাকে। পটল গাছে প্রথম বছর কম ফলন হয়। দ্বিতীয় বছর ফলন বেশি হয়, তৃতীয় বছর ফলন কমতে থাকে। একবার লাগানো গাছ ৩ বছরের বেশি রাখা উচিত নয়।

পোকামাকড় দমন

পটলের ক্ষেত নিয়মিত পরিস্কার রাখলে পোকামাকড়, রোগবালাইয়ের তেমন একটা আক্রমণ হয়না। তারপরও মাছি পোকা, কাঁঠালে পোকা, মিলিবাগ, উইপোকা ও কুমড়ার বিটল পোকার আক্রমণ হতে পারে। পরিচ্ছন্ন চাষ, ছাই, সেক্স ফেরোমন, বিষটোপ ইত্যাদির ব্যবহার ও বন্ধুপোকার সংখ্যা বাড়িয়ে এগুলো সহজেই দমন করা যায়।

পটলের রোগ

ক) নেমাটোড বা শিকড়ের গিট রোগ

পটলের নেমাটোড বা শিকড়ের গিট জাতীয় রোগ মারাত্বক সমস্যা। এর আক্রমণে গাছে ছোট-বড় অনেক গিটের সৃষ্টি হয়। ফলে এদের মূল নষ্ট হয়ে খাবার নিতে পারেনা। গাছ দুর্বল ও খাটো হয়ে পড়ে। ফলন মারাত্বক কমে যায়।

দমন

১. সরিষা, মরিচ, গম, ভুট্টা ইত্যাদি দ্বারা ফসল চক্র করে নেমাটোড রোগ নিয়ন্ত্রনে রাখা সম্ভব।
২. পটল রোপণের ২০-২৫ দিন পূর্বে ১৫-২০ কেজি মুরগির বিষ্ঠা বা সরিষার খৈল ১.৫-২.০ কেজি মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
৩. লতা লাগানোর সময় প্রতি শতকে ফুরাডান ৫জি বা কুরাটার ৫জি ১২৫-১৬০ গ্রাম এবং পরবর্তী ৪ মাস পর পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে।

খ) পাউডারি মিলডিউ রোগ

পাতার উপরের দিকে ও কান্ডে সাদা পাউডারের মতো ছত্রাকের জীবাণুর প্রলেপ পড়ে এবং পরে ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে সম্পূর্ণ পাতা শুকিয়ে যায়।

দমন

১. আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়ে ফেলতে হবে।

২. পরিমিত সার, সেচ প্রয়োগ করতে হবে।
৩. থিওভিট (০.২% বা ২ গ্রাম/লিটার পানি) বা টিল্ট (০.১% বা ১ মিলি/লিটার পানি) রোগ দেখা মাত্র ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

কচি অবস্থায় সকাল অথবা বিকালে পটল সংগ্রহ করতে হবে। সাধারণত জাতভেদে ফুল ফোটার ১০-১২ দিনের মধ্যে পটল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফসল এমন পর্যায়ে সংগ্রহ করা উচিত যখন একটি ফল পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু বেশি পরিপক্ক হয়নি। বেশি পরিপক্ক ফলের বীজ বেশি হয় এবং বীজ শক্ত হয়ে খাওয়ার অনুপয়োগী হয়ে যায়।
পটল সংগ্রহ-মৌসুম বেশ দীর্ঘ। পটল গাছে ফেব্রুয়ারি থেকে ফল ধরা শুরু হয়ে অক্টোবর পর্যন্ত ৯ মাস সংগ্রহ করা যায়। সপ্তাহে কমপক্ষে ১বার ফল সংগ্রহ করে বাজারজাত করা উচিত। ফলন ১২-১৫ টন/একর (১২০-১৫০কেজি/শতক)।

১.৭ কাঁকরোল (Teasel gourd)

কাঁকরোল কুমড়া গোত্রীয় সবজি হলেও এ গোত্রের অন্যান্য সবজির চেয়ে কাঁকরোল আলাদা। এর খোসার ছোট ছোট ঘন নরম কাঁটায় ভরা। কাঁকরোল এক ধরনের ছোট সবজি যা সাধারণত গ্রীষ্ম-বর্ষায় এদেশে কাঁকরোল হয়। কাকরোলের বীজ কাকরোল গাছের নিচে হয়ে থাকে যা দেখতে মিষ্টি আলুর মত। নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সাভার, যশোর প্রভৃতি জেলায় কাঁকরোল বেশি হয়।

১.৭.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

কাঁকরোলের পরিচিতি ও ব্যবহার: কাঁকরোল লতানো প্রকৃতির গুল্ম স্বভাবের গাছ। এদেশে দু ধরনের কাঁকরোল দেখা যায়-কাঁকরোল ও বন কাঁকরোল। কাঁকরোল চাষ করা হয়, বন কাঁকরোল হয় বনে-জঙ্গালে। কাঁকরোলে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা আলাদা গাছে উৎপন্ন হয়।
কাঁকরোলের ব্যবহার প্রধানত সবজি হিসেবে। এ গাছের কচি ফল ভাজি, ভর্তা ও তরকারি হিসেবে রান্না করে তবে কোন কোন দেশে কাঁকরোলের মূলও আলুর মতো খাওয়া হয়। শরীরের জন্য কাঁকরোল বেশ উপকারী ও পুস্টিকর। কাঁকরোল খেলে দেহে শক্তি আসে। কাঁকরোলে উচ্চ মাত্রায় লাইকোপেন আছে। ব্যথা, ফোলা ও ক্ষত সারাতে কাঁকরোল ব্যবহৃত হয়। কাঁকরোল নিয়মিত খেলে প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি কমে যায়। ত্বক ও চোখের জন্য কাঁকরোল খাওয়া ভালো।

বৈজ্ঞানিক নাম: কাঁকরোলের বৈজ্ঞানিক নাম *Momordica dioica.*

পুষ্টিমান: কাঁকরোলের ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ৮৪% জলীয় অংশ, ৭.৭ গ্রাম শ্বেতসার, ৩.১ গ্রাম আমিষ, ৩ গ্রাম আঁশ ও ১.১ গ্রাম বিভিন্ন খনিজ উপাদান রয়েছে। অল্প পরিমানে বিভিন্ন ধরণের ভিটামিনও আছে। কাঁকরোল প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, লৌহ, ভিটামিন বি-২ ও ক্যারোটিন আছে।

উৎপত্তি: ভারত উপমহাদেশ কাঁকরোলের উৎপত্তিস্থল ।

জলবায়ু ও মাটি: কাঁকরোলের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন। শীতকালে নিম্ন তাপমাত্রায় মোথা বা কন্দমূল গজায় না, গাছের বৃদ্ধিও হয় না। শীতশেষে তাপমাত্রা যখন বাড়তে থাকে তখন গাছ গজাতে ও বাড়তে শুরু করে। বন্যামুক্ত ও সুনিষ্কাশিত উঁচু থেকে কিঞ্চিত উঁচু অম্লময় দো-আঁশ থেকে এঁটেল দো-আঁশ মাটি কাঁকরোল চাষের জন্য উত্তম। তবে জৈব সার যোগ করে অন্যান্য মাটিতে কাঁকরোল চাষ করা যায়। কাঁকরোল জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না।

মাটির অম্লমান (pH) ৬.০-৬.৫ কাঁকরোল চাষের জন্য উত্তম।

উৎপাদন মৌসুম: কাঁকরোল একটি গ্রীষ্মকালীন সবজি।

জাত পরিচিতি

আমাদের দেশে কাঁকরোলের বিভিন্ন প্রকারের জাত আছে। এসব জাতের মধ্যে আসামি, মণিপুরি, মুকুন্দপুরি ও মধুপুরি অন্যতম। এ সকল জাতের ফলগুলো খেতে বেশ সুস্বাদু এবং ফলনও বেশি হয়।

আসামী: এ জাতের ফলগুলো সুস্বাদু, গোলাকার ও বেঁটে হয়ে থাকে।

মণিপুরী: এ জাতের ফল লম্বাটে ও অপেক্ষাকৃত চিকন, তবে ফলন বেশী দিয়ে থাকে।

বপন সময়

ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত কাঁকরোল চাষের জন্য উপযুক্ত সময়।

চারা উৎপাদন

বীজ থেকে কাঁকরোলের চারা তৈরি করা যায়। কিন্তু তা না করাই ভালো। কেননা বীজ থেকে মাত্র ৫০% চারা গজাতে পারে। তাছাড়া বীজ থেকে গজানো চারার বেশির ভাগ গাছই পুরুষ গাছ হয়ে থাকে। এছাড়াও বীজ থেকে গজানো গাছের ফলন কম হয় এবং জাতের গুনাগুণ ঠিক থাকে না। সেজন্য কন্দ বা মোথা থেকে কাঁকরোলের চারা তৈরি বা বংশবিস্তার করা হয়। গাছের আগা কেটে বালি বা মাটির মধ্যে ছায়া জায়গায় পুঁতে দিলে ১০-১৫ দিনের মধ্যে চারা হয়। কাটিং এর গোড়ায় শিকড় গজানো হরমোন লাগিয়ে দিলে দ্রুত শিকড় গজায়। তবে এতো ঝামেলা না করে জমিতে মাদা তৈরি করে সরাসরি কন্দমুল লাগানো উত্তম।

বীজহার: হেক্টরপ্রতি প্রতি মাদার সংখ্যা হবে ২০০০টি (শতকে ২০টি)।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিষ্কাশন ও সেচ সবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে জমি প্রস্তুতকরণ: জমিতে ভালোভাবে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে জমির উপরিভাগ সমান করে নিতে হবে। শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে। তারপর চাষকৃত জমিতে প্রয়োজনীয় মাপের বেড তৈরী করে নিতে হবে। জমি অব্যশই আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জমি প্রস্তুতকরণ/মাদা তৈরি: বেড তৈরির ক্ষেত্রে প্রস্থ নিতে হবে ২ মিটার ও জমির দৈঘ্য অনুযায়ী লম্বা করতে হবে। দুই বেডের মাঝে নালার প্রস্থ ও গভীরতা হবে যথাক্রমে ৩০ সেমি এবং ২০

সেমি। প্রতিটি বেডে ২ টি করে সারি রাখতে হবে। বেডে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২ মিটার। কাঁকরোল মাদায় চাষ করা ভাল। প্রতিটি সারিতে ৬০X৬০X৬০ সেমি আকারের গর্ত করে মাদা তৈরী করে নিতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

কাঁকরোলের শিকড় অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে খাবার সংগ্রহ করে। সেজন্য প্রচুর খাবার সরবরাহ করতে হবে।

সারের নাম	মোট পরিমান (শতাংশ প্রতি)	জমি তৈরির সময় (শতাংশ প্রতি)	মাদায় প্রয়োগ (চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে)	উপরিপ্রয়োগ			
				১ম কিস্তি রোপণের ১০-১৫ দিন পর	২য় কিস্তি রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	৩য় কিস্তি রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	৩য় কিস্তি রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
গোবর/ কম্পোস্ট	৮০ কেজি	২০ কেজি	১০ কেজি	-	-	-	-
ইউরিয়া	১২০০ গ্রাম	-	-	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম
টিএসপি	৯৫০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	-	-	-	-
এমওপি	৭০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	২০ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-
জিংক সালফেট	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৫০ গ্রাম	-	৮ গ্রাম		-	-	-

মোথা লাগানোর ১৫ দিন পূর্বে মাদায় সার, গোবর ও কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। মোথা লাগানোর আগে সব উপকরণ মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

১.৭.৩ বীজ বপন/চারা রোপণ

মাদায় ৪-৬ সেমি গভীরে কন্দমুল পুঁততে হবে। তারপর মাটি দিয়ে মাদা ঢেকে তার ওপর খড় বিছিয়ে দিতে হবে যাতে মাদার মাটি শুকিয়ে না যায়। প্রয়োজনে ২/১ দিন পর পর ঝাঁঝরি দিয়ে মাদায় সেচ দিতে হবে। রস না থাকলে কন্দ গজাবে ন আর বেশি রস থাকলে কন্দ পচে যাবে। রোপণের জন্য নির্বাচিত মোথার ৫% পুরুষ গাছের মোথা হতে হবে। কেননা কাঁকরোলের পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে জন্মে, তাই পরাগায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্ত্রী গাছের পাশাপাশি আনুপাতিক হারে পুরুষ গাছ থাকা দরকার। পুরুষ গাছে স্ত্রী

গাছের তুলনায় দেরিতে ফুল আসে। পুরুষ ফুল স্ত্রী ফুলের ১৫-২৯ দিন পর জন্মায়। তাই স্ত্রী গাছের মোথা লাগানোর ১৫-২০ দিন আগে পুরুষ গাছের মোথা লাগাতে হবে।

রোপণ দূরত্ব: সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২ মিটার ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ২ মিটার। আবার মাদা থেকে মাদার দূরত্ব হবে ২.৫ মিটার।

১.৭.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): বপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে বীজ না গজালে বা চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া: অধিক ফলনের জন্য গাছ ১০-১৫ সেমি হলেই উঁচু বাউনি/মাচা দিতে হবে। কাঁকরোলের গাছ ১০-১৫ সেমি লম্বা হলে গাছের গোড়ায় ১ টি করে কাঠি পুঁতে দিতে হবে। গাছ ৫০ সেমি লম্বা হলে মাচা করে দিতে হবে।

আগাছা দমন: মাঝে মাঝে নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করা ও আগাছা দমন করা উচিত। পটল গাছ একাধিক বছর বাঁচে, সেজন্য প্রথমবার ফসল সংগ্রহের পর গাছের যত্ন নিতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদা প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ার ১০-১৫ সেমি দূরে মাদার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ভাল ফলনের জন্য প্রচুর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। মাদার মাটি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই সেচ দিতে হবে। সাধারণত: খরার সময় সেচ দিতে হয়। জুন-জুলাই মাসে বর্ষা শুরু হলে আর সেচ দিতে হয় না। তখন নিকাশ নালার ঘাস পরিষ্কার রাখতে হয় যাতে বৃষ্টির পানি সহজে ক্ষেত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সার উপরিপ্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে।

মালচিং (আচ্ছাদন): কন্দমূল জমিতে লাগানোর পর ধানের খড় দিয়ে মাদা ঢেকে দিতে হবে। শীতকালে কাঁকরোলের মোথা মাটির নিচে পড়ে থাকে যা নষ্ট না করে ঐ বেডে অন্য রবি ফসলের চাষ করতে হবে। মোথা বা কন্দমূলের উপর কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দিলে পরে এ থেকে অগ্রীম ফসল পাওয়া যাবে।

অংগ ছাঁটাই: ফসলের অঙ্গজ বৃদ্ধি বেশি হয়ে গেলে ফল উৎপাদন কম হয়। এজন্য গাছের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও ফলায়নকে উৎসাহিত করতে অতিরিক্ত শাখা-প্রশাখা কেটে দিতে হবে। এছাড়া রোগ ও পোকাক্রান্ত পালপালা, লতা-পাতা কেটে গাছ ছাঁটাই করে দিতে হয়।

কৃত্রিম পরাগায়ন: ১৫-২০ দিন পূর্বে লাগানো পুরুষ ফুল দিয়ে স্ত্রীফুল ফোটার ১২ ঘন্টার মধ্যে পরাগায়ন করতে হবে।

পোকামাকড় দমন

ক) কাকরোলের ফলের মাছি পোকা: সেক্স ফেরোমন, বিষটোপ ও বন্ধু পোকার সংখ্যা বাড়িয়ে এগুলো সহজেই দমন করা যায়।

খ) কাঁকরোলের ফল ছিদ্রকারি পোকা: কাঁকরোলের ফল ছিদ্রকারি পোকার পোকার কীড়া কচি ফল ও ডগা ছিদ্র করে ও ভিতরে কুরে কুরে খায়। এরা ফলের কুঁড়িও খায় ।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থাপনা

১। ক্ষেত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ।

২। আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে নষ্ট করতে হবে।

৩। চারা রোপনের ১৫ দিন পর থেকে ক্ষেত ঘন ঘন পর্যবেক্ষণ করতে হবে ।

৪। জৈব বালাইনাশক ব্যবহার যেমন নিমবিসিডিন ৩ মিঃলিঃ / লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা ।

৫। শতকরা ১০ ভাগের বেশি ক্ষতি হলে যে কোন একটি বালাইনাশক ব্যবহার করা । যেমন রিপকর্ড ১ মিঃলিঃ বা ডেসিস ০.৫মিলি বা ফাসটেক ০.৫ মিঃলিঃ বা সবিক্রণ -২ মিঃলিঃ বা সুমিথিয়ন-২ মিঃলিঃ বা ডায়াজিনন ২ মিঃলিঃ /লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা স্প্রে করার পর ৭-১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না।

পরবর্তী মৌসুমে করনীয়ঃ ১। আগাম বীজ বপন করতে হবে। ২। সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

গ)) কাঁকরোলের জাব পোকা: পোকা গাছের কচি পাতা ও ডগার রস শুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থাপনা: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

ঘ) কাকরোলের সাদা মাছি পোকা: এরা পাতার রস চুষে খায় ফলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে, পাতায় অসংখ্য সাদা সাদা পাখাযুক্ত মাছি দেখা যায়, ঝাকি দিলে পোকা উড়ে যায় ।

ব্যবস্থাপনা

১। সাদা আঠাযুক্ত বোর্ড স্থাপন বা আলোর ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

২। নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে।

৩। ৫০ গ্রাম সাবানের গুড়া ১০ লিটার পানিতে গুলে পাতার নিচে সপ্তাহে ২/৩ বার ভাল করে স্প্রে করতে। সাথে ৫ কৌটা গুল (তামাক গুড়া) পানিতে মিশিয়ে দিলে ফল ভাল পাওয়া যায়।

৪। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। যেমন এডমায়ার ০.৫ মিলি বা ০.২৫ মিলি ইমিটাফ বা ২ মিলি টাফগর/রগব/সানগর প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

সাবধানতা: স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না ।

করনীয়: ১। আগাম বীজ বপন করতে হবে। ২। সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

ঙ) কাঁকরোলের রেড পাম্পকিন বিটল

পাম্পকিন বিটলের পূর্ণ বয়স্ক পোকা চারা গাছের পাতায় ফুটো করে এবং পাতার কিনারা থেকে খাওয়া শুরু করে সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে। এ পোকা ফুল ও কচি ফলেও আক্রমণ করে।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থাপনা: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

কাঁকরোলের রোগ দমন

কাঁকরোলের যে সকল রোগ দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- চারার ঢলে পড়া, পাউডারী মিলডিউ, ডাউনি মিলডিউ, সুটি মোল্ড, মোজাইক। প্রথম ৪টি ছত্রাকজনিত রোগ এবং শেষোক্তটি ভাইরাস জনিত রোগ।

ক) চারার ঢলে পড়া রোগ

১) এ রোগের আক্রমণে কচি গাছের গোড়া পঁচে যায়।

২) চারা ঢলে পড়ে ও মার যায়।

প্রতিকার

১) পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

২) রোগমুক্ত কাঁকরোলের মোথা লাগাতে হবে।

৩) আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়ে ফেলতে হবে।

খ) পাউডারি মিলডিউ রোগ: পাতার উপরের দিকে ও কান্ডে সাদা পাউডারের মতো ছত্রাকের জীবাণুর প্রলেপ পড়ে এবং পরে ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে সম্পূর্ণ পাতা শুকিয়ে যায়।

দমন: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

গ) ডাউনি মিলডিউ রোগ: বয়স্ক পাতায় এ রোগ প্রথম দেখা যায় আক্রান্ত পাতার গায়ে সাদা বা হলদে থেকে বাদামী রংগের তালির মত দাগ দেখা যায় ধীরে ধীরে অন্যান্য পাতায় ছড়িয়ে পড়ে ।

ব্যবস্থাপনা

১। সম্ভব হলে গাছের আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে ।

২। ক্ষেত পরিস্কার এবং পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩। (ম্যানকোজেব+মেটালোক্সিল) গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: পুটামিল বা রিডোমিল গোল্ড অথবা (ম্যানকোজেব+ ফেনামিডন) গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: সিকিউর ২ গ্রাম/ লিটার হারে অথবা সালফার গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: কুমুলাস ২ কেজি/ হেক্টর হারে অথবা মনোভিট বা ম্যাকভিট ২ মিলি. / লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

সাবধানতা:

১। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না।

২। আক্রান্ত ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না।

৩। এলোপাথাড়ি বালাইনাশক ব্যবহার করে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করা উচিত নয়।

করনীয়

১। প্রথম বার লক্ষণ দেখা যেতেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। আগাম বীজ বপন করলে আক্রমণ কিছুটা কমবে।

৩। সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

৪। রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন: বারি উদ্ভাবিত/ অন্যান্য উন্নত জাতের চাষ করতে হবে।

৫। বিকল্প পোষক যেমন: আগাছা পরিস্কার রাখতে হবে।

ঘ) কাঁকরোলের সুটিমোল্ড রোগ: এ রোগের আক্রমনে পাতায়, ফলে ও কান্ডে কালো ময়লা জমে। খোসা পোকা বা সাদা মাছির আক্রমন এ রোগ ডেকে আনে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১। আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাটাই করে ধ্বংস করতে হবে।

২। টিল্ট ২৫০ ইসি ১০ লি. পানিতে ৫ মি.লি. মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

সাবধানতা:

১। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না।

২। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না ।

করনীয়

১। আগাম বীজ বপন করতে হবে। ২। সুষম সার ব্যবহার করতে হবে। ৩। রোগ প্রতিরোধী জাত বা উন্নত জাতের চাষ করতে হবে।

রেটুন কাকরোল

শীতের শুরুতেই কাকরোল গাছ মরে যায় এবং পরবর্তী বর্ষা না আসা পর্যন্ত মাটির নিচে মোথা বা শিকড় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, যা থেকে পরের বছর আবার সঠিকভাবে যত্ন নিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। এভাবে কাঁকরোল চাষ করলে বীজের খরচ, রোপণ এবং রোপণ পরবর্তী খরচ অনেকাংশে কমে যায় এবং বেশি লাভবান হওয়া যায়।

১.৭.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

কাঁকরোলের সংগ্রহের সময় নির্ধারণ: ফল কচি অবস্থায় অর্থাৎ বীচি শক্ত হওয়ার পূর্বে সংগ্রহ করতে হয়। কাঁকরোল হলদে সবুজ হলে সংগ্রহ করতে হয়। গাছ রোপণের দেড় থেকে দুই মাসের মধ্যে কাঁকরোল ফুল ফুটা আরম্ভ করে। পরাগায়নের ১২-১৫ দিনের মধ্যে কাঁকরোল সংগ্রহের উপযোগী সময়। মধ্য জুলাই হতে মধ্য সেপ্টেম্বর মাস কাঁকরোল সংগ্রহের উত্তম সময়।

ফসল সংগ্রহ: চাকু দিয়ে কেটে সংগ্রহ করতে হবে।

ফলন: ভালোভাবে যত্ন নিলে জাতভেদে হেক্টরপ্রতি কাঁকরোলের ২৫ থেকে ৩০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায় (শতকে ১০০-১২০ কেজি)।

বাজারজাতকরণ: কাঁকরোল সংগ্রহের পরপরই আকার অনুসারে গ্রেডিং করা হয়। গ্রেডিংকৃত কাঁকরোল প্যাকিং করে ২-৩ দিনের মধ্যে বাজারজাত করা হয়। কাঁকরোল বস্তাবন্দী না করে বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত প্লাস্টিক, কাঠ বা বাঁশের খাঁচা বা হার্ডবোর্ড বা করোগেটেড (Corrugated) হার্ডবোর্ডের বাক্সে করে বাজারে পাঠাতে হয় যাতে গায়ে আঘাত না লাগে।

সংরক্ষণ: উপরে খড়ের ছাউনি এবং বাঁশ/পাটখড়ির বেড়া দিয়ে ঘর তৈরি করে মাঝে মাঝে তার দেয়াল ও ছাদ পানি দিয়ে সে ঘরে কয়েকদিন রাখা যায়, কেননা তাতে ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ঠান্ডা হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

- দিনের বেলায় ২৫-২৮° সে. এবং রাতের বেলায় ১৮-২০° সে. লাউ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।
- লাউ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে এবং অনেক লম্বা সময়ব্যাপী ফলন দেয়।
- লাউ ও মিষ্টিকুমড়া ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল।
- হাতিশুঁড় আগাছ পাউডারি মিলডিউ রোগের বিকল্প পোষক ও পানি লং আগাছা লাউয়ের মোজাইক রোগের বিকল্প পোষক।
- লাউ ও মিষ্টিকুমড়াগাছের গোড়ার দিকে ৪০-৫০ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখাগুলো সিকেচার/খারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।
- লাউয়ের কৃত্রিম পরাগায়ন ফুল ফোটার দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং মিষ্টিকুমড়ার কৃত্রিম পরাগায়ন সকাল ৮-১০টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে করা উত্তম।
- সেক্স ফেরোমন ফাঁদ কুমড়া জাতীয় ফসলের জমিতে ক্রমানুসারে ১২ মি দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে।
- শসার ফুল সহবাসী (Monoecious) অর্থাৎ একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদাভাবে উৎপন্ন হয়।
- করলায় কিউকারবিটাসিন নামক রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতির কারনে স্বাদ তিতা হয়।
- চাষকৃত চিচিঙ্গার ফল লম্বা, কিন্তু বুনো চিচিঙ্গার ফল খাটো হয়।
- এক একর জমিতে পটল চাষের জন্য ৪,০০০টি লতা বা মোথার প্রয়োজন হয়।
- সাদা মাছি পোকার আক্রমনের কারণে কাঁকরলের শুটি মোল্ড রোগ হয়।
- কাঁকরোলে উচ্চ মাত্রায় লাইকোপেন আছে যা আমাদের শরীরের জন্য উপকারী।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তুমি **কিউকারবিটেসি গোত্রের সবজি চাষ** সম্পর্কেজেনেছে। নিম্ন ছকে কয়েকটি **সবজি**র ছবি উল্লেখ করা হয়েছে। তুমি ছবি দেখে সবজি ফসলের নাম এবং বপনের সময় উল্লেখ কর।

ক্র/নং	সবজির নাম	ছবি দেখে উত্তর লিখ	বপনের সময়
১			

২			
৩			
৪			

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

তুমি এই অধ্যায়ে কুমড়াজাতীয় মাছি পোকা দমনে পরিবেশবান্ধব দমন ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনেছে। তারই অংশ হিসেবে তুমি কুমড়াজাতীয় ফসলে বিষটোপ ফাঁদ তৈরি ও এর ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পেরেছ। তুমি তোমার প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে কৃষকরা মাছি পোকা দমনে কি কি দমন ব্যবস্থা নিচ্ছে তার বিবরণ দাও। কৃষকরা এ পোকা দমনে বিষটোপ ব্যবহার করে কিনা? যদি করে থাকে তবে বিষটোপ তারা কিভাবে তৈরি ও ব্যবহার করে সেই সম্পর্কে চিত্রসহ একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

২০২৪

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১। লাউয়ের উৎপত্তিস্থল কোথায়?
২। লাউ চাষের উপযোগী তাপমাত্রা কত?
৩। লাউয়ের ২টি জাতের নাম লিখ।
৪। পরাগায়নের কতদিন পর লাউ সংগ্রহের উপযোগী হয়?
৫। মিষ্টিকুমড়ার জমিতে জন্মে এমন ৪টি আগাছার নাম লিখ।
৬। শসা ও খিরার পার্থক্য কি?
৭। চিচিঙ্গার ২টি জাতের নাম লিখ।
৮। চারা গজানোর কতদিন পর চিচিঙ্গা গাছে ফল আসে?
৯। কোন কোন জেলায় করলার আবাদ বেশি হয়?
১০। কাঁকরোলে স্ত্রী ফুল ফোটার কত ঘন্টার মধ্যে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১। প্রতি ১০০ গ্রাম লাউয়ে কিকি খাদ্য উপাদান আছে?
২। লাউ গাছে কৃত্রিম পরাগায়ন কিভাবে করা হয়?
৩। মাছি পোকা দমনে বিষটোপ ফাঁদ ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪। মিষ্টিকুমড়ার পরিপক্কতা কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?
৫। শসা জন্মানোর জন্য উত্তম তাপমাত্রা কত ও কি ধরনের মাটিতে শসা ভাল জন্মে?
৬। করলার ঔষধী গুণ বর্ণনা কর।
৭। উচ্ছে ও করলার মধ্যে পার্থক্য কি?
৮। বীজ দ্বারা পটলের চারা করা যায় না কেন?
৯। পটল ক্ষেতে পানির অভাব হলে কি কি লক্ষণ দেখা দেয়?
১০। কাঁকরোলে পুরুষ ও স্ত্রী মোথা একই সঙ্গে রোপণ করা হয় না কেন?
১১। রোপণের কতদিন পর কাঁকরোলের ফুল হয় এবং কতদিন পর ফল সংগ্রহ করে?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। লাউ ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা কর।
২। লাউয়ের চারা রোপণ এবং অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে বর্ণনা কর।
৩। কুমড়া জাতীয় ফসলে মাছিপোকা দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।
৪। শসার চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৫। করলা চাষে সার প্রয়োগ, আন্ত: পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।
৫। পটলের বংশবিস্তারের মাধ্যম কি? পটলের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৬। কাঁকরোলের বিভিন্ন বালাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে লিখ।

জব ১.১ মিষ্টিকুমড়া চাষাবাদে দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

১. জমি নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে পারবে।
২. মাদা তৈরি, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে পারবে।
৩. সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ, চারার পরিচর্যা ও বালাই দমন করতে পারবে।
৪. সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে সবজি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩. বালাইনাশক স্প্রে করার পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী(পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দিতে হবে।

ব্যক্তিগতসুরক্ষাসরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া
০৫	গামবুট	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

মিষ্টিকুমড়া চাষের জন্য বাড়ির আশেপাশে উঁচু বন্যামুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। জমি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভাল। পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমি আলো-বাতাস ও রৌদ্রযুক্ত হওয়া দরকার। উর্বর দো-আঁশ মাটি উত্তম। বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও সবজি ভালো হয়। পর্যাপ্ত জৈব সার ও অনুমোদিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। মাটির পিএইচ ৬-৭ বেশি উপযোগী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি, ২। বীজ বা চারা, ৩। কোদাল, ৪। লাঙ্গল, ৫। মই, ৬। নিড়ানী, ৭। আঁচড়া, ৮। খুটি, ৯। রশি, ১০। টেপ, ১১। জৈব ও রাসায়নিক সার ১২। ওজন মাপার যন্ত্র, ১৩। ঝুড়ি বা প্লাস্টিকের বাটি, ১৪। ঝাঁঝরি, ১৫। খন্তা, ১৬। সিকেচার বা ব্লেড, ১৭। টুকরি, ১৮। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

১) আলো ও বায়ুচলাচলের সুবিধাযুক্ত সুনিষ্কাশিত উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

২। ফেব্রুয়ারি-মে মাসের মধ্যে বপন সময় নির্ধারণ করে জাত নির্বাচন ও শতকপ্রতি ৪-৬ গ্রাম (চারা রোপণের ক্ষেত্রে) বীজ সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

৩। জমির পাশে উঁচু স্থানে ৩ X ১ মিটার আকারের বীজতলা তৈরি করে বীজতলায় চারা উৎপাদন ও পরিচর্যা করতে হবে। চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে মূল জমিতে চারা রোপণ করতে হবে।

৪। মূল জমিতে প্রতিশতকে ১০ কেজি জৈব সার, ৩৫০ গ্রাম টিএসপি সার, এমওপি ২০০ গ্রাম, জিপসাম ৪০০ গ্রাম, জিংক সালফেট ৫০ গ্রাম, বোরাক্স ৪০ গ্রাম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। ৩ মিটার প্রস্থ ১৫-২০ সেমি উচ্চতায় বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৬০ সেমি সেচ ও নিকাশ নালা রাখতে হবে।

৫। চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে বেডের যেদিকে ৬০ সেমি প্রশস্ত নালা থাকবে সেদিকে বেডের কিনারা থেকে ৬০ সেমি বাদ দেয়া হবে।, উহার পার্শ্ববর্তী বেডের ঠিক একই কিনার থেকে ৫০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২.৫ মিটার দূরে দূরে এক সারিতে ৫০-৫৫ সেমি X ৫০-৫৫ সেমি X ৪৫-৫০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে। সারির অপর পার্শ্বে ২ মিটার খালি জায়গায় লতা বাইবার সুযোগ পাবে।

৬। প্রতি মাদায় ৫ কেজি জৈব সার এবং ৬০ গ্রাম টিএসপি, ৫০ গ্রাম এমওপি, ৪০ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড রাসায়নিক সার প্রয়োগ মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

৭। মাটিতে 'জো' এলে পরের দিন মাদার মাটি ভালভাবে ওলটপালট করে দিতে হবে। অত:পর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ ১৫-১৬ দিনের চারা বিকেল বেলায় প্রতি মাদায় ১টি করে রোপণ করতে হবে এবংঝাঁঝরি দিয়ে নিচু করে হালকাভাবে সেচ দিতে হবে।

৮। লাউ যখন ১৫-২৫ সেমি লম্বা হবে তখনই মাচা দিতে হবে। এজন্য লাউয়ের জমিতে ১.৭ মিটার উঁচু করে মাচা বা জাংলা তৈরি করতে হয় এবং কোন চারা মারা গেলে পুনরায় রোপণ করতে হবে।

৯। মিষ্টিকুমড়া পানির প্রতি খুবই সংবেদশীল। চারার গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুরুপ মাটি শুকায়ে গেলে সেচ দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১০। বৃষ্টিজনিত বা সেচজনিত কারনে মাটিতে চটা হলে সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে।মাদায় বা বেডে আগাছা হলে সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে উঠায়ে দিতে হবে।

১১। প্রতি মাদায় নিম্নোক্তভাবে ইউরিয়া ও এমওপি সারের উপরিপয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবেঃ

সারের নাম	প্রতি মাদায় সারের উপরি-প্রয়োগ (গ্রাম)			
	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
ইউরিয়া	৩০	৩০	৩০	৩০
এমওপি	২৫			

১২। গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৫০ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখাগুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।

১৩। সকাল ৮-১০টা পর্যন্ত অথবা সকালে যতক্ষণ পযন্ত রোদের তাপ কম থাকে, পুরুষ ফুল ছিঁড়ে ফুলের পাপড়িগুলো অপসারণ করে এবং ফুলের পরাগধানী (যার মধ্যে পরাগরেণু থাকে) স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডের কাছাকাছি নিয়ে সংস্পর্শ ছাড়াই পুরুষ ফুলে আস্তে করে টোকা দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হয়। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৪-৫টি স্ত্রী ফুলে পরাগায়ন করা যায়। পরাগায়নের পর ফুলটি পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিলে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়।

১৪। চারা/গাছকে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জমি সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে, প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত অংশ কেটে পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে/গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে এবং বিভিন্ন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে বালাই দমনে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

১৫। ফল পরাগায়ণের ২০-২৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে এবং গুণগতমান বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ করতে হবে। ফল সংগ্রহের ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে সেচ দেয়া বন্ধ করতে হবে।

১৬। প্রতিটি কাজ ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট স্বাক্ষর নিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে জমিতে সমানভাবে পড়ে।

২। সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৩। কৃত্রিম পরাগায়নের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পুরুষ ফুলের পরাগধানী যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং পরাগরেণু ভালভাবে গর্ভমুন্ডের উপর পতিত হয়।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি মিষ্টিকুমড়া চাষ করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ১.২ কুমড়াজাতীয় সবজি ফসলে কৃত্রিম পরাগায়ন করার দক্ষতা অর্জন (লাউ, মিষ্টিকুমড়া, কাঁকরোল ইত্যাদি)

শিখনফল

১. কৃত্রিম পরাগায়নের সংজ্ঞা দিতে পারবে।
২. কোন কোন ধরনের সবজিতে কখন এ ধরনের পরাগায়ন হয় তা বলতে পারবে।
৩. কৃত্রিম পরাগায়নের উপকরণের নাম ওপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩. বালাইনাশক স্প্রে করার পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও ল্যাব/কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দিতে হবে।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

কুমড়াজাতীয় ফসলে (Cucurbitaceae পরিবারভুক্ত) পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদাভাবে ধরে। কাজেই কখনও মৌমাছি বা অন্য কীটপতঙ্গ না আসে তবে ক্ষেতে পরাগায়নের সম্ভাবনা কমে যায়। এমতাবস্থায় পুরুষ ফুল হাতে নিয়ে স্ত্রী ফুলের উপর হালকা করে ছুঁয়ে দিলে ফলধারণ তাড়াতাড়ি হয়। এ প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম

পরাগায়ন বলে। হাত দিয়ে এ ধরনের কাজ সম্পন্ন হয় বলে একে হস্তপরাগায়নও (Hand Pollination) বলা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ভালো জাতের কয়েকটি লাউ গাছ, ২। ধারালো ছুরি, ৩। একটি পুরুষ ফুল, ৪। কয়েকটি স্ত্রী ফুল

কাজের ধারা

১। প্রথমে সিকেচার বা ধারালো ছুরি দিয়ে ফুল ফোটার দিন বিকেলে ভালো জাতের সুস্থ পুরুষ ফুল সংগ্রহ করতে হবে।

২। এরপর পুরুষ ফুলের পাঁপড়িগুলো ছিড়ে ফেলতে হবে।
৩। অত:পর পুরুষ ফুলের পুংকেশর দিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডের উপর আস্তে আস্তে ২-৩ বার হালকা করে ঘষা দিতে হবে। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে সাধারণত: ৬-৭টি স্ত্রী ফুলের পরাগায়ন করা যায়।

৪। লাউয়ের ফুল ঠিকমতো রোদ পেলে দুপুরের থেকে ফোটা শুরু হয়ে রাত ৭-৮টা পর্যন্ত ফোটে। কৃত্রিম পরাগায়ন ফুল ফোটার দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত করা যায়। ফুল ফোটার দিন বিকেলে হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন শেষ করে ফেলতে হবে।

৫। মিষ্টিকুমড়া ও কাঁকরোলে একই পদ্ধতিতে পরাগায়ন সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে সকালে স্ত্রী ফুল ফোটার পরপরই পরাগায়ন করতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। পুরুষ ফুলের রেণুসহ পরাগধানী যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২। স্ত্রী ফুলের উপর যাতে ভালভাবে পরাগরেণু পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩। পুংকেশর দিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে ঘষা দেওয়ার সময় যেন গর্ভমুন্ডে আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

আমার লাউ, মিষ্টিকুমড়া ও কাঁকরোল গাছে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উচ্চ মূল্যের সবজি চাষ

(High Value Vegetable Cultivation)

উচ্চমূল্যের ফসলের উৎপাদন সময়, স্থান, বাজারের চাহিদা, ফলন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। তবে সার্বিক দিক বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জমিতে বোরো ধান চাষ করে যে নিট মুনাফা হয় অন্য ফসল চাষ করে যদি তার চেয়ে বেশী মুনাফা হয় তবে সেই ফসলকে বলা হয় উচ্চমূল্য ফসল। বর্তমানে উচ্চমূল্য ফসল হলো-লেটুস, ক্যাপসিকাম, স্কোয়াশ ইত্যাদি। অতএব যে সব সবজি চাষ করে বাজার হতে অধিক অর্থ পাওয়া যায় তাদেরকে বলা হয় উচ্চ মূল্য সবজি।

এই অধ্যায় শেষে-

- উচ্চ মূল্যের চাষযোগ্য সবজিসমূহের নাম ও পরিচিতি লিখতে পারবে
- ক্যাপসিকাম, লেটুস ও স্কোয়াশ ইত্যাদি সবজিগুলোর বিভিন্ন পুষ্টিগুণ ও ব্যবহার বলতে পারবে
- উপর্যুক্ত সবজিগুলোর উৎপত্তিস্থল, জলবায়ু ও মাটি, বিভিন্ন জাত এবং সবজির চাষ মৌসুম ব্যাখ্যা করতে পারবে
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে আধুনিক পদ্ধতিতে উক্ত সবজিগুলোর চাষাবাদ ও অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে পারবে
- উক্ত ফসলগুলোর উপযুক্ত সময় ও পদ্ধতিতে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করতে পারবে

২.১ লেটুস (Lettuce)

আমাদের খাদ্যে পাতা জাতীয় সবজি গ্রহণের পরিমান কম। সালাদ হিসাবে বেশি বেশি সবজি কাঁচা খাওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে লেটুস গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

২.১.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

লেটুসের পরিচিতি ও ব্যবহার: লেটুস সাধারণত পাতা জাতীয় একটি সবজি। লেটুস পাতা মোটামুটি সবারই পরিচিত। সালাদ হিসাবে ব্যবহার্য যত সবজি আছে তার মধ্যে লেটুসের স্থান সবার উপরে। ফাস্টফুড কিংবা রান্নায় এর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লেটুস পাতা কাঁচা অবস্থায় গাজর, টমেটো, বিট, পেঁয়াজ ইত্যাদির সাথে মিশিয়ে সালাদ তৈরি করে খাওয়া যায়। বার্গার, স্যান্ডউইচ ইত্যাদির সাথে লেটুস পাতা ব্যবহৃত হয়। লেটুস পাতা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও মুখরোচক। তাছাড়া লেটুস শাক হিসাবেও খাওয়া যায়।

ইংরেজি নাম ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম: ইংরেজি নাম Lettuce। উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Lactuca sativa*

পুষ্টিমান: সালাদ হিসাবে টাটকা অবস্থায় খাওয়া হয় বলে লেটুসের পুষ্টিমান নষ্ট হয় না। লেটুস পাতায় ৯৪% পানি, ১.৪% আমিষ, ২.৯% শ্বেতসার, ০.২% স্নেহ থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম লেটুস পাতায় ৩০০-১৫০০ আই.ইউ. ক্যারোটিন, ০.০৯ মিলিগ্রাম থায়ামিন, ০.১২ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লাভিন, ০.৪ মিলিগ্রাম নায়াসিন, ১০ মিলিগ্রাম খাদ্যপ্রান, ৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ২.০ মিলিগ্রাম আয়রন রয়েছে। লেটুস পুষ্টি বিবেচনায় একটি উৎকৃষ্ট সবজি। লেটুস পাতা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ (মানব শরীরের অত্যাবশকীয় উপাদান) বিধায় শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়।

উৎপত্তি: ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিম এশিয়া লেটুসের উৎপত্তি স্থান।

জলবায়ু ও মাটি: লেটুস জন্মানোর পরিবেশগত অবস্থার সীমানা বেশ বিস্তৃত এবং জাত অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন। অধিকাংশ জাত ১৫-২০°সেঃ তাপমাত্রায় ভাল জন্মায়। উচ্চ তাপমাত্রায় পাতার সংখ্যা কমে যায় এবং স্বাদে তিক্ত হয়। সুনিষ্কাশিত জৈব পদাথ সমৃদ্ধ দো-আঁশ মাটি লেটুস চাষের জন্য উপযোগী। নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ মাটিতে লেটুস ভালো হয়। লেটুস চাষের জন্য মাটির অনুকূল পিএইচ হলো ৫.৮ থেকে ৬.৬।

উৎপাদন মৌসুম: আমাদের দেশে কেবল রবি মৌসুমে, বিশেষ করে নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে লেটুস চাষ করার উপযুক্ত সময়।

লেটুসের জাত পরিচিতি

লেটুসের পাতার গঠন ও বিন্যাসের বিভিন্নতার ভিত্তিতে লেটুস জাতগুলোকে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১. **হেড লেটুস:** এই শ্রেণির লেটুস বাঁধাকপির মতো মাথা বাধে।

চিত্র: স্টেম লেটুস, ঢিলে পাতা লেটুস, রোমেন লেটুস, হেড লেটুস

২. **রোমেন লেটুস:** এই জাতীয় লেটুস ঢিলেঢালা মাথা গঠন করে।

৩. **ঢিলে পাতা লেটুস:** এ লেটুস কোন মাথা গঠন করে না। পাতা সমতল বা কোঁচকানো এবং রোজেট আকারে সাজানো থাকে। সালাদের জন্য এই জাত চাষ করা হয়।

৪. **স্টেম লেটুস:** এ জাতীয় লেটুস মাথা গঠন করে না। এই জাতের লেটুসের কান্ড টাটকা ও সিদ্ধ করে খাওয়া যায়।

বাংলাদেশে লেটুসের জাত: বাংলাদেশে বর্তমানে সীমিত আকারে লেটুস চাষ হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কর্তৃক বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে "বারি লেটুস-১" নামে প্রথম লেটুসের জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ জাতটি বাংলাদেশের সব অঞ্চলে চাষ উপযোগী।

বারি লেটুস-১ জাতের বৈশিষ্ট:

১. রবি মৌসুমে চাষ করা যায়।

২. জীবনকাল ৪০-৫০ দিন।

৩. ঢিলে পাতা শ্রেণীভূক্ত এই জাতটির পাতা গাঢ় সবুজ।

৪. ৫০ দিনে জাতটি প্রতি গাছের ফলন ৩৫০-৪০০ গ্রাম এবং প্রতি শতকে ফলন ৬০-৬৫ কেজি।

৫. স্থানীয় আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে বীজ উৎপাদন করতে পারে।

বীজ বপন সময়: বাংলাদেশে কেবল রবি মৌসুমে, বিশেষ করে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত লেটুস চাষের উপযুক্ত সময়।

বীজ হার: চারা তৈরি করার জন্য বীজ হার ১ গ্রাম/শতক (১১০ গ্রাম/একর)।

বীজ সরাসরি বপন পদ্ধতির হার ৪-৫ গ্রাম/শতক (৪০০-৫০০ গ্রাম/একর)।

বীজ শোধন: বীজবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং সুস্থ সবল চারা উৎপাদনের জন্য ভিটাভ্যাক্স/প্রোভ্যাক্স জাতীয় ছত্রাকনাশক

২.৫০ গ্রাম হারে প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।

বীজ ভিজানো: লেটুসের বীজ আলোক সংবেদনশীল। এর বীজ ফটোব্লাষ্টিক (Photoblastic)। মাঠে লেটুসের বীজর অংকুরোদগম হার অনেক সময় কম হয়। ১০ পিপিএম GA_3 দ্রবনে বীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে বপন করলে কাঙ্খিত অংকুরোদগম হার পাওয়া যায়।

বপন সময় ও পদ্ধতি

১. সরাসরি বীজ বপন বা চারা রোপণ করে লেটুসের চাষ করা যায়।

২. বীজ বপনের ক্ষেত্রে জাতভেদে ৪০-৫০ সেমি দূরত্বে সারি করে একটু ঘনভাবে বীজ বপন করতে হয়। চারা গজানোর পর ২৫-৩০ সেমি দূরত্ব বজায় রেখে চারা পাতলা করে দিতে হবে।

৩. চারা রোপণের ক্ষেত্রে বীজতলায় বীজ বপন করে চারা রোপণ করতে হয়। এ পদ্ধতিতে বীজতলায় ৩ মিটার লম্বা ও ১ মিটার চওড়া করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেড তৈরি করে বীজ বপন করতে হবে।

৪. চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে চারা মূল জমিতে ৪০ থেকে ৪৫ সেমি. দূরত্বে সারি করে প্রতি সারিতে ২৫-৩০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

২.১.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে। পর্যাপ্ত সূর্যালোক পড়ে এমন স্থানই লেটুস চাষের জন্য উপযুক্ত।

মাটি নির্বাচন: সুনিস্কাশিত দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী।

প্রাথমিকভাবে জমি প্রস্তুতকরণ: জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জমি প্রস্তুতকরণ: প্রাথমিক ভাবে জমি তৈরী ও প্রয়োজনীয় সার মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার পর মূল জমিতে ৪০ থেকে ৪৫ সেমি. দূরত্বে সারি থেকে সারি করে প্রতি সারিতে ২৫-৩০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ: ভাল ফলনের জন্য জমিতে সার প্রয়োগ করা উচিত। লেটুসের জমিতে জৈব ও রাসায়নিক উভয় সার প্রয়োগ করতে হবে। লেটুস চাষের জন্য শতাংশ প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলোঃ

সার	মোট পরিমাণ/শতক	শেষ চাষের সময়	চারা রোপণের ১৫ দিন পর	চারা রোপণের ২৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩৫ দিন পর
১. গোবর/জৈব সার	২০-২৮ কেজি	২০-২৮ কেজি	-	-	-
২. ইউরিয়া	৮০০ গ্রাম	-	৩০০ কেজি	২৫০ কেজি	২৫০ কেজি
৩. টিএসপি	৩০০ গ্রাম	৩০ কেজি	-	-	-
৪. এমওপি	৩০০ গ্রাম	৩০ কেজি	-	-	-

স্বল্প মেয়াদি ফসল বিধায় সকল সার ফসল রোপণ করার পূর্বে মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে পরিস্থিতি ভেদে ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২.১.৩ লেটুসের বীজ বপন/ চারা রোপণ

লেটুস চাষে বীজ সরাসরি জমিতে বপন করা যায়। আবার বীজতলায় বীজ বপন করে চারা তৈরি করে তারপর জমিতে চারা রোপণ করা যায়। চারার বয়স সাধারনত এক মাস হলে জমিতে রোপণ করা যায়। লাইন অনুযায়ী চারা রোপণ করতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৪০-৪৫ সেমি। চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ২৫-৩০ সেমি। লেটুসের বীজ আকারে খুব ছোট তাই বীজ বপন করার সময় বীজের সাথে ছাই মিশিয়ে নেওয়া উচিত। চারা রোপণ করতে হবে বিকেল বেলা । চারা রোপণ করার সময় সাবধানে রোপণ করতে হবে যেন চারার শিকড় আঘাত না পায়। রোপণ করার পর চারার গোড়ায় মাটি দিয়ে হালকা ভাবে চেপে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর চারাকে রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ৩-৪ দিন ঢাকনি দিয়ে ঢেকে

রাখতে হবে। সকাল বিকাল নিয়মিত পানি দিতে হবে। প্রয়োজনে জমিতে সেচ দিতে হবে এবং মাঝে মাঝে চারার গোড়ার মাটি নিড়ানি দিয়ে হালকা আলগা করে দিতে হবে।

৭.১.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

আগাছা দমন: লেটুসের জমি সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। কারণ আগাছা পোকার আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে এবং ফসলের খাদ্য-পুষ্টিতে ব্যাহত করে। আমাদের দেশে মুথা, ভাদাইল, শ্যামা, বথুয়া, চাপড়াঘাস, নুনে ও দুর্বা ইত্যাদি আগাছা লেটুস ক্ষেতে সচারচর দেখা যায়। এসব আগাছা দমনে নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়ঃ

- ক) আগাছার বীজমুক্ত লেটুসের বীজ ব্যবহার করা।
- খ) উত্তমরুপে ভূমিকর্ষন করা।
- গ) নালা পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা করা।
- ঘ) শস্য পর্যায় পদ্ধতি অনুসরণ করা।
- ঙ) নিড়ানি দেওয়া বা কোপানোর ব্যবস্থা করা।

সারের উপরি প্রয়োগ: ইউরিয়া সার প্রয়োজনে জমি তৈরির সময় না দিয়ে ৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথম কিস্তিতে বীজ বপনের ১৫দিন পর ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, দ্বিতীয় কিস্তিতে বীজ বপনের ২৫ দিন পর ২৫০ গ্রাম এবং তৃতীয় কিস্তিতে অবশিষ্ট ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া বীজ বপনের ৩৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

খুটি দেওয়া: সাধারণত লেটুসের জন্য খুটি ও মাচা দরকার পড়ে না। কিন্তু বীজ উৎপাদনের সময় খুটির প্রয়োজন হয়।

সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা: লেটুস চাষে সেচ অপরিসীম। শুষ্ক আবহাওয়া ৫-৬ দিন পর পর নিয়মিত সেচ দিতে হবে। তবে উচ্চ পর্যায়ের নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেচ পরবতী জমিতে 'জো আসলে লেটুসের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

মালচিং বা জাবরা প্রয়োগ: খড়, কচুরীপানা, আখের ছোবড়া, করাতের গুড়া, পুরানো পত্রিকার কাগজ ইত্যাদি জৈব পদার্থ বা কালো প্লাস্টিক ব্যবহার করে মালচিং করা যায়। এতে মাটির রস সংরক্ষিত হয়, মাটি ক্ষয় রোধ এবং আগাছা দমন হয়।

চারা পাতলাকরণ: সরাসরি বীজ বুনে চারা গজানোর পরে দফায় দফায় সেগুলো পাতলা করে দিতে হয় যাতে শেষ পর্যন্ত পাশাপাশি দুটি গাছের মধ্যে ২৫-৩০ সেমি ব্যবধান থাকে। চারা মাটিতে প্রতিস্থিত হওয়ার পর এর চারিদিকে মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন: লেটুসের বিভিন্ন পোকার আক্রমন হতে পারে।

ক) ফ্লি বিটল: লেটুসের ক্ষতিকর পোকার নাম হলো ফ্লি বিটল। পূর্ণ বয়স্ক ও বাচ্চা উভয়ই ক্ষতি করে। পূর্ণ বয়স্করা চারা গাছের বেশি ক্ষতি করে।

লক্ষণ: এই পোকা পাতায় ছোট ছোট ছিদ্র করে খায়। আক্রান্ত পাতায় অসংখ্য ছিদ্র হয়।

চিত্র: ফ্লি বিটল আক্রান্ত লেটুস পাতা

চিত্র: পূর্ণ বয়স্ক ফ্লি বিটল

প্রতিকার

১) হাতজাল দ্বারা পোকা সংগ্রহ করতে হবে।

২) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) চারা গাছ জাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৪) আক্রান্ত গাছে ছাই ছিটিয়ে দিতে হবে।

৫) ০.৫% ঘনত্বের সাবান পানি অথবা ৫ মিলি তরল সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

৬) ৫০০ গ্রাম নিম বীজের শাঁস পিষে ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তা ছেঁকে আক্রান্ত ক্ষেতে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

খ) জাব পোকা: লেটুস পাতার ক্ষতিকর অপর একটি পোকার নাম হলো জাব পোকা।

লক্ষণঃ এ পোকা গাছের পাতার রস চুষে খেয়ে ফেলে। এছাড়াও পোকার মলদ্বার থেকে এক ধরণের তরল পদার্থ বের হয়, যা 'সুটি মোল্ড' নামে এক প্রকার কালো বর্ণের ছত্রাক সৃষ্টি করে। ফলে আক্রান্ত অংশের সালোকসংশ্লেষণ ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়।

দমন ব্যবস্থা: এ পোকা দমন করা খুবই জরুরী। তবে পোকার সংখ্যা কম হলে হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলা উত্তম। আক্রমণ মাত্রা বেশি হলে অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ওষুধ ছিটানোর ১৫ দিনের মধ্য সবজি খাওয়া উচিত নয়। এজন্য আইপিএম পদ্ধতি অনুসরণ করে পোকা দমন করাই উত্তম।

রোগবালাই:

ক) ছাতা রোগ: লেটুসের পাতায় কখনো কখনো 'ছাতা' রোগ দেখা দিতে পারে। এটি একটি ছত্রাক জনিত রোগ।

লক্ষণ: এ রোগের লক্ষণ হচ্ছে-গাছের পাতা নুইয়ে পড়া এবং পাতার অগ্রভাগ পুড়ে যাওয়া।

দমন ব্যবস্থা:

১. আক্রান্ত গাছ অবশ্যই ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
২. বীজ ও মাটি শোধন করতে হবে।
৩. শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে।

খ) গোড়াপচা রোগ: জমি স্যাঁতস্যাঁতে থাকলে গোড়াপচা রোগের আক্রমণ হতে পারে। এটিও একটি ছত্রাক জাতীয় রোগ।

দমন ব্যবস্থা:

১. প্রয়োজনীয় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।
২. অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.১.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফসলে পরিপক্কতা নির্ধারণ: হেড টাইপ জাতসমুহ ভালভাবে মাথা বাঁধার পর সংগ্রহ করতে হবে। ঢিলে পাতা জাতসমূহ একবারে অথবা নিচের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহকরণ: লেটুস ফসল সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট সময় নেই। পরিপক্কতার লক্ষণ দেখে লেটুস সংগ্রহ করতে হবে।

ফসল সংরক্ষণ: লেটুস পচনশীল বলে সংগ্রহের পর দ্রুত বাজারজাতকরণ করতে হবে।

ফলন: উন্নত চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করলে জাত অনুযায়ী ফলন প্রতি শতকে ৮০ থেকে ১০০ কেজি।

২.২ ক্যাপসিকাম (Capsicum)

ক্যাপসিকাম বা মিষ্টি মরিচ সারা বিশ্বেই একটি জনপ্রিয় সবজি। বাংলাদেশেও এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে বড় বড় শহরের আশেপাশে সীমিত পরিসরে কৃষকরা এর চাষ করে থাকেন, যা অভিজাত হোটেলে ও বিভিন্ন বড় বড় মার্কেটে বিক্রি হয়ে থাকে। তাছাড়া বিদেশে রপ্তানীর সম্ভাবনাও প্রচুর। কারণ সারা বিশ্বেই টমেটোর পরই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সবজি হচ্ছে ক্যাপসিকাম বা মিষ্টি মরিচ।

২.২.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

ক্যাপসিকামের পরিচিতি ও ব্যবহার: মিষ্টি মরিচ সবার কাছে ক্যাপসিকাম নামে পরিচিত। স্বাদে ঝাল কম বলে একে মিষ্টি মরিচ বলে। সালাদের জন্য এই মরিচ খুবই উপযুক্ত। লম্বা ও মোটা আকৃতির এই মরিচ দেখতে অনেকটা ঘন্টাকৃতি। বাংলাদেশেও এর জনপ্রিয়তা ও চাষ দুটোই বাড়ছে। পুষ্টিমানের দিক থেকে ক্যাপসিকাম একটি মূল্যবান সবজি। কাঁচা ও রান্না উভয় অবস্থায় ব্যবহার করা যায়। কাঁচা ক্যাপসিকাম কুচি কুচি করে সালাদের সাথে খাওয়া যায়। মিশ্রসবজি হিসাবে অন্য সবজির সাথে রান্না করে খাওয়া যায়। তাছাড়াও ভাজা, পাকোড়া, চচ্চড়ি, চপ, আচার ইত্যাদি তৈরিতেও ক্যাপসিকাম ব্যবহৃত হয়।

চিত্র: নুডুলসের সাথে

চিত্র: ক্যাপসিকামের আচার

চিত্র: সবজির সাথে

চিত্রঃ মাংসের সাথে

বৈজ্ঞানিক নাম: *Capsicum annuum.*

পুষ্টিমান: ক্যাপসিকামের পুষ্টিমান অনেক। প্রতি ১০০ গ্রাম ক্যাপসিকামে ভিটামিন “এ” ৮৭০ আন্তর্জাতিক একক, ভিটামিন “সি” ৩২১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন “বি” ২.১ মিলিগ্রাম, ফলিক এসিড ১.৩-২.৯ মিলিগ্রাম,

২০১৪

নিকোটিনিক এসিড ৬-১০ মিলিগ্রাম, প্রোটিন ১.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১১ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ০.৫৫ মিলিগ্রাম ও পানি ৯২.৪ গ্রাম।

উৎপত্তি: ক্যাপসিকাম এর উৎপত্তি স্থল হলো লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল।

জলবায়ু ও মাটি: মানসম্মত ক্যাপসিকাম উৎপাদনের জন্য ১৬-২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশ উপযোগী। রাতের তাপমাত্রা ১৬-২১° সে. এর কম বা বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুল ঝড়ে পড়ে,ফলন ও মান কমে যায় , কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ফলন হয় না। ক্যাপসিকাম বাংলাদেশে সবজি চাষের এলাকায় চাষাবাদের উপযুক্ত। সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি ক্যাপসিকাম চাষের জন্য উত্তম। মাটির অনুকূল পিএইচ হলো ৫.৫ থেকে ৬.৬।

চিত্রঃ মাঠে ক্যাপসিকাম চাষ

উৎপাদন মৌসুম: আমাদের দেশে শীত মৌসুমে ক্যাপসিকাম চাষ হয়।

জাত পরিচিতি: সাধারণত আমাদের দেশে আবাদকৃত জাতগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে- ক্যালিফোর্নিয়া ওয়ান্ডার,ওয়ান্ডার বেল, ইয়োলো ওয়ান্ডার ইত্যাদি। প্রতি বৎসর এই জাতগুলোর বীজ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। তাছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কর্তৃক ক্যাপসিকামের ২টি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এ জাত ২টি বাংলাদেশের সব অঞ্চলে চাষ উপযোগী।

বারি মিষ্টি মরিচ-১ জাতের বৈশিষ্ট

১. প্রতি গাছে ৭-৯ টি ফল পাওয়া যায়।

২. গড় ফলের ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম।

৩. উজ্জ্বল সবুজ বেল আকৃতির ফল পাকলে লাল রঙের হয়।

বারি মিষ্টি মরিচ-২ জাতের বৈশিষ্ট

১. এই জাতটির গড় ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম।

২. চকচকে সবুজফল, পাকলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

৩. গাছ প্রতি ১২-১৩ টি ফল পাওয়া যায়।

বপন সময়: বীজ বপনের সময় সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর। তবে বীজ বপনের উত্তম সময় হচ্ছে অক্টোবর মাস।

বীজ শোধন: বীজ বপনের আগে ভিটাভ্যাক্স বা থাইরাম জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রতি কেজি বীজের সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করা যায়।

বীজ হার: ১.৫-২.০ গ্রাম/শতক।

বীজ বপন ও চারা উৎপাদন: চারা নার্সারীতে পলিব্যাগে উৎপাদন করাই উত্তম। বপনের পূর্বে বীজগুলো ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সুনিষ্কাশিত উঁচু বীজ তলায় মাটি মিহি করে ১০×২ সেমি দূরে দূরে বীজ বপন করে হালকাভাবে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজনানুসারে ঝাঝরি দিয়ে হালকা ভাবে পানি সেচ দিতে হবে। বীজ গজাতে ৪-৭ দিন সময় লাগে। বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর চারা ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট হলে ৯×১২ সেমি আকারের বড় পলি ব্যাগে চারা স্থানান্তর করতে হবে। পটিং মিডিয়াতে ৩:১:১ অনুপাতে যথাক্রমে মাটি, কম্পোষ্ট এবং বালু মিশাতে হবে। পরে পলিব্যাগ ছায়াযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করতে হবে, যাতে প্রখর সূর্যালোকে এবং ঝড় বৃষ্টি আঘাত হানতে না পারে।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

১. শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাষ্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে দিতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।

২. প্রয়োজন অনুসারে ঝাঝরি দিয়ে চারায় পানি দিতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন চারায় সরাসরি পানি না পড়ে।

৩. পলিব্যাগের ভিতর মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

৪. চারায় কোন পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. পলিব্যাগের চারার বয়স ৩০ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত মাদায় লাগাতে হবে।

২.২.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন: উর্বর দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশমাটি নির্বাচন করতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি: জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে যাতে জমিতে বড় বড় মাটির ঢেলা এবং আগাছা না থাকে। চারা রোপণ দূরত্ব জাত ভেদে ভিন্ন হয়। সাধারণত ৩০ দিন বয়সের চারা ৪৫×৪৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করতে হয়। মাঠে চারা লাগানোর জন্য বেড তৈরি করতে হবে। প্রতিটি বেড প্রস্থে ৭৫ সেমি হতে হবে এবং লম্বায় দুই সারিতে ২০টি চারা সংকুলনের জন্য ৯ মিটার বেড হবে। দুই সারির মাঝখানে ৩০ সেমি নালা করতে হবে। চারা বিকাল বেলায় রোপণ করা উত্তম। চারা রোপণের পর গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ক্যাপসিকাম চাষে প্রতি শতকে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময়	পিটে বা গর্তে	উপরি প্রয়োগ	
				চারা রোপণের ২৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০ দিন পর
গোবর/কম্পোস্ট	৪০ কেজি	২০ কেজি	২০ কেজি	-	-
ইউরিয়া	১.০০ কেজি	-	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম

২০১৪

টিএসপি	১.৫০ কেজি	১.৫০ কেজি	-	-	-
এমপি	১.০০ কেজি	-	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম
জিপসাম	০.৫০ কেজি	০.৫০ কেজি	-	-	-
জিঙ্ক অক্সাইড	২০.০০ গ্রাম	২০.০০ গ্রাম	-	-	-

জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার, সম্পূন্ন টিএসপি, জিপসাম এবং জিংক অক্সাইড শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার, ১/৩ ভাগ ইউরিয়া এবং ১/৩ ভাগ এমপি গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিস্ট ইউরিয়া এবং এমপি পরবর্তীতে দুই ভাগ করে চারা লাগানোর ২৫ এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

২.২.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শূন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): চারা লাগানোর ৭-১০ দিনের মধ্যে যে সমস্ত চারা মারা যায়, সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

আগাছা দমনঃ আগাছা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। তাই চারা রোপণের পর থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হয়।

খুটি দেওয়া: কোন কোন জাতে ফল ধরা অবস্থায় খুটি দিতে হয় যাতে গাছ ফলের ভাড়ে হেলে না পড়ে।

উপরি সার প্রয়োগ: চারা রোপণের পর গর্ত প্রতি সারের উপরি প্রয়োগ গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ও নিকাশ দেওয়া: জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। চারা রোপণের পরপরই প্রথমবার সেচদিতে হবে। ক্যাপসিকাম খরা কিংবা জলাবদ্ধতা কোনটিই সহ্য করতে পারে না। শুষ্ক মৌসুমে সাধারণত ১২-১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হয় এবং অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

মালচিং দেওয়া: প্রতিবার সেচের পর হালকা মালচ করে গাছের গোড়ায় মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

পলিথিন ছাউনি: নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাত্রের তাপমাত্রা অনেক কমে যায়। এ সময় গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কাজেই গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পলিথিন ছাউনিতে গাছ লাগালে রাতে ভেতরের তাপমাত্রা বাহিরের অপেক্ষা বেশি থাকে এবং গাছের দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।

ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগ দমন

(ক) ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

নানারকম পোকার আক্রমণে ক্যাপসিকাম এর ফলন কম হয়। যেমন:

১) থ্রিপস (Thrips) পোকা

লক্ষণ

১. ছোট ছোট পোকা, পাতার নিচে থাকে এবং পাতার রস শুষে খায়।

২. আক্রান্ত পাতা কুঁচকে যায়।

দমন ব্যবস্থা

১. সাদা আঠালো বোর্ড পেপার ব্যবহার করতে হবে।

২. পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যাসিফেট ১মিলি. প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাতার নিচের দিকে ওষুধ লাগে।

২) জাবপোকা (Aphids)

লক্ষণ

১. অতিক্ষুদ্র, হালকা ও ঘন সবুজ, হলুদাভ ও কালচে রং এর পোকাগুলি গাছের পাতা, ডগা, ফুল ও কচিফলের রস শুষে খায়।

২. এই পোকা বাহক হিসাবে ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

দমন ব্যবস্থা

১. হলুদ ফাঁদ: ফসলের ক্ষেতে আঠা মিশ্রিত হলুদ কাপড় টাংগিয়ে দেওয়া হয় পোকা সেখানে এসে পড়ে এবং আঠাতে আঁটকে যায়।

২. ইমিক্লোপ্রিড বা কার্বোসালফান জাতীয় কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ৭ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করে জাবপোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩) মাকড় (Mites)

লক্ষণ

১. লাল এবং হলুদ রং এর বাচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক মাকড় ফসলের ক্ষতি করে। খুব ছোট পোকা, সহজে নজরে আসে না, পাতার নীচে জালিকা তৈরি করে তার ভিতর বাসা বাঁধে এবং পাতার রস খায়।

২. আক্রান্ত পাতা কুঁকড়ে যায় এবং ধূসর হলুদ এবং ক্রমে বর্ণহীন হয়ে যায়।

চিত্র: মাকড় আক্রান্ত ক্যাপসিকাম

চিত্র: মাকড় আক্রান্ত পাতা

দমন ব্যবস্থা:

১. গাছে ফুল ধরার আগে ডাইকোফল জাতীয় কীটনাশক ১.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে এবং ফুল ধরার পরে ইথিয়ন ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৪) পাতার ত্বক ভেদকারী পোকা (Leaf Minor)

লক্ষণ

১. শূককীট পাতার উপরের স্তর ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে ও রস খায়।

২. পাতার উপরে আঁকাবাঁকা সাদাটে দাগের আলপনা আকৃতি দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা

১. প্রোফেনোফস কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করে এই পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বিশেষ পরিচর্যা: অন্যান্য সবজির মতোই ক্যাপসিকাম গাছেও রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করার আগে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। ওষুধের বিষক্রিয়ার তীব্রতা, স্থায়িত্ব, মাত্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক জেনে সময় মতো স্প্রে করা উচিৎ। ফসল তোলার ১৫দিন আগে থেকে যেকোন রকম ওষুধই স্প্রে করা উচিৎ নয়। বর্তমানে বাজারে নানারকম জৈব কীটনাশক বেরিয়েছে। এগুলির ব্যবহার মোটামুটি নিরাপদ। যেমন, নিমতেল (১%) প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি. হারে স্প্রে করে অধিকাংশ পোকা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। এ ছাড়া, তামাক পাতার নির্যাস ও সাবান জলের মিশ্রণ স্প্রে করেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

খ) রোগবালাই দমন: নানারকম রোগ ব্যাধির আক্রমণে ক্যাপসিকাম এর ফলন কম হয় এবং অনেক সময় ক্ষেত উজাড় করে চাষী ভাইকে পথে বসায়। এগুলির কিছু ছত্রাক ঘটিত, কিছু ব্যাকটেরিয়া ঘটিত এবং কিছু ভাইরাস ঘটিত।

১) চারা ঢলে পড়া রোগ (Damping Off): ছত্রাক জনিত একটি রোগ।

লক্ষণ

১) বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর মাটির নিচে অথবা মাটির উপরে চারা বের হবার পর হঠাৎ ঢলে পড়ে এবং চারার গোড়ার অংশ জলবসা দাগ হয়ে পচে যায়। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এবং মেঘলা পরিবেশে এই রোগ বেশি হতে দেখা যায়।

চিত্র: চারা ঢলে পড়া রোগ (Damping Off)

দমন ব্যবস্থা

১. বীজ বপনের আগে শোধন করে নেওয়া উচিৎ। প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম ক্যাপটান বা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ওষুধ মিশিয়ে বীজ শোধন করা যেতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব

বা ৪ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড মিশিয়ে বীজতলা ভালো করে ভিজিয়ে দিতে হবে। এছাড়া, ম্যানকোজেব জাতীয় ওষুধ ৭ দিন অন্তর অন্তর ২-৩ বার বীজতলায় স্প্রে করতে হবে।

২) এ্যানথ্রাকনোজ রোগ (Anthracnose)

লক্ষণ

১. চারা অবস্থায় পাতার ছোট ছোট কালো দাগ দেখা যায় এবং কচি ডগা ধীরে ধীরে শুকাতে থাকে। উপরের দিকের পাতা ঝরে যায় এবং শুকনা, পাতাহীন গাছ দাঁড়িয়ে থাকে; ফুল ও ফল ঝরে যায়। ফলে, গাছের ফলন কমে যায়।

২. কচি অবস্থায় আক্রান্ত ফল ঝরে যায় এবং বড় ফলের গায়ে ফোস্কার মতো দাগ ধরে ও পচে যায়।

৩. এটি মূলত বীজবাহিত রোগ। তাই বীজশোধন ও বীজতলা শোধন করে এই রোগ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ক্যাপসিকাম চাষের প্রধান সমস্যাই হল এই রোগ। তাই প্রথম থেকেই এই রোগ দমনে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ।

চিত্র: ডগা শুকিয়ে যাওয়া ও ফলপচা রোগ

দমন ব্যবস্থা

১. রোগাক্রান্ত জমিতে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ওষুধ প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম অথবা ম্যানকোজেব জাতীয় ওষুধ প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর নিয়মিত স্প্রে করতে হবে।

৩) ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত দাগ (Bacterial Spot)

লক্ষণ

১. পাতায় ও ফলে এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়। পাতার নীচের দিকে প্রথমে গোলগোল জলবসা দাগ দেখা যায়। পরে দাগের রং হয় ধূসর বাদামী এবং মাঝে থাকে লালচে ছিট ছিট দাগ। ক্রমে ঐ অংশ পচে যায় ও উপরের দিকে ফুলে ওঠে।

২. ক্রমশ ঐ দাগ বড় হতে থাকে এবং পুরো পাতাই নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় পাতার বোঁটা এবং গাছের সরু ডগাও আক্রান্ত হয়। সবুজ ফল এর গায়ে কালচে রং-এর উঁচু উঁচু দাগ দেখা যায়।

৩. রোপণের ৪৫-৬০ দিনের মাথায় এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা

১. বীজবাহিত রোগটির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে বীজশোধন করা অত্যন্ত জরুরী।

২০১৪

২. এছাড়া নীরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ, বীজতলা শোধন এবং আক্রান্ত গাছে বালাইনাশক স্প্রে করতে হবে।

৪) পাতা কৌকড়ানো রোগ (Leaf curl)

লক্ষণ

১. এটি একটি ভাইরাস ঘটিত রোগাক্রান্ত গাছের পাতা কুঁকড়ে যায়, ছোট হয়ে যায় ও গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ফুল ও ফল ধরে না। এই রোগ ছড়ায় এক ধরনের সাদা মাছি (বাহক)।

দমন ব্যবস্থা

১. সাদা মাছি নিয়ন্ত্রণের জন্য ফারমাথিওন ২ মিলি. প্রতি লিটার পানিতে বা অসিফেট ১মিলি. প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে পাতার উপরে ও নিচে। ফসল তোলার অন্ততঃ ১৫-২০ দিন আগে কীটনাশক প্রয়োগ বন্ধ করা উচিৎ।

২.২.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফসলের পরিপক্কতা নির্ধারণ: ক্যাপসিকাম যেহেতু কাঁচাই খাওয়া যায় তাই পুরোপুরি বড় আকারের হলে বাকলের সবুজ রং থাকতেই ফল তোলে ফেলতে হবে। না হলে বাজারে বিক্রি করা যাবে না। আঙ্গুল দিয়ে টিপ দিয়ে দেখতে হবে যদি নরম মনে হয় তবে যেসব ক্যাপসিকাম আরও কিছু দিন গাছে বড় হওয়ার জন্য রাখতে হবে। পূর্ণ পরিণত হলে সেই সমস্ত ক্যাপসিকামের খোসা একটু শক্ত ও মচমচে মনে হবে। ফল তোললেই সেইসব গাছে ২-৩ দফায় ক্যাপসিকাম ধরবে এবং ফলনও বাড়বে।

ফসল সংগ্রহ: ফল সংগ্রহের সময় প্রতিটি ক্যাপসিকাম সামান্য পরিমাণে বোটা রেখে দিতে হবে। সাধারণত পরিপক্ক সবুজ অবস্থায় লালচে হওয়ার আগেই মাঠ থেকে ফল সংগ্রহ করতে হয়।

সংরক্ষণ: ক্যাপসিকাম বড় ও রসালো বেশি। এজন্য বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম বা শুষ্ক দিনে গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করার পর কুঁচকানো শুরু হয়। পাতলা ভেজা সুতি কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রেখে দিলে কুঁচকানো সমস্যা হয় না। ২-৪ দিন পর বিক্রি করলেও সতেজ থাকে।

ফলন: প্রতি শতাংশে ২০০-২২০ কেজি।

২.৩ স্কোয়াশ (Squash)

আজ আমরা একটি নতুন সবজি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করি। এ সবজির নাম হলো স্কোয়াশ। কোন পানীয় নয়, এটি মূলত একটি কুমড়া জাতীয় শীতকালীন সবজি। অনেক দিন ধরেই এটি উচ্চমূল্য সবজি হিসাবে চাষ হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে স্কোয়াশ চাষ অন্য যে কোন ফসলের চেয়ে বেশি লাভজনক। প্রতি বিঘা জমিতে স্কোয়াশ চাষে খরচ হয় ৯-১০ হাজার টাকা। কিন্তু ১ বিঘা জমি থেকে মুনাফা হয় ৬০-৭০ হাজার টাকা। বিভিন্ন সুপারশপ ও চীনা রেস্তোরাঁয় এর চাহিদা ব্যাপক।

২.৩.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

স্কোয়াশের পরিচিতি ও ব্যবহার: স্কোয়াশ কুমড়া পরিবারের একটি লতানো প্রকৃতির একবর্ষজীবী গুল্ম স্বভাবের গাছ। স্কোয়াশ ভিটামিন “এ” সমৃদ্ধ সবজি। এর পাতা এবং কান্ড সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সামার স্কোয়াশ চিংড়ি এবং ডিমের সাথে তরকারি ও শুধু ভাজি হিসাবে খাওয়া যায়।

চিত্র: আলুর সাথে স্কোয়াশ

চিত্র: চিংড়ীর সাথে স্কোয়াশ

চিত্র: আলুর ও চিংড়ীর সাথে স্কোয়াশ

চিত্র: ডিমের সাথে স্কোয়াশ

বৈজ্ঞানিক নাম: *Cucurbita pepo.*

পুষ্টিমান: স্কোয়াশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ রয়েছে। ১০০ গ্রাম স্কোয়াশে শক্তি ১৬ ক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট ৩.৪ গ্রাম, প্রোটিন ১.২ গ্রাম, ফাইবার ১.১ গ্রাম এবং সুগার রয়েছে ১.৭ গ্রাম।

উৎপত্তি: স্কোয়াশের এর উৎপত্তি স্থল ইউরোপের দেশ ইতালী।

জলবায়ু ও মাটি: স্কোয়াশের জন্য উষ্ণ, প্রচুর সূর্যালোক এবং নিম্ন আর্দ্রতা উত্তম। ২০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হলো স্কোয়াশের চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ বা এঁটেল দো-আঁশ মাটি এর চাষাবাদের জন্য উত্তম, তবে চরাঞ্চলে পলিমাটিতেও স্কোয়াশ ভালো ফলন দেয়।

উৎপাদন মৌসুম: শীতকালে চাষের জন্য অক্টোবর -ডিসেম্বর মাসে বীজ বপন করার উপযুক্ত সময়।

জাত পরিচিতি: “বারি স্কোয়াশ-১” জাতটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত।

বৈশিষ্ট্য: এ জাতের বৈশিষ্ট্য:

১. পরাগায়নের পর থেকে মাত্র ১৫-১৬ দিনেই ফল সংগ্রহ করা যায়।

২. নলাকার গাঢ় সবুজ বর্ণের ফল।

৩. ফলের গড় ওজন ১.০৫ কেজি।

৪. এ জাতের জীবনকাল ৮০-৯০ দিন।

৫. প্রতি হেক্টরে গড় ফলন ৪৫-৫০ টন।

বীজ বপনে সময়

শীতকালীন : আগস্ট - অক্টোবর

গ্রীষ্মকালীন : ফেব্রুয়ারি - মে

বীজ শোধন: স্কোয়াশের বীজ বপন করার আগে সেই বীজ ১২-২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এর ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ভালো হয়। মাটি থেকে ছড়িয়ে পড়া ছত্রাক থেকে বীজকে বাঁচাতে হলে, বীজ বপনের আগে কার্বেন্ডাজিম বা থিরাম জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করে নিলে ছত্রাক ঘটিত রোগের আক্রমণ কমে যায়।

বীজ হার: শতক প্রতি ১০ গ্রাম বীজ লাগে (১কেজি/একর)।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

শীতকালে চাষের জন্য অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে বীজ বপন করা যায়। চারা নার্সারিতে পলিব্যাগে উৎপাদন করে নিলে ভালো হয়। বীজ বপনের জন্য ৮-১০ সেমি. বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা যায়। প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে পলিব্যাগে ভরতে হবে। দ্রুত অঙ্কুরোদগমের জন্য পরিষ্কার পানিতে ১৫-২০ ঘন্টা অথবা শতকরা এক ভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) দ্রবণে বীজ এক রাত ভিজিয়ে অতঃপর পলিব্যাগে বপন করতে হবে। প্রতি ব্যাগে দুটি করে বীজ বপন করতে হবে। বীজের আকারের দ্বিগুণ মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে। বীজ সরাসরি মাদায়ও বপন করা হয়। সেক্ষেত্রে সার প্রয়োগ ও মাদা তৈরির ৪-৫ দিন পর প্রতি মাদায় ২-৩টি করে বীজ বপন করা যেতে পারে। চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর ১টি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে। পলিব্যাগে চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত মাদায় লাগাতে হবে।

বেড তৈরি

বেডের উচ্চতা ১৫-২০ সেমি. ও প্রস্থ ১-১.২৫ মি. এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে সুবিধা মতো করতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৭০ সেমি. প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে।

মাদা তৈরি

মাদার ব্যাস ৫০-৫৫ সেমি. গভীরতা ৫০-৫৫ সেমি. এবং তলদেশ ৪৫-৫০ সেমি. প্রশস্ত হবে। ৬০ সেমি. প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা সংলগ্ন বেডের কিনারা থেকে ৫০ সেমি. বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে। প্রতি বেডে এক সারিতে চারা লাগাতে হবে।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

১. শীতকালের চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাত্রে প্লাস্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে রাখতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।

২. পলিব্যাগে চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর মাত্র ১টি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

৩. চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত মাদায় লাগাতে হবে।

৪. স্কোয়াশের চারাগাছে “রেড পামকিন বিটল” নামে এক ধরনের লালচে পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

২.৩.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ:

জমি নির্বাচন: স্কোয়াশ চাষ করতে মাটিকে উত্তমরুপে ৪-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

মাটি নির্বাচন: বেলে দো-আঁশ মাটি এবং দো-আঁশ মাটি স্কোয়াশ চাষের পক্ষে উপযুক্ত। স্কোয়াশ চাষের জন্য মাটির উপযোগী অম্লতা হলো ৫.৫-৬.৫ ।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি: ভালো ফলন পেতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে। মাটি ও জমির প্রকারভেদে ৫-৬টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে। শীতকালীন চাষের সময় জমিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে প্রয়োজনে জমি চাষের আগে সেচ দিয়ে নিতে হবে। স্কোয়াশ চাষ করতে গেলে ১৫ সেন্টিমিটার গভীরতা এবং ২ মিটার দূরত্ব রেখে জমিটি প্রস্তুত করা উচিত।

চিত্র: জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: মাটির অবস্থা বুঝে সারের পরিমাণ কম/বেশিও হতে পারে। স্কোয়াশ চাষে প্রতি শতকে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হলো:

সারের নাম	মোট পরিমাণ	জমি তৈরির সময়	উপরি প্রয়োগ		
			চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে মাদা প্রতি	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর মাদা প্রতি (প্রতি শতকে সকল মাদায়)	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর মাদা প্রতি (প্রতি শতকে সকল মাদায়)
গোবর	৮০ কেজি	৮০ কেজি	-	-	-
ইউরিয়া	৭০০ গ্রাম	-	-	৩৫০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম
টিএসপি	৭০০ গ্রাম	৭০০ গ্রাম	-	-	-
এমওপি	৬০০ গ্রাম	৪৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-		
দস্তা	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-		

২০২৪

২.৩.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

পলিব্যাগে উৎপাদিত চারার বয়স ১৫-১৬ দিন হলে প্রতি মাদায় ১টি করে চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের আগের দিন বিকেলে পানি দিয়ে মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরের দিন বিকালে চারা রোপণ করতে হয়। মাঠে প্রস্তুত মাদাগুলোর মাটি ওলট-পালট করে, এককোপ দিয়ে চারা লাগানোর জন্য জায়গা করে নিতে হয়। অতঃপর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি উক্ত জায়গায় লাগিয়ে চারপাশের মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে। চারা লাগানোর পর মাদায় পানি দিতে হবে। পলিব্যাগ সরানোর এবং চারা রোপণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং মাটির দলা না ভাঙ্গে।

২.৩.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শূন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): চারা রোপণের ৮-১০ দিনের মধ্যে যে সব চারা মারা যায়, সে সব মাদায় নতুন চারা রোপণ করে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।

আগাছা দমন: জমিতে আগাছা জন্মাতে দেওয়া যাবে না। আগাছা জন্মালে তা নিড়ানির সাহায্যে তুলে ফেলতে হবে। ভাঁটফুল আগাছা স্কোয়াশের রেড পামকিন বিটলের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার হয়। হাতিশুঁড় ও পানি লং আগাছা স্কোয়াশের মোজাইক রোগের বিকল্প পোষক। তাছাড়াও আগাছা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। তাই চারা রোপণের পর থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

কৃত্রিম পরাগায়ন: কৃত্রিম পরাগায়নে পুরুষ ফুলের রেণু স্ত্রী ফুলের উপর ছড়িয়ে দিলে উৎপাদন বাড়বে।

শোষক শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা বের হয়। এগুলোকে শোষক শাখা বলে। শোষক শাখা গাছের বৃদ্ধিতে বাধা দেয় ও ফলন কমিয়ে দেয়। তাই এইগুলোকে ভেঙ্গে দিতে হবে ।

উপরি সার প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদাপ্রতি সারের উপরি প্রয়োগ গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন পদ্ধতি: সার দেওয়ার পর হালকা সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। স্কোয়াশ গাছ সপ্তাহে ২ ইঞ্চি পানি শোষণ করে থাকে। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করতে হবে। শীতকালীন চাষের জন্য এক মাস পর পর জমিতে সেচ দিতে হবে। স্কোয়াশ চাষের সময় জমিতে পানি বেশি সময় জমতে দেওয়া যাবে না।

মালচিং: স্কোয়াশ চাষে মালচিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। চারা ভালভাবে টিকে গেলেই গোড়ার চারপাশে মালচিং করলে তাপমাত্রা ঠিক থাকে এবং মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখে। বিষয়টি স্কোয়াশের ফলনও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

পলিথিন ছাউনি: সাধারণত স্কোয়াশ উৎপাদনের জন্য ১৬-২৫ ডিগ্রি সে.তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশ সবচেয়ে উপযোগী। রাত্রে তাপমাত্রা ১৭-২১ ডিগ্রি সে. এর কম বা বেশি হলে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুল ঝরে পড়ে ও ফলন কমে যায়। অক্টোবর মাসে বীজ বপন করে নভেম্বরে চারা লাগালে দেখা যায় যে, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাত্রের তাপমাত্রা অনেক কমে যায়, ফলে এ সময় গাছের

দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এইজন্য গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পলিথিন ছাউনিতে গাছ লাগালে রাতে ভেতরের তাপমাত্রা বাহিরের অপেক্ষা বেশি থাকে এবং গাছের দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।

ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগ দমন

(ক) ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

নানারকম পোকার আক্রমণে স্কোয়াশের ফলন কম হয়। যেমনঃ

১) ফলের মাছি পোকা (Fruit Fly)

মাছি পোকা সাধারণত স্কোয়াশের কচি ফলে বেশি আক্রমণ করে।

ক্ষতির ধরণ: স্ত্রী মাছি তার লম্বা সরু ডিম পাড়ার নলের সাহয্যে কচি ফলের ভিতরে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে লাভা/কীড়া বের হয়ে ফলের শাঁস খেয়ে বড় হতে থাকে, আক্রান্ত ফল পঁচে যায় ও খাওয়ার অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকা আক্রান্ত ফল বিকৃত হয়ে যায়, ঠিকমত বাড়তে পারেনা, ফলে বাজার দর একদম কমে যায়। এদের আক্রমনের ফলে প্রায় ৫০-৭০ ভাগ ফল নষ্ট হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

(ক) আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

(খ) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ: মাছি পোকার কীড়া আক্রান্ত ফল দ্রুত পঁচে যায় এবং গাছ হতে মাটিতে ঝরে পড়ে। পোকা আক্রান্ত ফলসমূহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে পারলে, মাছি পোকার বংশ বৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। যেহেতু এ পোকার কীড়াসমূহ মাটির ২-৩ সেমি গভীরে মূটকীট বা পুত্তলিতে পরিণত হয়, সেহেতু আক্রান্ত ফল কমপক্ষে ২০ সেমি পরিমাণ গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

(গ) সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার: পুরুষ পোকাকে আকৃষ্ট করার জন্য স্ত্রী পোকা এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নির্গত করে যা সেক্স ফেরোমন নামে পরিচিত। সেক্স ফেরোমনের গন্ধে পুরুষ পোকা আকৃষ্ট হয়ে স্ত্রী পোকার সাথে মিলিত হয়। ফলের স্ত্রী মাছি পোকা কর্তৃক নিঃসৃত এমনই একটি সেক্স ফেরোমন বর্তমানে আবিস্কৃত হয়েছে যা রাসায়নিক উপায়ে তৈরি করা সম্ভব। ফেরোমনটির নাম কিউলিউর। কিউলিউর নামক সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করে পুরুষ মাছি পোকা আকৃষ্ট করা সম্ভব।

এ পদ্ধতিতে প্লাস্টিকের বাক্স ব্যবহার করা হয় যার দুপাশে ত্রিকোণাকৃতি ফাঁক থাকে। ফাঁদে ব্যবহৃত টোপটিতে স্ত্রী পোকার গন্ধকে কৃত্রিমভাবে ১০০ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া থাকে। যাতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পোকা বাক্সের ভিতরে বা আশে পাশে স্ত্রী পোকা আছে ভেবে খুঁজতে থাকে। একসময় উড়তে উড়তে বক্সের সাবান পানির মধ্যে পড়ে পোকাটি মারা যায়। এভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ পোকা মারার মাধ্যমে পোকার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করার মাধ্যমে পোকা দমন করা হয়। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদ স্কোয়াশ জাতীয় ফসলের জমিতে ক্রমানুসারে ১২ মি দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে। চারা লাগানোর ১ সপ্তাহের মধ্যে জমিতে স্থাপন করতে হবে। প্রতি ২.৫ শতকে ১টি ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। প্রতি বিঘায় ১৫ টি ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। একবার ব্যবহারের পর ফেরোমনটিকে আর পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। খেয়াল রাখতে হবে পাত্রের তলায় রক্ষিত

সাবান পানি যেন শুকিয়ে না যায়। যত্নের সাথে ব্যবহার কারণে এ ধরণের প্লাস্টিক পাত্রের ফাঁদ ৩-৪ মৌসুম পর্যন্ত অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ তৈরির উপকরণ: ফেরোমন লিউর, প্লাষ্টিক বৈয়াম, তার, সাবান গুঁড়া, পানি ও বাঁশের খুঁটি।

ফাঁদ তৈরি ও স্থাপন পদ্ধতি:

১. প্লাষ্টিক বৈয়ামের ত্রিকোণাকার ভাবে কাটা অংশের মাঝ বরাবর তার দিয়ে ফেরোমন লিউর / টোপটি ঝুলিয়ে দিতে হবে।

২. গাছের সম উচ্চতায় ফেরোমন ফাঁদটি দুটি খুটির সাহায্যে শক্তভাবে বেধেঁ দিতে হবে। তবে যেহেতু ক্ষতিকর পোকা ফল ও ডগা ছিদ্র করে সেজন্য ফুল ও ডগার কাছাকাছি বয়মটি রাখতে হবে।

৩. বৈয়ামের ভিতরের কর্তিত অংশের ২-৩ সে.মি. পর্যন্ত গুড়াঁ সাবান মিশ্রিত পানি দিতে হবে।

৪. কর্তিত অংশ উত্তর - দক্ষিন মুখ করে ঝুলাতে হবে।

৫. ফেরোমন লিউর/টোপটি যাতে সাবানের পানিতে বা বৃষ্টির পানিতে না ভিজে যায় সেজন্য পানির কিছুটা উপরে রাখতে হবে।

৬. বিভিন্ন কোম্পানী দুইপাশে ত্রিকোনাকার বাক্স তৈরী করে বাজারজাত করছে। তাছাড়া ২লিটার পানির বোতলের দুপাশে আগুনে গরম ছুরি করে সেই ছুরি দিয়ে খুব সহজেই ফাঁদ বক্স তৈরী করা যায়।

ঘ) **বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার:** বিষটোপ ফাঁদে পুর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ মাছি পোকা আকৃষ্ট হয় এবং মারা যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কীটতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীগণ এই বিষটোপ ফাঁদ তৈরী করছেন। বিষ টোপ ফাঁদ এর ব্যবহার পদ্ধতি হলো ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়া কুচি কুচি করে কেটে তা থেতলিয়ে ০.২৫ গ্রাম মিপসিন ৭৫ পাউডার অথবা সেভিন ৮৫ পাউডার বা সানটান ৫০ বা সেকুফেন ৮০ পাউডার এবং ১০০ মিলি পানি মিশিয়ে ছোট একটি মাটির পাত্রে রেখে তিনটি খুটির সাহয্যে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বিষটোপের পাত্রটি মাটি থেকে ০.৫ মি উচুতে থাকে। বিষটোপের পাত্রটি ৩টি খুটির মাথায় অন্য একটি বড় আকারের চেপ্টা মাটির পাত্র উপুড় করে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি বা রোদে নষ্ট না হয়। বিষটোপ তৈরীর পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করে তা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে তৈরী বিষটোপ ব্যবহার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন বিষটোপ কখনও শুকিয়ে না যায়। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদ কুমড়া জাতীয় ফসলের জমিতে ক্রমানুসারে ১২ মি দুরে দূরে স্থাপন করতে হবে।

ঙ) মাছির আক্রমণ বেশি হলে এসিমিক্স ৫৫ ইসি ১ মিলি/লিটার বা ইমিটাফ ২০ এস এল ১ মিলি/লিটার পানিতে দিয়ে স্প্রে করতে হবে।

২) রেড পামকিন বিটল (Red pumkin bettle)

ক্ষতির ধরণ

১. পামকিন বিটলের পূর্ণবয়স্ক পোকা চারা গাছের পাতায় ফুটো করে এবং পাতার কিনারা থেকে খাওয়া শুরু করে সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে।

২. এ পোকা ফুল ও কচি ফলেও আক্রমণ করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

০১) চারা আক্রান্ত হলে হাত দিয়ে পূর্ণবয়স্ক পোকা ধরে মেরে ফেলতে হবে।

০২) ক্ষেত সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

০৩) চারা রক্ষার জন্য পাতায় ছাই ছিটাতে হবে।

০৪) চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারা গুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমন থেকে গাছ বেঁচে যায়।

০৫) সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলি অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলি) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে অথবা রিপকড ১ মিলি/ লিটার পানিতে ১০-১২ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

৩) জাবপোকা (Aphids):

ক্ষতির ধরণ

জাবপোকার আক্রমণে স্কোয়াশের বাড়ন্ত ডগা ও পাতা হলুদ হয়ে যায়। গাছ তার সতেজতা হারিয়ে ফেলে এবং ফলন গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক জাবপোকা দলবদ্ধভাবে গাছের পাতার রস চুষে খায়। ফলে পাকা বিকৃত হয়ে যায়, বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও প্রায়শ নিচের দিকে কোঁকড়ানো দেখা যায়। বাহক হিসাবে ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত পাতা ও ডগার জাবপোকা হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলা যায়।
২. হলুদ ফাঁদ: ফসলের ক্ষেতে আঠা মিশ্রিত হলুদ কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যেন পোকা সেখানে এসে পড়ে এবং আঠাতে আঁটকে যায়।
৩. নিম বীজ দ্রবণ বা সাবান গোলা পানি স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
৪. আক্রমণ বেশি হলে সবিক্রন/টিডো/ইমিটাফ ১ মিলি/লিটার পানিতে স্প্রে করে জাবপোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(খ) রোগবালাই

স্কোয়াশের মোজাইক ভাইরাস: মোজাইক ভাইরাস একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগের আক্রমণে ফলন ৯০% কমে যেতে পারে।

ক্ষতির লক্ষণ: বীজ গজানোর পর চারা অবস্থায় বীজপত্র হলুদ হয়ে যায় এবং পরে অঙ্কুরিত চারা নেতিয়ে পড়ে। বয়স্ক গাছের পাতায় হলুদ-সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইকের মতো দাগ দেখা যায়। দাগগুলো অসম

আকারের। দ্রুত বড় হয়। আক্রান্ত পাতা ছোট, বিকৃত ও নিচের দিকে কুঁকড়ে যায়। আক্রান্ত পাতার শিরা-উপশিরাও হলুদ হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছে ফুল কম আসে এবং আক্রমণের মাত্রা বেড়ে গেলে পাতা ও গাছ শুকিয়ে মারা যায়। আক্রান্ত ফল বেঁকে যায় ও গাছের কচি ডগা জটলার মতো দেখায়। ফলের আকৃতি এবড়ো-খেবড়ো দেখায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত গাছ চিহ্নিত করে তা তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। ক্ষেতের আগাছা পরিস্কার রাখতে হবে।
২. আক্রান্ত গাছ থেকে কোন বীজ সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যাবে না।
৩. ভাইরাস প্রতিরোধী স্কোয়াশ জাত ব্যবহার করতে হবে।
৪. নিরাপত্তার জন্য ভূট্টা গাছ স্কোয়াশ ক্ষেতে লাগালে মোজাইক রোগ আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়।
৫. ভাইরাসের বাহক পোকা দমনের জন্য হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। জমিতে সাদা মাছি পোকা দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো) ১০ মিলি (২ মুখা) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে।

প্রয়োজনীয় সর্তকতা

১. ১টি চারা বের হওয়া থেকে ৫ দিন পর পর সাদা মাছি বা জাব পোকা দমনে কমপক্ষে ভালো কোম্পানির ২/৩ টি ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের ঔষধ ব্যবহার করলে ভাল হয় ।
২. সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।
৩. বালাইনাশক ব্যবহার করলে অবশ্যই দামী কোম্পানির ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।
৪. ভাইরাস আক্রান্ত গাছকে কোন প্রকার ঔষধ না দিয়ে সরাসরি মাটি থেকে তোলে গাছটি মাটি চাপা দিলে ভাল হয়।

২.৩.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফসলের পরিপক্কতা নির্ধারণ: পরাগায়নের ১৫-২০ দিনের মধ্যে স্কোয়াশ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। এ সময় ফলের রং সবুজ থাকবে এবং ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাবে। নখ দিয়ে ফলের গায়ে চাপ দিলে নখ সহজে ভিতরে ঢুকে যাবে। স্কোয়াশ পরিপক্ক হলে গাছ থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে। সাধারণত বীজ বপন বা চারা রোপণের ৩০ দিন থেকে ৪০ দিনের ভিতর গাছে ফুল এসে ফল ধরা শুরু হয়।

ফসল সংগ্রহ: ধারালো চাকু দিয়ে ফল কেটে সংগ্রহ করতে হবে।

ফলন: শতক প্রতি স্কোয়াশের গড় ফলন ২০০ কেজি। জাত ভেদে ফলন কম বেশি হতে পারে। কোন কোন সময় ফলের সাইজের উপর মোট উৎপাদন কম বেশি হতে পারে।

পাঠ সংক্ষেপ-২.১

১. পুষ্টি বিবেচনায় সালাদ হিসাবে ব্যবহার্য সবজির মধ্যে লেটুসের স্থান সবার উপরে।
২. লেটুসের ভাল ফলনের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা ১৫-২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

২০২৪

৩. পুষ্টি বিবেচনায় সালাদ হিসাবে ব্যবহার্য সবজির মধ্যে টমেটোর পরই ক্যাপসিকাম এর স্থান।
৪. সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি ক্যাপসিকাম চাষের জন্য উত্তম।
৫. আমাদের দেশে ক্যাপসিকাম এর ভাল ফলনের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা ১৬-২৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।
৬. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বারি মিষ্টি মরিচ-১' ও 'বারি মিষ্টি মরিচ-২'নামে ২টি জাত উদ্ভাবন করেছেন।
৭. সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময় ক্যাপসিকাম বীজ বপনের জন্য উপযোগী।
৮. হেড টাইপ জাত সমূহ ভালভাবে মাথা বাধার পর লেটুস সংগ্রহ করতে হবে।
৯. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বারি স্কোয়াশ-১' নামে ১টি সবজি উদ্ভাবন করেছেন।
১০. ক্যাপসিকাম বোটা সহ সংগ্রহ করতে হবে।
১১. অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময় স্কোয়াশ চাষের জন্য উপযোগী।
১২. পরাগায়নের ১০-১৫ দিন পর স্কোয়াশ সংগ্রহ করা যায়।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তোমরা লেটুস, ক্যাপসিকাম ও স্কোয়াশ চাষে বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড় ও রোগবালাই সম্পর্কে জেনেছ। নিম্ন ছকে কয়েকটি পোকা/রোগের আক্রান্ত ছবির নমুনা দেওয়া হয়েছে। তুমি ছবি দেখে পোকা/রোগ সনাক্ত করে ফসলের নাম ও দমনের উপায় নির্ধারণ কর।

ক্র/ নং	ফসলের নাম	পোকা/রোগের নাম	ছবি দেখে উত্তর লিখ	দমনের উপায়
০১				
০২			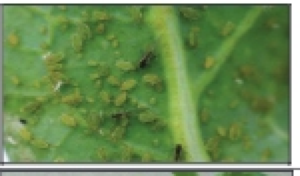	
০৩			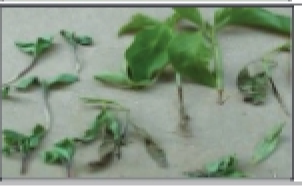	

০৪				
০৫				
০৬				

২০২৪

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

অতএব তুমি ক্যাপসিকাম চাষে বিভিন্ন প্রকার সার সম্পর্কে জেনেছ। তুমি তোমার বসতবাড়ীর পাশে ১ শতক জমিতে ক্যাপসিকাম চাষ করার পরিকল্পনা করেছ। তাই উক্ত জমিতে তুমি সফলভাবে ক্যাপসিকাম চাষের জন্য সার প্রয়োগ পদ্ধতি ও আন্তঃপরিচর্যা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১) লেটুস চাষের জন্য উপযুক্ত সময় উল্লেখ কর।
২) স্কোয়াশের উৎপত্তিস্থল কোথায়?
৩) কখন ক্যাপসিকাম চাষের উপযুক্ত সময়?
৪) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত লেটুসের জাতের নাম লিখ।
৫) লেটুসের উৎপত্তিস্থল কোথায়?
৬) চারা রোপণ পদ্ধতিতে কতদিন বয়সের লেটুস চারা রোপণ করতে হবে?
৭) লেটুস উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা কত?
৮) ক্যাপসিকামের উৎপত্তিস্থল কোথায়?
৯) ক্যাপসিকাম চাষের উপযোগী তাপমাত্রা কত?
১০) ক্যাপসিকামের ২টি জাতের নাম লিখ।
১১) ক্যাপসিকাম চাষের প্রধান সমস্যা কোন রোগ?
১২) স্কোয়াশ চাষের উপযুক্ত তাপমাত্রা কত?
১৩) স্কোয়াশের একটা জাতের নাম লিখ।
১৪) পরাগয়নের কতদিন পর স্কোয়াশ সংগ্রহ করতে হয়?
১৫) সেক্স ফেরোমন ফাঁদ জমিতে কত দূরে দূরে স্থাপন করতে হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১) বিভিন্ন শ্রেণির/টাইপের লেটুসের নাম লিখ।
২) ক্যাপসিকামের ব্যবহার লিখ।
৩) লেটুসের জন্য কোন জলবায়ু উত্তম?
৪) সালাদ হিসাবে লেটুসের পুষ্টিগুণ উত্তম কেন?
৫) স্কোয়াশের মালচিং গুরুত্বপুর্ণ কেন?
৬) লেটুস সংগ্রহের পরিপক্কতার লক্ষণ কি।
৭) উচ্চমূল্য সবজি বলতে কি বুঝায়?
৮) ২টি ক্যাপসিকাম জাতের বৈশিষ্ট লিখ।
৯) প্রতি ১০০ গ্রাম ক্যাপসিকামে কি কি খাদ্য উপাদান আছে।

১০) ক্যাপসিকাম বীজ লাগানোর আগে কিভাবে বীজ শোধন করতে হয়?
১১) ক্যাপসিকাম সংগ্রহের পরিপক্কতার লক্ষণ কি।
১২) স্কোয়াশের জাতের বৈশিষ্ট লিখ?
১৩) স্কোয়াশের কৃত্তিম পরাগয়ান কিভাবে করা যায়?
১৪) পলিব্যাগের চারা কখন খোলা ও কখন ঢেকে রাখতে হবে।
১৫) স্কোয়াশের ক্ষেতে কি কি আগাছা ক্ষতি করে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১) লেটুসের জন্য জমি তৈরি এবং সার প্রয়োগ কিভাবে করতে হয় বর্ণনা দাও।
২) স্কোয়াশের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।
৩) লেটুসের বীজ বপন ও অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।
৪) লেটুসের পোকা দমন পদ্ধতি আলোচনা কর।
৫) ক্যাপসিকাম চাষের জন্য বেড তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা কর।
৬) ক্যাপসিকামের চারা রোপণ ও অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
৭) ক্যাপসিকামের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।
৮) স্কোয়াশের মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা কর।
৯) স্কোয়াশের চারা রোপন এবং অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে বর্ণনা কর।
১০) সেক্স ফেরোমন ফাঁদের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

জব ২.১: লেটুস ফসলের চাষাবাদ করার দক্ষতা অর্জন।

শিখনফল

- জমি নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে পারবে।
- বেড তৈরি, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে পারবে।
- সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ ও চারার পরিচর্যা করতে পারবে।
- সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে লেটুস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের জমি প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নর্ধিারণ ও সংগ্রহ করা;
৩. বালাইনাশক স্প্রে করার র্পূবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	এপ্রোন	প্রয়োজনমত	১টি
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ জোড়া
৫	গামবুট	প্রয়োজনমত	১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

লেটুস চাষের জন্য বাড়ির আশেপাশে উঁচু বন্যামুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। জমি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভাল। পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমি আলো-বাতাস ও রৌদ্র যুক্ত হওয়া দরকার। উর্বর দো-আঁশ মাটি উত্তম। বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও সবজি ভালো হয়। পর্যাপ্ত জৈব সার ও অনুমোদিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। মাটির অম্লতা ৬-৭ বেশি উপযোগী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি ২। বীজ বা চারা ৩। কোদাল ৪। লাঙ্গল ৫। মই ৬। নিড়ানী ৭। আঁচড়া ৮। খুটি ৯। রশি ১০। টেপ ১১। জৈব ও রাসায়নিক সার ১২। নিক্তি ১৩। ঝুড়ি বা প্লাস্টিকের বাটি ১৪। খন্তা ১৫। টুকরি ১৬। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

১) আলো ও বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

২) নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বপন সময় নির্ধারণ করে জাত নির্বাচন ও শতকপ্রতি ১ গ্রাম (চারা রোপণের ক্ষেত্রে) বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

৩) জমির পাশে উঁচু স্থানে ৩×১ মিটার আকারের বীজতলা তৈরি করে বীজতলায় চারা উৎপাদন ও পরিচর্যা করতে হবে। চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে মূল জমিতে চারা রোপণ করতে হবে।

৪) মূল জমিতে প্রতি শতকে ২৫ কেজি জৈব সার, ৩০০ গ্রাম টিএসপি সার, এমওপি ৩০০ গ্রাম, রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

৫) লেটুস পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। চারার গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুরুপ মাটি শুকিয়ে গেলে সেচ দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬) বৃষ্টিজনিত বা সেচজনিত কারণে মাটিতে চটা হলে সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে। বেড়ে আগাছা হলে সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে উঠিয়ে দিতে হবে।

৭) প্রতি শতক জমিতে নিম্নোক্তভাবে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	প্রতি শতক জমি		
	চারা রোপনণর ১৫ দিন পর	চারা রোপণের ২৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩৫ দিন পর
ইউরিয়া	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম

৮) লেটুস চারা পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জমি সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে, প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত অংশ কেটে মাটির গর্তে পুতে / আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

৯) ফসল সংগ্রহের ১ সপ্তাহ পূর্বে সেচ বন্ধ করতে হবে।

১০) পরিপক্কতার **লক্ষণ** দেখে রোপনের ৪০ থেকে ৪৫ দিন পর থেকে লেটুস সংগ্রহ করতে পারবে।

১১) প্রতিটি কাজ ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১. সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে জমিতে সমানভাবে পড়ে।

২. সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা: সফলতার সাথে লেটুস চাষ করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল: আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২.২: ক্যাপসিকাম ফসলের চাষাবাদ করার দক্ষতা অর্জন।

শিখনফল

১. জমি নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে পারবে।

২. বেড তৈরি, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে পারবে।

৩. সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ ও চারার পরিচর্যা করতে পারবে।

৪. সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে ক্যাপসিকাম সংগ্রহ ,সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;

২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্ধারণ ও সংগ্রহ করা;

৩. বালাইনাশক স্প্রে করার পূবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;

৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;

৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;

৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	এপ্রোন	প্রয়োজনমত	১টি
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ জোড়া
৫	গামবুট	প্রয়োজনমত	১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

ক্যাপসিকাম চাষের জন্য বাড়ির আশেপাশে উঁচু বন্যামুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। জমি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভাল। পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমি আলো-বাতাস ও রৌদ্র যুক্ত হওয়া দরকার। উর্বর দো-আঁশ মাটি উত্তম। বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও সবজি ভালো হয়। পর্যাপ্ত জৈব সার ও অনুমোদিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। মাটির পিএইচ ৬-৭ বেশি উপযোগী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি ২। বীজ বা চারা ৩। কোদাল ৪। লাঙ্গল ৫। মই ৬। নিড়ানী ৭। আঁচড়া ৮। খুটি ৯। রশি ১০। টেপ ১১। জৈব ও রাসায়নিক সার ১২। নিক্তি ১৩। ঝুড়ি বা প্লাস্টিকের বাটি ১৪। খন্তা ১৫। টুকরি ১৬। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

১. ক্যাপসিকাম চাষের জন্য আলো ও বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।
২. সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের মধ্যে বপন সময় নির্ধারণ করে জাত নির্বাচন ও শতক প্রতি ১.৫-২.০ গ্রাম (চারা রোপনের ক্ষেত্রে) বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
৩. জমির পাশে উচু স্থানে ৩×১ মিটার আকারের বীজতলা তৈরি করে বীজতলায় চারা উৎপাদন ও পরিচর্যা করতে হবে। চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে মূল জমিতে চারা রোপণ করতে হবে।
৪. মূল জমিতে প্রতি শতকে ৪০ কেজি জৈব সার, ১.৫০ কেজি টিএসপি সার, এমওপি ১.০০ কেজি, রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।
৫. ক্যাপসিকাম পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। চারার গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুরুপ মাটি শুকিয়ে গেলে সেচের দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৬. বৃষ্টিজনিত বা সেচজনিত কারণে মাটিতে চটা হলে সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে। বেড়ে আগাছা হলে সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে উঠিয়ে দিতে হবে।
৭. প্রতি শতক জমিতে নিম্নোক্তভাবে ইউরিয়া ও পটাশ সারের উপরিপ্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	প্রতি শতক জমি		
	পিটে বা গর্তে	চারা রোপণের ২৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০ দিন পর
ইউরিয়া	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম
এমওপি	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম

৮. ক্যাপসিকাম চারা পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জমি সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে, প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত অংশ কেটে মাটির গর্তে পুতে / আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং বিভিন্ন প্রকার ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।প্রয়োজনীয় বালাই দমনে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

৯. ফসল সংগ্রহের ১ সপ্তাহ পূর্বে সেচ বন্ধ করতে হবে।

১০. ফসল তোলার ১৫ দিন আগে থেকেই যে কোন ধরনের ঔষধ স্প্রে করা উচিত নয়।

১১. পরিপক্কতার লক্ষণ দেখে চারা রোপনের ৬০ থেকে ৭০ দিন পর থেকে বোটা সহ ক্যাপসিকাম সংগ্রহ করতে পারবে।

১২. প্রতিটি কাজ ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখে শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর নিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১. সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে জমিতে সমানভাবে পড়ে।

২. সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা: সফলতার সাথে ক্যাপসিকাম চাষ করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল: আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২.৩: স্কোয়াশ ফসলের চাষাবাদ করার দক্ষতা অর্জন।

শিখনফল

১. জমি নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে পারবে।

২. বেড তৈরি, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার সংগ্রহ ও প্রয়োগ করতে পারবে।

৩. সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ ও চারার পরিচর্যা করতে পারবে।

৪. সঠিক সময় ও পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমনের জন্য ফাঁদ তৈরি করতে পারবে।

৫. সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে স্কোয়াশ সংগ্রহ,সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;

২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্ধারণ চেক ও সংগ্রহ করা;

৩. বালাইনাশক স্প্রে করার র্পূবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;

৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;

৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;

৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	এপ্রোন	প্রয়োজনমত	১টি
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ জোড়া
৫	গামবুট	প্রয়োজনমত	১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

স্কোয়াশ চাষের জন্য বাড়ির আশেপাশে উঁচু বন্যামুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। জমি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভাল। পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমি আলো-বাতাস ও রৌদ্র যুক্ত হওয়া দরকার। উর্বর দো-আঁশ মাটি উত্তম। বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও স্কোয়াশ ভালো হয়। পর্যাপ্ত জৈব সার ও অনুমোদিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। মাটির পিএইচ ৬-৭ বেশি উপযোগী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি ২। বীজ বা চারা ৩। কোদাল ৪। লাঙ্গল ৫। মই ৬। নিড়ানী ৭। আঁচড়া ৮। খুটি ৯। রশি ১০। টেপ ১১। জৈব ও রাসায়নিক সার ১২। নিক্তি ১৩। প্লাস্টিকের বৈয়াম ১৪।কিউ লিয়র ১৫। খন্তা/শাবল ১৬। টুকরি ১৭। খাতা-কলমও পেন্সিল।

কাজের ধারা

১. আলো ও বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত সুনিষ্কাশিত উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।
২. সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের মধ্যে বপণ সময় নির্ধারণ করে জাত নির্বাচন ও শতক প্রতি ১০ গ্রাম (চারা রোপণের ক্ষেত্রে) বীজ সংগ্রহ করে রাখতে হবে।
৩. চারা নার্সারিতে পলিব্যাগে উৎপাদন করে নিলে ভালো হয়। চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে মূল জমিতে মাদায় চারা রোপণ করতে হবে।
৪. বেডের উচচতা ১৫-২০ সেমি. ও প্রস্থ ১-১.২৫ মিটার এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে সুবিধামতো নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৭০ সেমি. প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে।
৫. গত/ মাদার ব্যাস ৫০-৫৫ সেমি. গভীরতা ৫০-৫৫ সেমি. এবং তলদেশ ৪৫-৫০ সেমি. প্রশস্ত হবে। ৬০ সেমি. প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা সংলগ্ন বেডের কিনারা থেকে ৫০ সেমি. বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে। প্রতি বেডে এক সারিতে চারা লাগাতে হবে।
৬. প্রতি মাদায় ১০ কেজি জৈব সার এবং ৬০ গ্রাম টিএসপি, ৫০ গ্রাম এমওপি, ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ৮ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

৭. মাটিতে "জো" এলে পরের দিন মাদার মাটি ভালভাবে ওলটাপালট করে দিতে হবে।অত:পর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ ১৬-১৭ দিনের চারা বিকাল বেলায় প্রতি মাদায় ১টি করে চারা রোপণ করতে হবে এবং রোপণের পর ঝাঁঝরি দিয়ে নিচু করে হালকাভাবে সেচ দিতে হবে।

৮. স্কোয়াশ পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। চারার গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি দাড়াতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। অনুরুপ মাটি শুকিয়ে গেলে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. বৃষ্টিজনিত বা সেচজনিত কারনে মাটিতে চটা হলে সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে। মাদায় বা বেড়ে আগাছা হলে সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে উঠিয়ে ফেলতে হবে।

১০. প্রতি মাদায় নিম্নোক্তভাবে ইউরিয়া ও এমওপি সারের উপরি প্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	প্রতি মাদায়		
	চারা রোপণের ৭-১০ দিন পুর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর
ইউরিয়া	-	১১. ৩৫০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম
এমওপি	১২. ৫০ গ্রাম	১৩. ৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম

১১) গাছের গোড়ার দিকের শোষক শাখা গুলো ব্লেড দিয়ে অপসারণ করতে হবে।

১২) সকাল ৮-১০ টা পর্যন্ত অথবা সকালে যতক্ষণ পর্যন্ত রোদের তাপ কম থাকে পুরুষ ফুল ছিঁড়ে ফুলের পাপড়িগুলো অপসারণ করে এবং ফুলের পরাগধানী (যার মধ্যে পরাগরেনু থাকে) স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডের কাছাকাছি নিয়ে সংস্পর্শ ছাড়াই পুরুষ ফুল আস্তে করে টোকা দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হয়।

১৩) চারা/গাছকে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জমি সব সময় পরিস্কার রাখতে হবে।

১৪) প্রতিটি কাজ ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখে শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর নিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১. সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে জমিতে সমানভাবে পড়ে।

২. সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৩. কৃত্রিম পরাগায়নের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পুরুষ ফুলের পরাগদানী যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং পরাগরেনু ভালভাবে গর্ভমুন্ডের উপর পতিত হয়।

অর্জিত দক্ষতা

সফলতার সাথে স্কোয়াশ চাষ করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ছাদে সবজি ও ফল চাষ

(Rooftop Gardening)

বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত জনবহুল দেশ। এখানে জনসংখ্যার তুলনায় চাষের জমি খুবই কম। প্রতি বছর এদেশের জনসংখ্যা, আবাসনের জন্য ঘর-বাড়ি, যোগাযোগের জন্য রাস্তা এবং কলকারখানা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দিনদিন কমে যাচ্ছে আবাদি জমি। বাংলাদেশ এই বাড়তি জনসংখ্যার চাপ মোকাবেলার জন্য শুধু আবাদি জমির উপর নির্ভর করলে চলবে না। এ পরিস্থিতিতে বড় বড় দালানের ছাদ চাষের আওতায় আনা যেতে পারে।

ছাদের উপর সবজি ও ফলের চাষ এটি সাধারণ চাষেরই প্রতিরূপ যা একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করা হয়। বিশেষ করে শহরে লোকজন তাদের বাড়ির ছাদে টব, বালতি, ড্রাম বা ট্রেতে সীমিত আকারে সবজি ও ফল চাষ করেন। একটা সুন্দর ছাদ বাগান দিতে পারে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও সারা বছর ধরে পরিবারের চাহিদা মতো নিরাপদ ফল ও সবজি।

এই অধ্যায় শেষে

১। ছাদ বাগানে চারা রোপণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে মাটির মিশ্রণ তৈরি করতে পারবে

২। ছোট ছোট মাটির বা প্লাস্টিকের টব/ পটে চারা উৎপাদন করতে পারবে

৩। টব/ ড্রামে সবজি ও ফল চাষ করতে পারবে

৪। সবজি ও ফল গাছের আন্তঃপরিচর্যা করতে পারবে

৫। সবজি ও ফল সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে পারবে

৩. ১. ছাদ বাগান: পাকা বাড়ির খালি ছাদে অথবা বেলকনি/বারান্দাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফুল, ফল, শাকসবজির বাগান গড়ে তোলাকে ছাদ বাগান বলা হয়। এখানে টব, বড় বড় ড্রাম কিংবা ট্রেতে নানা ফুল, ফল ও সবজি রোপণ করা হয় । কেউ কেউ আবার ছাদে স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করে তাতে গাছ রোপণ করেন। ছাদের আকার ও সহনশীলতার দিকে লক্ষ্য রেখে নানা কাঠামোর ওপর টব, মাচা স্থাপন করা হয়। ছাদ বাগান নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদনের সহজ উপায় এবং বাড়ির ছাদসহ দালান ঠান্ডা রাখতে সহায়তা করে।

৩.২. ছাদ বাগানের নকশা প্রণয়ন

ছাদে বাগান করার জন্য আবশ্যিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১। ছাদে বাগান করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিয়মিত পানি সেচ দেয়া।

২। ছাদে বাগানের জন্য গোবর, জৈব সার (কম্পোস্ট), কেঁচো সার (ভার্মিকম্পোস্ট), ট্রাইকোকম্পোস্ট ও কোকোডাস্ট (নারিকেলের ছোবড়ার গুড়া) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সহজে তিন ভাগ দোআঁশ মাটি, পাঁচ ভাগ গোবর, এক ভাগ ভার্মিকম্পোস্ট সার এবং এক ভাগ কোকোডাস্ট দিয়ে মাটির মিশ্রণ তৈরি করতে হয়।

৩। বছরে একবার কম্পোস্টযুক্ত নতুন মাটি দিয়ে পুরাতন মাটি বদলিয়ে দিতে হবে।

৪। টবে/পাত্রের নিচে ছিদ্র থাকা জরুরী। কয়েকটি ভাঙ্গা চাড়ির টুকরা বা পাথর ছিদ্রের মুখের উপর রেখে টবে মাটি ভরতে হবে।

৫। টবে/ড্রামে সবজি/ ফলের ধরণ ও জাত নির্বাচনের পর যৌক্তিকভাবে সাজাতে হয়। ছোট গাছকে সামনে, বড়/লতানো সবজি গাছকে পিছনে রাখতে হবে। যেমন, বড় লতানো গাছ উত্তর ও পশ্চিম দিকে দিতে হবে।

৬। ছাদে বাগান করার ক্ষেত্রে উচচ ফলনশীল জাতের সবজি চারা ব্যবহার বেশি ফলদায়ক।

৭। ফলের চারার ক্ষেত্রে উন্নত জাতের সুস্থ-সবল চারা/কলম বিশ্বস্ত নার্সারি বা কৃষি বিভাগের হর্টিকালচার সেন্টার, গবেষনা প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করতে হবে।

৮। ছাদে চাষের একটা জরুরী বিষয় হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। এ জন্য পুরাতন রোগাক্রান্ত, বয়স্ক ডালপালা, পাতা সাবধানতার সাথে সিকেচার দিয়ে কেটে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করতে হবে। এতে গাছপালা রোগমুক্ত থাকবে এবং মানসম্পন্ন ফলন পাওয়া যাবে।

৯। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় যে কোন ফল জাতীয় সবজিতে পোকা বা রোগের আক্রমণ অহরহ ঘটে থাকে। সেক্ষেত্রে সপ্তাহে কমপক্ষে ২/৩ বার ছাদের বাগান পরিদর্শন করে আক্রান্ত ফল বা ডগা ছেটে ফেলে দিলে পোকা বা রোগের আক্রমণ কমে যাবে এবং ফলন ভাল পাওয়া যাবে।

১০। সহজে পোকামাকড় দমনের জন্য আঠালো হলুদ ফাঁদ, আঠালো সাদা ফাঁদ ও সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে।

১১। স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে ঘরের ভেতরে, সিড়ি, ব্যালকনি, বারান্দা, কার্নিশ এসব জায়গায় অনায়াসে পাতা জাতীয় সবজি গাছ বা লতানো সুদৃশ্য গাছ লাগিয়ে সবুজ পরিবেশ তৈরি করে পরিবেশ সুন্দর করা হয়।

বাড়ির ছাদে ফসল চাষে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

১। ছাদের স্থান নির্বাচন ২। ছাদের আকার ৩। সূর্যালোক ৪। পানির সরবরাহ ৫। ছাদের গঠন ৬। ছাদের ব্যবহার ইত্যাদি।

৩.৩. সবজি ও ফল চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

মাধ্যম বা গ্রোয়িং মিডিয়া:

ভাল ফলন পাওয়ার প্রথম শর্ত হল উন্নতমানের গ্রোয়িং মিডিয়া ব্যবহার করা। ছাদে বাগানের জন্য উন্নতমানের কম্পোস্ট সমৃদ্ধ হালকা বুনটের মাটি ব্যবহার করা উত্তম। আবার কিছু কিছু পটিং মিডিয়ার মিশ্রণ যেমন- পিটমস, ভার্মিকুলাইট, কোকোপিট ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে যেগুলো হালকা, রোগজীবাণু মুক্ত, আগাছা বীজ মুক্ত এবং সুনিষ্কাশন ক্ষমতাসম্পন্ন।

ভার্মিকম্পোস্ট

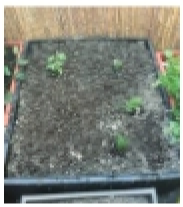

পিটমস

ভার্মিকুলাইট

কোকো ডাস্ট

চিত্র: গ্রোয়িং মিডিয়া

আদর্শ গ্রোয়িং মিডিয়ার উদাহরণ:

১। ৫ ভাগ দোআঁশ মাটি + ৫ ভাগ কম্পোস্ট এর মিশ্রণ

২। ৩ ভাগ দোআঁশ মাটি + ৫ ভাগ গোবর + ১ ভাগ ভার্মিকম্পোস্ট + ১ ভাগ কোকোডাস্ট এর মিশ্রণ

৩। ১০০% মাটি ছাড়া মিশ্রণ, যেমন- পিটমস, ভার্মিকুলাইট, ককোডাস্ট ইত্যাদির মিশ্রণ

ছাদ বাগানের জন্য পট বা কনটেইনার

ছাদ বাগানের জন্য বিভিন্ন ধরনের ও আকারের টব, প্লাস্টিকের/কাঠের বক্স, হাফ ড্রাম বা কনটেইনার ব্যবহার করা যায়। ফসলের আকার আকৃতির উপর ভিত্তি করে কনটেইনারও বিভিন্ন আকারের হতে পারে। নিম্নে কিছু পটের নামসহ উল্লেখ করা হলঃ

১। টবে চাষ: টব বিভিন্ন আকার এবং বিভিন্ন পদার্থের তৈরি হতে পারে। টব মাটির, প্লাষ্টিক বা সিমেন্টের তৈরি হতে পারে। সাধারণত সবজি চাষাবাদের জন্য ১২-১৮ ইঞ্চি ব্যাস এবং ১২-১৮ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট টব ব্যবহার করা যেতে পারে। টবগুলো স্থানান্তর যোগ্য এবং পাতলা বিধায় টবে সবজি চাষ জনপ্রিয়। এসব টবে স্ট্রবেরি, বিভিন্ন ফুলের চারা, টমেটো, বেগুন, মরিচ, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, ব্রোকলি, কুমড়া জাতীয় সবজি (লাউ, করলা, শসা, মিষ্টি কুমড়া) ও সীমের চারা রোপণ করা উত্তম।

২। চৌবাচ্চাকৃতি প্লাস্টিক/কাঠ/স্টীল/ইট সিমেন্ট দিয়ে তৈরি পাত্র বা বক্সে চাষ: চৌবাচ্চাকৃত পাত্রগুলো প্লাস্টিক/কাঠ/স্টীল/ইট সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হতে পারে। এ ধরনের পাত্রগুলো ১০-১২ ইঞ্চি গভীরতা, তিন ফুট প্রস্থ এবং পাঁচ/ছয় ফুট লম্বা আকারের হতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী পাত্রের আকার ছোট বা বড় হতে পারে। এ পাত্রগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী মিস্ত্রি দিয়ে বানিয়ে নিতে হবে বা বাজার হতে ক্রয় করা যাবে। পাত্রগুলো ছাদের ওপরে কয়েকটি ইট বা অন্য কোন অল্প উঁচু স্থাপনার ওপর রাখতে হবে যাতে পাত্রের নীচে ফাকা থাকে, এতে ছাদের কোন ক্ষতি হবে না। এসব পাত্রে শাক জাতীয় সবজির বীজ সরাসরি বপন ও টমেটো, বেগুন, মরিচ, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, ব্রোকলি, কুমড়া জাতীয় সবজি (লাউ, করলা, শসা, মিষ্টি কুমড়া) ও সীমের চারা রোপণ করা যেতে পারে।

৩। হাফ ড্রামে সবজি ও ফল চাষ: বড় আকারের ড্রামের মাঝামাঝি কেটে দুই টুকরো করে বড় দুটি ড্রামের টব তৈরি করা যায়। আম, লিচু, কলা, লেবু, সজনে, কচু চাষের জন্য হাফ ড্রাম ভালো। এগুলো সরাসরি ছাদের ওপর না বসিয়ে কয়েকটি ইটের ওপর বা স্টীলের ফ্রেমে বসানো দরকার।

৪। মাল্টিলেয়ার বস্তায়/বক্সে সবজি চাষ: মাল্টিলেয়ার বস্তায়/বক্সে সবজি চাষ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খাটো শিকড়যুক্ত সবজি নির্বাচন করতে হবে। বিশেষ করে পাতা জাতীয় সবজি গাছ লাগিয়ে ভাল ফলন পাওয়া যেতে পারে।

চিত্র: মাল্টিলেয়ার বস্তায়/বক্সে সবজি চাষ

উপোরক্ত পাত্রগুলোর নিচে অবশ্যই ছিদ্র থাকা জরুরী। কয়েকটি ভাঙ্গা চাড়ির টুকরা বা নেট ছিদ্রের মুখে দিয়ে পাত্রগুলোতে মাটি ভরতে হবে।

৩.৪. চারা উৎপাদন

গুণগত মানের বীজ সংগ্রহ করার পর সবজি ভেদে বীজ সরাসরি জমিতে বপন বা টবে চারা গজিয়ে তারপর রোপণ করতে হবে।

সরাসরি বীজ বপণ: সাধারণত শাক জাতীয় সবজির ক্ষেত্রে সরাসরি বীজ বপন করতে হয়। যেমন: ডাটা, লাল শাক, কলমী শাক, পালং শাক, পুই শাক, লেটুস, সিলারী, পার্সলী, মুলা, গাজর, ধনিয়া ইত্যাদি। তাছাড়া ঢেঁড়শ চাষেও সরাসরি বীজ বপন করতে হয়।

চিত্র: সরাসরি বীজ বপন

চিত্র: চারা উৎপাদন

চারা গজিয়ে তারপর রোপন: টমেটো, বেগুন, মরিচ, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, ব্রোকলী, লাউ, করলা, শসা, মিষ্টিকুমড়া, সীম ইত্যাদি।

- চারা উৎপাদন ছায়াবিহীন, পরিষ্কার এবং বাতাস চলাচলের উপযোগী স্থানে করা প্রয়োজন।
- চারা উৎপাদনের মাটি বেলে দো-আঁশ এবং উর্বর হওয়া উচিত।
- চারা পলিথিনের ব্যাগে বা মাটির টবে উৎপাদন করা যায়।
- আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে আচছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে যেন বৃষ্টির পানি ও অতিরিক্ত সুর্যতাপ থেকে চারাকে রক্ষা করা যায়।

৩.৫. ছাদে গাছ রোপণ: ছাদে বাগান তৈরিতে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে উন্নত জাতের সুস্থ-সবল চারা/কলম সংগ্রহের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বাগানে যেসব দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্য মেয়াদি ফল গাছ রোপণ করা হবে তা বারোমাসী জাতের হলে ভালো হয়। অন্যথায় ৫-৬ মাস একাধারে ফল পাওয়া যায় এমন জাতের গাছ রোপণ করা উচিত। খুব কম সময় ধরে ফল পাওয়া যায় (লিচু) এমন গাছ ছাদের জন্য নির্বাচন করা ঠিক না। বাগানকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন তা সব সময় কোনো না কোনো গাছে ফুল, ফল ও সবজি ধরা অবস্থা বিরাজ করে।

২০১৪

ফল গাছ: আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বারোমাসী লেবু (কাগজি, সিডলেস, এলাচি), মাল্টা, কমলা, বাতাবিলেবু, কুল (টক ও মিষ্টি), ডালিম, শরিফা, সফেদা, আমলকী, বারোমাসী আমড়া, জামরুল, অরবরই, বিলিম্বি, করমচা, ড্রাগন ফল অন্যতম। তবে যে গাছই রোপণকরা হোকনা কেন তা যেন অবশ্যই কলমের গাছ হয়।

শাকসবজি: বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়স, ক্যাপসিকাম, শিম, বরবটি, শসা, করলা, লাউ, ধুন্দল, বারোমাসী সজিনা, লালশাক, ডাঁটাশাক, পুঁইশাক, কলমিশাক, ব্রোকলি, মুলা ইত্যাদি।

মসলা জাতীয়: মরিচ, ধনেপাতা, বিলাতি ধনিয়া, পুদিনা, কারিপাতা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, গোলমরিচ ইত্যাদি।

ঔষুধিগুণ বিশিষ্ট: অ্যালোভেরা, তুলসী, থানকুনি, চিরতা, স্টিভিয়া, গাইনোরা ইত্যাদি।

ফুল জাতীয়: গোলাপ, বেলী, টগর, জুঁই, গন্ধরাজ, জবা, অর্কিড, টিকোমা, জারবেরা, শিউলি, এলামন্ডা, বাগানবিলাশ ও বিভিন্ন মৌসুমি ফুল।

৩.৬. ছাদ বাগান ব্যবস্থাপনার যন্ত্রপাতি

ছুরি/চাকু, কাঁচি, খুরপি, নিড়ানী, সিকেচার, প্রুনিং শেয়ার, হ্যান্ডি-শাবল, ট্রাওয়েল, শাবল, বেলচা, কোদাল, হ্যান্ডস্প্রেয়ার, পানির পাইপ, পানির ঝাঝরি, ঝাড়ু, চালুনী, ট্রলী, ওজন যন্ত্র ছাদের বাগানে কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা আবশ্যক।

চিত্র: ছাদ বাগান ব্যবস্থাপনার যন্ত্রপাতি

৩.৭. আন্তঃপরিচর্যা

গাছের অবস্থান নির্ণয়

কোন কোন গাছ বেশি রোদ পছন্দ করে (কাগজি লেবু, ড্রাগন ফল), কোন গাছ আধা ছায়ায় ভালো হয় (এলাচি লেবু, জামরুল), আবার কোনো গাছ ছায়া পছন্দ করে (লটকন, রামবুটান) । এজন্য ছাদ বাগান থেকে বেশি সুফল পেতে ছাদে রোদের/আলো-বাতাস প্রাপ্তি অবস্থা বুঝে গাছের অবস্থান চূড়ান্ত করা প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ : মাছ, মাংস ও তরকারি ধোয়া পানি গাছে ব্যবহার করলে গাছের খাবারের অভাব কিছুটা পূরণ হয়। এছাড়াও মিশ্র সার, হাড়ের গুড়া মাঝে মাঝে এবং অনুখাদ্য (দস্তা, বোরন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ) বছরে একবার প্রয়োগ করা ভালো। মাছের কাঁটা, হাড়ের টুকরা, ডিমের খোসা, তরিতরকারির পরিত্যক্ত অংশ, পাতা, একটা ড্রামে পঁচিয়ে নিয়ে ছাদ বাগানে ব্যবহার করা ভালো। কয়েক বছরের বয়স্ক গাছের গোড়ার চারধারে সাবধানে কিছু মাটি উঠিয়ে ফেলে নতুন ভাবে পটিং মিডিয়া দিয়ে ভরাট করা হলে গাছের স্বাস্থ্য ফেরানো সহজ হয়। সম্ভব হলে গাছকে ছাঁটাই করে কিছু মাটিসহ উঠিয়ে নিয়ে সার মিশ্রিত মাটি পরিবর্তন করার ব্যবস্থা নেয়া যায়। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ছাড়া আগানো উচিত হবে না। জেনে শুনে অভিজ্ঞ মালীকে সাথে নিয়ে তা করা যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত ছোট টব থেকে বড় টবে গাছ অপসারণ করার মাধ্যমে গাছকে স্বাস্থ্যবান করা যায়। যারা ছাদ বাগানে অভিজ্ঞ তাদের বাগান পরিদর্শন করে ও সফলতার দিকগুলো জেনে বা দেখে শিখে তা নিজ বাগানে প্রয়োগ করা উত্তম।

সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা

১। ছাদে সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা মাটির আর্দ্রতার অভাবের জন্য সহজেই গাছপালা নেতিয়ে যাবে তেমনি অতি পানি বা অতি আর্দ্রতার জন্যও গাছ নেতিয়ে মরা যেতে পারে। তাই অবশ্যই ছাদের বাগানে পরিমিত সেচের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

২। ছাদ বাগানে ঝাঁঝরি দিয়ে সেচ দিতে হবে।

৩। পাত্রে চারা লাগানোর পরপরই গোড়ায় পানি দিতে হবে এবং কয়েকদিন পর্যন্ত পরিমিত সেচ দিতে হবে।

৪। প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে ফুল, ফল ধারণ ব্যাহত হয় এবং যেসব ফুল, ফল ধরেছে সেগুলোও আস্তে আস্তে ঝরে যায়। কাজেই প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার জন্য নীচের নিকাশ ছিদ্র ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে।

বাউনি/জাংলা/মাচা/খুঁটি দেওয়া

লতানো গাছে কাংখিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই সুন্দরভাবে বাঁশ/ পিলার দিয়ে জাংলা বা মাচা বানিয়ে টব/প্লাস্টিকের পাত্রে লতানো সবজি চাষ করা যেতে পারে। মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে যায়, পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কমে যায়। ফলে ফলনও কমে যায়।ফল গাছে খুটি দিয়ে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দিতে হবে।

মালচিং: সেচের পর মাটিতে চটা বাঁধে। চটা বাঁধলে গাছের শিকড়াঞ্চলে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়। কাজেই প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

আগাছা দমন: গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। গাছে খাদ্যোপাদানের অভাব পড়ে। ফলে কাংখিত ফলন পাওয়া যায় না। তাই সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

অপ্রয়োজনীয়, বয়স্ক, মরা শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে ছোট ছোট ডালপালা হয়। সেগুলোকে শোষক শাখা বলা হয়। তাছাড়া এগুলো ছাড়াও বয়স্ক, মরা ডালপালা গাছের ফলনে এবং যথাযথ শারীরিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই গাছের গোড়ার দিকে ডালপালাগুলো ধারালো কাঁচি বা সিকেচার দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।

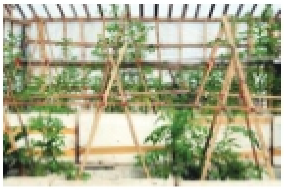

চিত্র: মাচা ও বাউনি দেওয়া

চিত্র: অপ্রয়োজনীয়, বয়স্ক, মরা শাখা সিকেচার দিয়ে অপসারণ

চিত্র: আঠালো হলুদ ফাঁদ

চিত্র: হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন

পোকামাকড় দমন: পোকামাকড় ব্যবস্থাপনার জন্য আঠালো হলুদ ফাঁদ, আঠালো সাদা ফাঁদ, সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া কিছু পোকা হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলা যায়।

ফল ধারণ বৃদ্ধিতে কৃত্রিম পরাগায়ন: লাউ, কুমড়া, করলা, ধুন্দল, ঝিঙ্গাতে পরাগায়ন প্রধাণতঃ মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। উঁচু বিল্ডিং এর ছাদে চাষ করলে মৌমাছির আনাগোনা কমে যায়। সব ফুলে প্রাকৃতিক পরাগায়ন ঘটে না এবং এতে ফলন কমে যায়। তাই হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করে ফলন শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৩.৮. ফসল সংগ্রহ: পরিপক্কতার উপর ভিত্তি করে ছাদ বাগান হতে সবজি ও ফল আহরণ/সংগ্রহ করতে হবে। যতই সবজি ও ফল সংগ্রহ করা হবে ততই সবজি-ফল ধারণ বৃদ্ধি পাবে।

পাঠ সংক্ষেপ

১। ছাদে বাগানের জন্য উন্নতমানের কম্পোস্ট সমৃদ্ধ হালকা বুনটের সার মাটি ব্যবহার করা উত্তম।

২। ছাদ বাগানের জন্য বিভিন্ন ধরনের ও আকারের টব, প্লাস্টিকের/কাঠের বক্স, হাফ ড্রাম বা কনটেইনার ব্যবহার করা যায়।

৩। ছাদ বাগানে দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্য মেয়াদি ফল গাছ রোপণ করা এবং তা বারোমাসী জাতের হলে ভালো হয়।

৪। কুমড়া জাতীয় সবজির ক্ষেত্রে কৃত্রিম পরাগায়ন এর ব্যবস্থা করলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

এসো নিজে করি

ইতিমধ্যে তোমরা ছাদ বাগানে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জেনেছ। নিচের ছবিগুলো দেখে নাম লিখ এবং ছাদ বাগানে এদের ব্যবহার উল্লেখ কর।

যন্ত্রপাতির নাম	ছবি	ব্যাবহার
	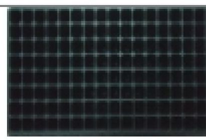	

অনুসন্ধান মুলক প্রশ্ন

অতএব তুমি ছাদ বাগানে সবজি ও ফল চাষ সম্পর্কে জেনেছ। তুমি তোমার বাসার ছাদে একটি ছাদ বাগান করার পরিকল্পনা করেছ। তোমার বাসার ছাদে সফলভাবে একটি ছাদ বাগান করার জন্য প্রথমিকভাবে কি কি বিষয় বিবেচনা করতে হয় তার একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ছাদ বাগানে কি ধরনের মাটি ব্যবহার করা হয়?
২. ছাদ বাগানে কি কি গ্রোয়িং মিডিয়া ব্যবহার করা হয়?
৩. ছাদ বাগানে কোন ধরনের সজির ক্ষেত্রে কৃত্রিম পরাগায়ন করা হয়?
৪. ছাদ বাগানের কোন ধরনের সজির ক্ষেত্রে মাচা দিতে হয়?
৫. ছাদ বাগানে পোকামাকড় দমনে কি ধরনের ফাঁদ ব্যাবহার করা হয়?
৬। গাছের ডালপালা ছাঁটাই করার যন্ত্রের নাম কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ছাদ বাগানে কি কি ধরনের ফলের চাষ করা যায়?
২. ছাদ বাগানে কি কি ধরনের সজির চাষ করা যায়?
৩. ছাদ বাগানে কি কি ধরনের ফুলের চাষ করা যায়?
৪. ছাদ বাগানে টবে চাষ করা যায় এমন পাঁচটি ফসলের নাম লিখ|
৫. ছাদ বাগানে ব্যবহারযোগ্য তিনটি আদর্শ গ্রোয়িং মিডিয়ার নাম লিখ|
৬। ছাদ বাগানে ব্যবহার করা হয় এমন ১০ টি যন্ত্রপাতির নাম লিখ।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ছাদ বাগানের চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।
২. ছাদ বাগানের জন্য মাটি তৈরি ও গাছ রোপণ সম্পর্কে আলোচনা কর।
৩. ছাদ বাগানের ফসলের আন্তঃপরিচর্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

শিখন ফল

১। প্রয়োজন অনুযায়ী টব নির্বাচন করতে পারবে।
২। টবের জন্য প্রয়োজনীয় মাটি সরবরাহ ও প্রস্তুত করতে পারবে।
৩। টবের জন্য উপযুক্ত গাছ নির্বাচন করতে পারবে।
৪। টবে গাছ রোপণ ও ছাদে গাছের অবস্থান নির্ণয় করতে পারবে।
৫। রোপণকৃত গাছের পরিচর্যা করতে পারবে।

জব ৩.১: টবে গাছ লাগানোর দক্ষতা অর্জন

পারদর্শীতার মানদন্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ শনাক্ত ও সংগ্রহ করা
৩। হ্যান্ড গ্লাবস পরিধান করা
৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যাবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিস্কার করা
৫। অব্যাবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষন করা
৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ট	১ টি
২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ট	১ জোড়া
৪	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ টি
৫	গামবুট	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী

মানুষ সৃজনশীল ও সৌন্দর্য্য প্রেমী। নিজের খেয়ালে যে কয়টি কাজ করে মানুষ তৃপ্ত হয় এর মধ্যে বাগান করা অন্যতম। তাই আপনিও নিজের শখের মূল্য দিতে বাড়ির সামনে বাগান করার জায়গা না থাকলেও বাড়ির ছাদে, বারান্দায় কিংবা কার্নিশে বাগান তৈরি করতে পারেন। টবে সবজী, ফুল ও ফলের চাষ করা যায়। তবে টবে গাছ লাগানোর আগে ও পরে কিছু নিয়ম নীতি জেনে রাখা জরুরি। সঠিক পদ্ধতিতে পরিচর্যা করলে টবের গাছটিও বেড়ে উঠবে সুন্দর করে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। মাটি, ২। টব, ৩। জৈব ও রাসায়নিক সার, ৪। বীজ/চারা, ৫। নিড়ানি, ৬। খুরপি, ৭। খুটি, ৮। রশি, ৯। টুকরি, ১০। ঝাঁঝরি, ১১। খাতা ও কলম

কাজের ধারা

১। গাছের আকার ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজের টব ব্যবহার করতে হবে। বীজ বুনে চারা উৎপাদনের জন্য চওড়া ও অগভীর টব। মৌসুমী সবজি ও ফুলের জন্য মাঝারী আকৃতির এবং বর্ষজীবী, বহুবর্ষজীবী ও ঝোপ জাতীয় গাছের জন্য বড় আকারের টব প্রয়োজন। মাটির তৈরি কাঠ, কংক্রিট, সিরামিক এবং প্লাস্টিকের তৈরি টব ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। পানি চুয়ানোর জন্য টবেব নিচে ২/১ টি ছিদ্র থাকা প্রয়োজন। ছিদ্রযুক্ত টবেব নিচে ভাঙ্গা চাড়া, ঝামা, নারিকেলের ছোবড়া, খড়কুটা বা ইটের টুকরো দিয়ে বন্ধ করে তার উপর কিছু শুকনো পাতা দিতে হবে।

৩। এরপর বেলে মাটি এবং তার উপর জৈব সার সমৃদ্ধ দোআশ মাটি দিয়ে টব এমনভাবে ভর্তি করে দিতে হবে যেন ওপরে অন্তত এক ইঞ্চি পরিমাণ খালি থাকে।

৫। নতুন কিংবা পুরাতন উভয় প্রকার টবই ব্যবহারের আগে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে কড়া রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। এতে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।

৬। টবের জন্য উপযুক্ত গাছ নির্বাচন করতে হবে।

৭। টবে সজির/ফুলের চারা বীজতলা থেকে অথবা ছোট টব থেকে স্থানান্তর করে বড় টবে রোপণ করতে হবে। ফলের চারার ক্ষেত্রে উন্নত জাতের কলমের রোপণ করতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে মাটি শক্ত করে দিতে হবে, যাতে চারাগাছ হেলে না পড়ে ৰরং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

৮। সদ্য লাগানো চারা কয়েকদিন ছায়ায় রেখে সহনশীল করে নিতে হয়। যদি সম্ভব না হয় তাহলে কলা বা সুপারী গাছের খোল কেটে অথবা অন্য উপায়ে চারাগুলো রৌদ্র থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এ অবস্থায় সকালে-বিকালের রোদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। ছাদ বাগান থেকে বেশি সুফল পেতে ছাদে রোদের/আলো-বাতাস প্রাপ্তি অবস্থা বুঝে গাছের অবস্থান চূড়ান্ত করতে হবে। যেমন: রোদ পছন্দ কারী (কাগজি লেবু, ড্রাগন ফল, সবজি), আধা ছায়ায় ভালো হয় (ফুল, মরিচ, এলাচি লেবু, জামরুল) এবং ছায়া পছন্দ কারী (আদা, লটকন, রামবুটান) গাছ।

১০। প্রতিটি কাজ ধারাবাহিকভাবে ব্যাবহারিক খাতাই লিখতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। টবে অতিরিক্ত পানি দেয়া যাবেনা

২। জৈব/রাসায়নিক সার টবের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে

৩। টবের গাছ যেন অতিরিক্ত লম্বা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা / ফলাফল

টবে গাছ লাগানোর সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছো।

ফলাফল

আশা করি বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়

শিম, বরবটি ও ঢেঁড়স চাষ

(Cultivation of Country Bean, Yard Long Bean and Lady's Finger)

বরবটি ও ঢেঁড়স গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমের অন্যতম প্রধান সবজি। শিম শীতকালীন সবজি হলেও বর্তমানে গ্রীষ্মকালে এর চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে। সবজিগুলো প্রোটিন এবং আঁশ জাতীয় উপাদান সমৃদ্ধ যাহা মানব দেহের জন্য উপকারী। বাংলাদেশের সর্বত্র সবজিগুলো বাণিজ্যিকভাবে ও বসতবাড়ীতে চাষ হচ্ছে। এ অধ্যায়ে আমরা শিম, বিরবটি ও ঢেঁড়স চাষ নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় শেষে-

- চাষযোগ্য সবজিসমূহের নাম ও পরিচিতি লিখতে পারবে
- শিম, ববরবটি ও ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজিগুলোর বিভিন্ন পুষ্টিগুণ ও ব্যবহার বলতে পারবে
- উপর্যুক্ত সবজিগুলোর উৎপত্তিস্থল, জলবায়ু ও মাটি, বিভিন্ন জাত এবং সবজির চাষ মৌসুম বর্ণনা করতে পারবে
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে আধুনিক পদ্ধতিতে উক্ত সবজিগুলোর চাষাবাদ ও অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে পারবে
- উক্ত ফসলগুলোর উপযুক্ত সময় ও পদ্ধতিতে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করতে পারবে
- উপর্যুক্ত সবজিগুলোর চাষাবাদে ক্ষতিকর বালাই সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় দমন ব্যবস্থা নিতে পারবে

৪.১ দেশি শিম (Country Bean)

শিম বাংলাদেশের একটি অতি জনপ্রিয় ও উপাদেয় সবজি। শিমের কচি শুঁটি এবং পরিপক্ক বীজ উভয়ই খাওয়া যায়। শিম সবজি হিসাবে দেশের সবত্র বাণিজ্যিকভাবে ও বসতবাড়িতে চাষ হচ্ছে।

৪.১.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

সবজির পরিচিতি ও ব্যবহার: দেশি শিম বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সবজি। শিম একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ সবজি। শিম বা ফল সবজি হিসাবে রান্না এবং ভর্তা করে খাওয়া হয়। এর বীজ পুষ্টিকর সবজি বা ডাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও কোন কোন অঞ্চলে শিম সবুজ সার ও গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয় যেমন: ফেলন।

চিত্র: শিম দিয়ে মাছ

চিত্র: শিম দিয়ে আলু ভাজি

চিত্র: শিমের বিচি দিয়ে ডিম রান্না

চিত্র: বিভিন্ন সবজির সাথে শীম

বৈজ্ঞানিক নাম: *Lablab purpureus.*

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম শিমে আছে পানি ৮৫ গ্রাম, আমিষ ৩.৮ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৮.০ গ্রাম, আঁশ ১.৮ গ্রাম, ফ্যাট ০.৭ গ্রাম, শক্তি ৪৮ কিলোক্যালরি, ক্যারোটিন ৩১২ আইইউ, থায়ামিন ০.১ গ্রাম, রাইবোফ্লাভিন ০.০৬ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ০.৭ মিলিগ্রাম, ভিটামিন "সি" ৯.১ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ২১০ মিলিগ্রাম এবং আয়রন ১.৭ মিলিগ্রাম।

উৎপত্তি: এশিয়া মহাদেশের ভারত হচ্ছে শিমের উৎপত্তিস্থল।

জলবায়ু ও মাটি: শিমের অঙ্গজ বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুসহ দীর্ঘ দিবসের প্রয়োজন। আবার ছোট দিবস ও শীত না পড়লে শিমের পুষ্পধারণ সম্ভব হয় না। এ জন্য তাপ ও দিবস নিরপেক্ষ জাত হলে বছরের যে কোন সময় বীজ বপন/ রোপণ করলে ফুল-ফল ধারণ করবে। সব ধরনের মাটিতেই শিম চাষ হয়। তবে সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি ভাল ফলনের জন্য উপযোগী।

চিত্র: মাঠে শীম চাষ

বীজ বপন/ চারা রোপণ মৌসুম: আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত বীজ বপণের উপযুক্ত সময়।

জাত পরিচিতি: বাংলাদেশে প্রায় ৫০ টিরও বেশি স্থানীয় শিমের জাত আছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য স্থানীয় জাতগুলো হলো: পুটি শিম, সীতাকুন্ডু, নলডক, হাতিকান, বাইনতারা, চ্যাপটা শিম,ধলা শিম ইত্যাদি।

আধুনিক উচ্চফলনশীল জাতসমুহ হলো: বাবি শিম-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ইপসা শিম-১, ২, বিইউ শিম-৩, ইত্যাদি।

চিত্র: বারি শিম-১

চিত্র: বারি শিম-২

চিত্র: বারি শিম-৫

চিত্রঃ বিইউ শিম-৩

চিত্রঃ ইপসা শিম-১

চিত্রঃ ইপসা শিম-২

বীজ বপনের সময়

১) শীতকালীন: জুন- জুলাই

২) গ্রীষ্মকালীন: বছরের যে কোন সময়

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন: বর্ষাকালে যদি প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তাহলে মাদায় বপনকৃত বীজ পচে যেতে পারে। চারা নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে এ সময় বাড়ির নিরাপদ স্থানে পলিব্যাগে চারা তৈরী করে নিতে হবে। জুলাই- আগষ্ট মাসে পলিব্যাগে উৎপাদিত ১০-১৫ দিন বয়সী চারা মূল জমির মাদায় রোপণ করতে হবে।

বীজতলার চারার পরিচর্যা

১. রোদ বৃষ্টি হতে চারাকে রক্ষা করার জন্য বীজতলার উপর শেড দিতে হবে।

২. চারার প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে, তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে। পলিব্যাগের মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

বীজ হার: প্রতি শতকে ৩০ গ্রাম (একরে ৩.০ কেজি) বীজ লাগে।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন: মাদায় সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় দুই-তিনটি বীজ ফাঁক ফাঁক করে ২.৫-৩.০ সে.মি. গভীরে বপন করতে হয়। চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় দু'টি

সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি চারা গজায়। এক শতক বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ৩০ গ্রাম (হেক্টরে ৫-৭ কেজি) শিম বীজের প্রয়োজন হয়।

মাদা তৈরি: দেশী শিম প্রধানত মাদা প্রথায় বসতবাড়ির আশপাশে, পুকুরপাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে চাষ করা হয়। তবে সারি করে চাষ করা হলে ১ মিটার দূরত্বে সারি করে প্রতি সারিতে ৫০ সে.মি. পর পর ৪৫ সে.মি. লম্বা, ৪৫ সে.মি. চওড়া ও ৪৫ সে.মি. গভীর করে মাদা তৈরি করতে হয়। বীজ বপনকালে বর্ষা থাকে, তাই মাদায় যাতে পানি না জমে সে জন্য জমির সাধারণ সমতল হতে মাদার ভরাট মাটি ৫ সে.মি. পরিমাণ উঁচু রাখতে হয়।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা: শিমের চারা ও তার আশপাশের আগাছা নিড়ানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। তা ছাড়া মাঝে মধ্যে নিড়ানি দিয়ে চারার গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে আলগা ও ঝুরঝুরে করে রাখতে হবে। শিমের খরা সহ্য করার ক্ষমতা থাকলেও বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাটতি হলে পানি সেচ দিতে হবে।

৪.১.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন: ভাল ফলনের জন্য সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি: প্রথমে ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে। নির্দিষ্ট দূরত্বে উঁচু মাদা তৈরি করে বীজ রোপণ বা চারা রোপণ করতে হবে। সেচ ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য বেড় ১৫-২৫ সে.মি. উঁচু এবং ২.৫ মিটার প্রশস্ত হলে ভাল হবে। জমি ও কাজের সুবিধার জন্য যত পারা যায় লম্বা করতে হবে। দুটি বেড়ের মাঝে ৫০ সে.মি. প্রশস্ত এবং ১৫-২৫ সে.মি. গভীর নালা রাখতে হয়। ২.৫ মিটার প্রশস্ত বেড়ের উভয় পার্শ্বে ৫০ সে.মি. করে বাদ দিয়ে ১.৫ মিটার দূরত্বে ৪০ সে.মিX৪০ সে.মিX৪০ সে.মি. সাইজের মাদাতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করে তৈরি করে ফেলতে হবে। তবে ১ মিটার প্রস্থ বেড় ও একক সারি পদ্ধতিতে ১.০-১.৫ মিটার দূরত্বে বীজ বপন/রোপণ করতে হবে। এ পদ্ধতিতে গাছের পরিচর্যা ও ফসল উত্তোলন সুবিধাজনক।

চিত্রঃ মাঠে শিম চাষ (মাচায়)

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: শিম ফসলের ক্ষেতে শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর সার, জিপসাম ও বোরিক এসিড জমিতে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে ভালভাবে চাষ দিতে হবে। বীজ বপন ও চারা রোপণের ৪-৫ দিন আগেই ইউরিয়া ও এমপি সারের অর্ধেক এবং টিএসপি সারের সবটুকু একত্রে ছিটিয়ে মাদায় মাটির সাথে (১০ সে.মি. গভীর পর্যন্ত) ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বপন/চারা রোপণের ৩০ দিন

পর বাকী অর্ধেক ইউরিয়া সার ও এমপি সার মাদায় উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে প্রতি শতংশে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি তুলে ধরা হল।

সারের নাম	**মোট পরিমাণ**	**শেষ চাষের সময় প্রয়োগ**	**বপন/রোপণের ৪-৫ দিন পূর্বে মাদায় প্রয়োগ**	**মাদায় উপরিপ্রয়োগ (বপন/রোপণের ৩০ দিন পর)**
গোবর	৪০ কেজি	সব টুকু	-	-
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম	-	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
টিএসপি	৩৫০ গ্রাম	-	সব টুকু	-
এমপি	২৫০ গ্রাম	-	১২৫ গ্রাম	১২৫ গ্রাম
জিপসাম (সালফার সার)	২০ গ্রাম	সব টুকু	-	-
বোরিক এসিড (বোরণ সার)	২০ গ্রাম	সব টুকু	-	-

৪.১.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

সার প্রয়োগ ও মাদা তৈরীর ৪-৫ দিন পর মাদায় বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। বীজ সরাসরি মাদায় বপন করতে হবে। তবে পলিব্যাগে চারা তৈরী করে মাদায় রোপণ করা যায়। পলিব্যাগের ১০-১৫ দিন বয়সের চারা (২-৩ পাতা যুক্ত) মাদায় রোপণ করা উত্তম। কারণ শিমের চারার ডগা লতানো শুরু করলে রোপিত চারার অঙ্গজ বৃদ্ধি বিলম্বিত হয়। বপনকৃত বীজ থেকে চারা বের হবার ৮-১০ দিনের মধ্যেই প্রতিটি মাদায় একটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

৪.১.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শূন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): ৮-১০ দিনের মধ্যে যে সব চারা মারা যায়, সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া বা বাউনি দেওয়া: শিমের কাংখিত ফলন পেতে হলে অবশই মাচা বা বাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। গাছ যখন ১৫ থেকে ২০ সেমি লম্বা হবে তখন মাদার গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা মাটিতে পুঁতে বাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। বাউনির অভাবে গাছের শাখা প্রশাখার বৃদ্ধির ব্যাহত হয় ও ফলন কমে যায়।

আগাছা দমন: মাঝে মাঝে নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাদার মাটি আলগা করে দিতে হবে।

শাখা ছাঁটাই: পুরানো ও মরা শাখা, ডগা ছাঁটাই করে দিতে হবে।

ডগার প্যাঁচ খোলা: শিমের ডগা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ কমাতে ও বেশি ফুল ধরাতে জড়াজড়ি করে থাকা ডগাগুলোর প্যাঁচ মুক্ত করে দিতে হবে।

সেচ ও পানি নিকাশ: কোন অবস্থাতেই গাছের গোড়ায় পানি যাতে না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে প্রয়োজনমতো সেচ দিতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

ক) পোকামাকড়

১) শিমের জাব পোকা

লক্ষণ: জাব পোকা পোকা গাছের কঁচি পাতা ও ডগার রস শুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১) হাত দিয়ে পিষে পোকা মেরে ফেলা।
২) আক্রান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ করা।
৩) প্রাথমিক অবস্থায় শুকনো ছাই প্রয়োগ করা।
৪) পরভোজী পোকা লালন করা যেমন: লেডিবার্ডবিটল ।
৫) ডিটারজেন্ট পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।
৬) পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা ডায়মেথিয়ন নামক কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

চিত্র: শিমে জাব পোকার আক্রমণ

২) শিমের ফল ছিদ্রকারী পোকা (Pod borer)

লক্ষণ: এ পোকা ফলে ঢুকে বীজ ও শিম খেয়ে নষ্ট করে দেয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১) এ পোকা দমনের জন্য আক্রান্ত ফল তুলে ধ্বংস করতে হবে।
২) তাছাড়াও রিপকর্ড নামক কীটনাশক ১ মিলি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চিত্র: শিমে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ

খ) রোগবালাই: শিমের বিভিন্ন রোগবালাই আক্রমণ করে থাকে:

১) **এনথ্রাকনোজ রোগ:** এ রোগ ছত্রাক জনিত।

লক্ষণ: এ রোগ আক্রান্ত গাছের পাতা, কান্ড ও শিম প্রথমে বাদামী রং এর পঁচা ক্ষত দেখা যায়। পরে তা বেড়ে গিয়ে গাছ ও ফল নষ্ট করে দেয়।

দমন ব্যাবস্থাপনা

১) রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা।

২) বীজ লাগানোর আগে প্রোভ্যাক্স প্রতি কেজি বীজের জন্য ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করা।

৩) এই রোগ দমনের জন্য ডায়াথেন এম-৪৫ বা টপসিন এম ০.২% দ্রবণ প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

চিত্র: এনথ্রাকনোজ রোগ

২) হলুদ মোজাইক রোগ: ভাইরাসের জন্য এই রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণ: এ রোগ পাতায় আক্রমণ করে। পাতা হলুদ ও সবুজ রং এর মোজাইক দেখা দেয়।

দমন ব্যাবস্থাপনা

১) এই রোগ দমনের জন্য আক্রান্ত গাছ নষ্ট করে এ রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।

২) যেহেতু বীজের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায় সেজন্য আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ না করে সুস্থ ফসল থেকে বীজ সংগ্রহ ও ব্যবহার করে এ রোগের আক্রমণ বন্ধ করা যায়।

৩) জাব পোকা এ রোগের বাহক, তাই এদের দমনের জন্য ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক ১ মিলি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

চিত্র: হলুদ মোজাইক রোগ

৪.১.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফলের পরিপক্কতার নির্ধারণ: ফুল ফোটার ২৫-৩০ দিনের মধ্যে শিম তোলার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। জাতভেদে বীজ বোনার ৯৫ থেকে ১৪৫ দিন পর শিম তোলা যায়। সবজি হিসাবে বীজ শক্ত হবার আগেই শিম সংগ্রহ করতে হয়। শিমের বীজও ভাল সবজি। তাই বীজ শক্ত হলেও সংগ্রহ করা যায়।

শিম সংগ্রহ: জাতভেদে বীজ বোনার ৯৫ থেকে ১৪৫ দিন পর শিম তোলা যায়। ৫-৭ দিন অন্তর উঠালে মোট ১৩-১৪ বার শিম সংগ্রহ করা যায়। শিম গাছ ৪ মাসের বেশি সময় ধরে ফল দেয়।

শিমের বাজারজাতকরণ: প্রতিবার শিম তোলার পর বাজারে নিতে হবে। শিমের কাঁচা ও শুকনা শুঁটির চাহিদাও প্রচুর। এগুলো সংগ্রহ করে বাজারে নিলে ভালো দাম পাওয়া যায়।

শিমের ফলন: প্রতিশতকে ৬০ থেকে ৮০ কেজি।

৪.২ বরবটি (Yardlong Bean)

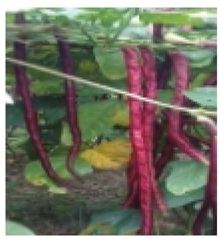

বরবটি বাংলাদেশের খরিপ মৌসুমের একটি জনপ্রিয় সবজি। এর ফল জাতভেদে প্রায় আধা গজ লম্বা হয়। বরবটি সবজি হিসাবে দেশের সবত্র বাণিজ্যিকভাবে ও বসতবাড়িতে চাষ হচ্ছে।

৪.২.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

সবজির পরিচিতি ও ব্যবহার: বরবটি একটি লতানো স্বভাবের একবর্ষী গুল্ম প্রকৃতির গাছ। জাতভেদে ফলের রং সবুজ, সাদা ও মেরুন হয়। বরবটি একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ সবজি। কচি ফল কাঁচা খাওয়া হয় ও সবজি হিসাবে রান্না করে খাওয়া হয়। সালাদ হিসাবেও কাঁচা বরবটি খাওয়ার রেওয়াজ আছে। কুচি কুচি করে

বরবটি কেটে তা ডিমের সাথে মেখে ওমলেট ভেজে খাওয়া হয়। এ ছাড়া বেসনে মিশিয়ে বড়া ভাজা হয়। বরবটি কেবল সবজিই নয়, পশুখাদ্য ও সবুজ সার হিসাবে এর ব্যবহার ব্যাপক।

চিত্র: আলু বরবটি ভাজি

চিত্র: মাছ দিয়ে বরবটি

চিত্র: বরবটি ভাজি

চিত্র: বরবটি দিয়ে চিংড়ি

বৈজ্ঞানিক নাম: বরবটির বৈজ্ঞানিক নাম *Vigna unguiculata.*

পুষ্টিমান: বরবটির প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যাংশে আছে পানি ৮৬ গ্রাম, শক্তি ৫০ কিলোক্যালরি, আমিষ ৩.৫ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৮.০০ গ্রাম, ফ্যাট ০.২ গ্রাম, ক্যারোটিন ৭৬০ আইঃইউঃ, থায়ামিন ০.১২ গ্রাম, রাইবোফ্লাভিন ০.১৫ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ১.১৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন “সি” ১৬ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ৮০ মিলিগ্রাম এবং আয়রন ১.২ মিলিগ্রাম।

উৎপত্তি: বরবটির উৎপত্তিস্থল হচ্ছে চীন।

জলবায়ু ও মাটি: উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বরবটি ভালো জন্মে। ২০-৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বরবটি ভালো হয়। দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি বরবটি চাষের জন্য উপযোগী। বরবটি চাষের জন্য মাটির অনুকুল পিএইচ হলো ৫.৫ থেকে ৭.৫।

জাত পরিচিতি: বরবটির জাত সমুহ হলোঃ ঘৃতকুমারী, গ্রীন লং, চীনা বরবটি, লাল বেনী, তকী, বনলতা ইত্যাদি। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কর্তৃক “বারি বরবটি-১” নামে একটি জাত উদ্ভাবন করেছেন। এই জাতটি গাঢ় সবুজ ও উচ্চফলনশীল। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করোরেশন (BADC) কতৃক উদ্ভাবিত “কেগরনাটকী’ জাতটি এদেশে ভীষণ জনপ্রিয়।

বীজ বপনে সময়: বরবটির বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই মাস। তবে মার্চ- এপ্রিল মাস বীজ বপনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। শীতকালে বরবটির বীজ বোনা উচিৎ নয়।

বীজ শোধন: বরবটির বীজ বপনের আগে কার্বেন্ডাজিম বা থিরাম জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করে নিলে ছত্রাক ঘটিত রোগের আক্রমণ কমে যায়।

বীজ হার: ৪০ গ্রাম/ শতক।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন:

মাদা তৈরি: বরবটির জন্য দুই পদ্ধতি অবলম্বন করে চাষাবাদ করা যায়। একটি হচ্ছে বীজতলায় বা পলিব্যাগে চারা উৎপাদন এবং আরেকটি সারিতে মাদা করে বীজ বপন। সারিতে মাদা করে সরাসরি বীজ বপন করা যায়। সারি পদ্ধতিতে ৩০ সে.মি. দূরে দূরে বীজ লাগাতে হবে এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সে.মি। এখানে ৬০ দিন পর্যন্ত নিয়মিত পানি দিতে হবে।

বেড তৈরি: মাটি থেকে ১৫-২০ সে.মি উচু করে ১ মি. চওড়া ও দৈর্ঘ্য অনুযায়ী লম্বা করে বেড তৈরি করতে হবে। ২০ সে.মি. গভীর করে ৫০ সে.মি প্রস্থের নালা তৈরি করতে হবে। প্রতি বেডে সারি হবে দুইটি এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছ এর দূরত্ব হবে ৩০ সে.মি.।

চিত্র: পলিব্যাগে বরবটির চারা

৪.১.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সুর্যালোক পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন: প্রায় সব ধরনের মাটিতে বরবটি চাষ করা যায়। তবে দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটিতে বরবটির চাষের জন্য বেশি উপযোগী।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি: বরবটি চাষের জন্য জমি হতে হবে আগাছা মুক্ত ও ঝুরঝুরে মাটি। এর জন্য জমি ভালোভাবে কয়েকবার চাষ দিতে হবে। জমি পরিষ্কার করে ৪ থেকে ৫ টি চাষ ও মই দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরি করতে হবে। তারপর মাটির উপরে বেড ও মাদায় তৈরি করে প্রত্যেক মাদায় ৪-৫ টি বীজ বপন করতে হবে। হয়। বীজ বপনের সময় খেয়াল রাখতে হবে সারি হতে সারির দূরত্ব হতে হবে ৬০ সে.মি. এবং মাদা হতে মাদার দূরত্ব হতে হবে ৩০ সে.মি.। একই সময় পলিব্যাগে কিছু চারা তৈরি করে রাখলে যেসব জায়গায় বীজ গজাবে না, সেসব ফাঁকা জায়গায় পলিব্যাগের উৎপাদিত চারা রোপণ করে শূন্য স্থান পুরণ করা যাবে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১০ কেজি (শতকে ৪০ গ্রাম) বীজ লাগে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: বরবটির জন্য নির্ধারিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর সার, জিপসাম ও বোরণ জমিতে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। বীজ বপনের বা চারা রোপণের ৪-৫ দিন আগেই ইউরিয়া এবং পটাশ সারের অর্ধেক এবং টিএসপি সারের সবটুকু একত্রে মাদায় মাটির সাথে (১০ সেমি গভীর পর্যন্ত) কোদালের সাহায্যে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া এবং এমপি সারের বাকি অর্ধেক বীজ লাগানোর ৩০ দিন পর বেডে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে কোদাল দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বরবটি ডালজাতীয় ফসল বলে নাইট্রোজেন জনিত সার কম লাগবে।

নিম্নে শতাংশ প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি দেখানো হল:

সারের নাম	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	বপন/রোপণের ৪-৫ দিন পূর্বে মাদায় প্রয়োগ	বপনের ৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ
গোবর	৬০ কেজি	সব	-	-

২০২৪

ইউরিয়া	২০০ গ্রাম	-	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
টিএসপি	৬০০ গ্রাম	-	-	-
এমপি	৬০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম
জিপসাম (সালফার সার)	৪০০ গ্রাম	সব	-	-
জিংক সালফেট	৫০ গ্রাম	সব	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	সব	-	-

৪.২.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

সারি পদ্ধতিতে ২.৫-৫ সে.মি. গভীরতায় বীজ বপন করতে হবে। বীজ বোনার ২০-৩০ দিন পর্যন্ত বরবটির জমিতে আগাছা জন্মাতে দেয়া যাবে না।

৪.২.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

মাচা দেওয়া বা বাউনি দেওয়া: বরবটির জন্য বাউনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চারা বড় হলে মাচা বা বাউনি দিতে হবে। প্রতি বেডের ঠিক মাঝখানে বা বরবটির দুটি সারির মাঝে বেড়ের দুপাশে ১.৫ মিটার লম্বা দুটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে তার মাথায় শক্ত জিআই তার টেনে বাউনির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সারিতে প্রতি দুইটি বরবটি গাছের মাঝে একটি করে কাঠি বা বাশের কঞ্চিতে জিআই তারের সাথে ইংরেজি 'এ" অক্ষরের মতো বেঁধে তার সাথে গাছ লতিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বরবটির লতা যত মুক্তভাবে বাইতে পারে ফলনও তত বেশি হয়।

আগাছা দমন ও নিড়ানী বৃষ্টির পানি যাতে আটকে না থাকে সেজন্য নালার আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে এবং জমি সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে। বরবটির গাছ বড় হলে মাচা তৈরি করে দিতে হবে।

সেচ ও পানি নিষ্কাশন: বেডের দুই পাশের নালা দিয়ে বরবটির জমির সব জায়গায় সমান ভাবে পানি সেচ দেয়া বা অতিরিক্ত সেচ বা বৃষ্টির পানি সহজেই বের করা যায়। ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। সেচের পরপরই জমে থাকা পানি সরিয়ে দিতে হবে। জমিতে মাটির অবস্থা বুঝে মাঝে মাঝে সেচ দিতে হবে। জমিতে পানি জমে থাকতে দেওয়া যাবে না।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

ক) পোকামাকড়

১) বরবটির জাব পোকা (Aphid)

লক্ষণঃ গাছের পাতা ও কচি ডগার রস শোষণ করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১) হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করা

২) এ পোকা দমনের জন্য ফাইফানন -৫৭ ইসি ২.৫ মি.লি./ ১ লিটার হারে পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চিত্র: বরবটির গাছে জাব পোকার আক্রমণ

২) বরবটির ফল ছিদ্রকারী পোকা (Pod borer)

লক্ষণ: এ পোকার কীড়া গাছের কান্ড, মুকুল এবং ফল ছিদ্র করে দেয় এবং আক্রান্ত ফল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য ফসলের মাঠে পর্যায়ক্রমে ট্রাইকোগামা ও ব্রাকন বোলতা ছাড়া যায়। এসব বোলতা ফল ছিদ্রকারী পোকাদের পরজীবীতার মাধ্যমে মেরে ফেলে।

২. প্রতিকারের জন্য ১ মিলি রিপকর্ড ১০ ইসি কীটনাশক ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চিত্র: ফল ছিদ্রকারী পোকা আক্রান্ত বরবটি

খ) রোগবালাই

১) **এনথ্রাকনোজ রোগ:** এটি ছত্রাকজনিত রোগ।

লক্ষণ: এ রোগ আক্রান্ত গাছের পাতা, কান্ড ও ফলে প্রথমে বাদামী রং এর পঁচা ক্ষত দেখা যায়। পরে তা বেড়ে গিয়ে গাছ ও ফল নষ্ট করে দেয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. রোগটি বীজবাহিত ছত্রাক। তাই ১ কেজি বীজ ২.৫ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করে বীজ বপন করতে হয়।

২. রোগ দমনের জন্য ডায়াথেন এম-৪৫ বা টপসিন এম ০.২% দ্রবণ প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

চিত্র: এনথ্রাকনোজ রোগ

৪.১.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফলের পরিপক্কতার নির্ধারণ: বরবটি কচি অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে। যখন দেখা যাবে ফলে বীজ গঠিত হয়েছে কিন্তু বীজ পুষ্ট ও পরিপূর্ণ ভাবে বড় হয়নি, খোসার রং স্বাভাবিক সবুজ আছে, হলুদাভ বা ফিকে সবুজ হয়নি, বরবটি খোসা মসৃন আছে, বীজ ফুলে যাওয়া ও কুঁচকানো হয়নি এরূপ অবস্থায় বরবটি তুলতে হবে।

বরবটি সংগ্রহ: জাতভেদে বীজ বপনের ৪০ থেকে ৪৫ দিন পর বরবটি তোলা শুরু করা যায়। ছুরি দিয়ে বোঁটা কেটে বরবটি তোলা ভালো। এতে গাছের ক্ষতি কম হয়।

বরবটি বাজারজাতকরণ: প্রতিবার বরবটি তোলার পর বাজারে নিতে হবে। সংগ্রহ করা ফসল আঁটি বেঁধে বাজারে বিক্রির জন্য নিতে হবে। সাধারণত আধা কেজি থেকে ১ কেজির আঁটি করা হয়। আঁটি বাঁধার সময় পোকাক্রান্ত, বিকৃত, রোগগ্রস্ত বরবটি বাদ দিতে হবে। মোটামুটি একই রকম লম্বা চেহারার বরবটি একসাথে আঁটি বাঁধলে তার বাজারদর ভালো পাওয়া যায়।

ফলনঃ বরবটির ফলন প্রতি শতকে ৬৫ থেকে ৭০ কেজি।

৪.৩ ঢেড়ঁস (Okra/Lady's Finger)

গ্রীষ্মকালীন সবজি হিসাবে বাংলাদেশের সব অঞ্চলের লোকের কাছে ঢেড়ঁস খুবই জনপ্রিয়। ঢেড়ঁস এর অন্য নাম ভেন্ডি। ঢেড়ঁস বাংলাদেশের গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমের একটি অন্যতম প্রধান সবজি।

৪.৩.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

সবজির পরিচিতি ও ব্যবহার:

ঢেড়ঁস একটি বর্ষজীবী বিরুৎ প্রকৃতির গাছ। আমাদের দেশে মূলত ভাজি, ভর্তা ও রান্নায় তরকারি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঢেড়ঁস কাটলে পিচ্ছিল পদার্থ বের হয়, রান্নার পর তা আর থাকে না। মাছ ও নুডলসের সাথেও খাওয়া যায়। তাছাড়া কচি ঢেড়ঁস সিদ্ধ করে টমেটোর সাথে সালাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র: ঢেড়ঁস টমেটোর তরকারি	**চিত্র: ঢেড়ঁসের সাথে কিমা**	**চিত্র: ঢেড়ঁস ভাজি**	**চিত্র: ঢেড়ঁসের সালাদ**

বৈজ্ঞানিক নাম: ঢেড়ঁসের বৈজ্ঞানিক নাম *Abelmoschus esculentus.*

পুষ্টিমান: ঢেড়ঁসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'বি' ও 'সি' এবং এ ছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়োডিন, ভিটামিন এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ রয়েছে। ঢেড়ঁস নিয়মিত খেলে গলাফোলা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং এটা হজম শক্তি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। প্রতি ১০০ গ্রাম ঢেড়ঁসের খাদ্যাংশে আছে ৯০.১৭ গ্রাম পানি, ৩৩ কিলো ক্যালরি শক্তি, ২০০ গ্রাম প্রোটিন, ০.১৯ গ্রাম চর্বি, ৭.৪৫ গ্রাম শ্বেতসার, ১.৪৮ গ্রাম চিনি, ৩৬ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন 'এ', ০২ মিলিগ্রাম থায়ামিন, ০.০৬ মিলিগ্রাম রিবোফ্লাবিন, ১.০ মিলিগ্রাম নায়াসিন, ৮২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ০.৫৮ মিলিগ্রাম জিংক।

উৎপত্তি: দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকার কোন এক স্থানে ঢেড়ঁসের উৎপত্তি।

জলবায়ু ও মাটি: ঢেড়ঁসের জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন। শুষ্ক ও আঁদ্র উভয় অবস্থায় ঢেড়ঁস জন্মানো যায়। তাপমাত্রা ১৫° সে. এর নিচে গেলে বৃদ্ধির হার কমে যায়। দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি ঢেড়ঁস চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। জমি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাল হওয়া আবশ্যক।

উৎপাদন মৌসুম: খরিপ মৌসুম।

জাত পরিচিতি: ঢেড়ঁসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাতের মধ্যে রয়েছে যেমন- "বারি ঢেড়ঁস-১", "বারি ঢেড়ঁস-২", পুশা সাওয়ানি, পেন্টা গ্রীন, কাবুলি ডোয়ার্ফ, জাপানী প্যাসিফিক গ্রীন ইত্যাদি।

"বারি ঢেড়ঁস-১" এর বৈশিষ্ট্য:

১. কান্ড অনিয়মিতভাবে বাড়তে থাকে এবং প্রায় সব পত্রেই ফুল ও ফল ধরে।

২. গাছ ২.০-২.৫ মিটার লম্বা হয়।

৩. গাছ প্রতি ফলে সংখ্যা ২৫-৩০টি।

৪. বীজ বপনের ৪৫ দিনের মধ্যেই ফুল ফুটতে শুরু করে।

৫. ফল ৫ শিরা বিশিষ্ট, সবুজ এবং ১৪-১৮ সে.মি. লম্বা।

৬. ফুল ফোটার ৫-৬ দিনের মধ্যেই ফল সংগ্রহ করতে হয়।

৭. পরিপক্ক এবং শুষ্ক বীজে বাদামী রোমশ আবরণ আছে যা এ জাতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চিত্রঃ "বারি ঢেড়ঁস-১"

বীজ বপনে সময়: বাংলাদেশে সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ঢেঁড়সের বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ।

বীজ হার: ২০ গ্রাম/শতক। প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বপন করতে হবে।

বীজ শোধন: বীজ বাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং সুস্থ সতেজ চারা উৎপাদনের জন্য বীজ শোধন করা হয়। কেজি প্রতি ২ গ্রাম ভিটাভেক্স/ক্যাপটান জাতীয় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন: সাধারণত ঢেড়ঁসের বীজ জমিতে সরাসরি লাইন টেনে অথবা বেড তৈরি করে সারিতে বীজ বপন করতে হয়। চারা অবস্থায় ঢেড়ঁসে পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখো দেয়। উরচুঙ্গা (মোল ক্রিকেট) পোকা চারার গোড়া কেটে দেয়। এ জন্য কিছু অতিরিক্ত চারা পলিব্যাগে তৈরি করে রাখতে হবে। যাহাতে পরবর্তী গ্যাপ ফিলিং করা যায়।

৪.৩.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত উচু জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন: দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি: বৃষ্টির পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ্র থাকে এমন জমি ঢেড়ঁসের জন্য ভাল। ৫/৬ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। মাঠে সরাসরি বীজ বপনের জন্য ১ মিটার প্রস্থ বেড তৈরি করতে হবে। পাশাপশি দুটি বেডের মাঝখানে ৩০ সে.মি. প্রস্থ নালা রাখতে হবে। বেড সাধারণত ১৫-২০ সে.মি. উঁচু হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সে.মি,।

চিত্রঃ ঢেড়ঁস চাষে জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: নিম্নে ঢেঁড়স চাষে শতাংশ প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ দেখানো হলঃ

সারের নাম	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	উপরি প্রয়োগ		
			১ম কিস্তি (চারা রোপণের ৩০ দিন পর)	২য় কিস্তি (চারা রোপণের ৫০ দিন পর)	৩য় কিস্তি (চারা রোপণের ৮০ দিন পর)
গোবর	৫৭ কেজি	সবটুকু	-	-	-
ইউরিয়া	৬০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম
টিএসপি	৪০ গ্রাম	সবটুকু	-	-	-
এমওপি	৬০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম

৪.৩.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

আগাম ফসলের জন্য বীজ ঘন করে বপন করতে হয়। সঠিক সময়ে ১ মিটার প্রস্থ বেডে ৬০ মে.মি.×৪০ সে.মি. দূরত্বে দু'সারিতে বীজ বপন করতে হয়। বীজ সাধারণত ২-৩ সে.মি.গভীরে বপন করতে হয়। এক সাথে ২টি বীজ বপন করা ভাল। বীজ বপন করার পূর্বে ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদগম ভালো হয়। বীজ বপনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সেচ আবশ্যক। চারা গজানোর ৭ দিন পর সুস্থ সবল একটি গাছ যথাস্থানে রেখে অতিরিক্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে।

৪.৩.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলা: ঢেঁড়সের বীজের অঙ্কুরোদগম অনিয়মিত। বীজ বপন করার সময় প্রতি গর্তে দুইটা বীজ দিতে হবে। দুটি বীজ যদি গজায় তবে ৪-৫ পাতা অবস্থায় সুস্থ সবল চারা রেখে অন্যটি তুলে ফেলতে হবে।

আগাছা দমন ও নিড়ানী: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিস্কার ও মাটির উপরিভাগ আলগা করে দিতে হবে।

সেচ ও পানি নিকাশ: শুষ্ক আবহাওয়ায় মাটির প্রকারভেদ অনুযায়ী ১০-১২ দিন পর পর সেচ প্রয়োজন। প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে। বর্ষাকালে গাছের বৃদ্ধি ও পানি নিকাশের সুবিধার জন্য ২৫-৩০ সে.মি. উঁচু করে বেড তৈরি করতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: বাকী অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান তিন কিস্তিতে বীজ বপনের ৩০, ৫০ ও ৮০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

ক) পোকামাকড়

১) ঢেঁড়সে ফল ছিদ্রকারী পোকা: ঢেঁড়সে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে এই পোকা।

লক্ষণ: ডিম থেকে বাদামি রঙের কীড়া বের হয়ে ডগা বা কচি ফলে আক্রমণ করে। কীড়া ডগা ছিদ্র করে ভেতরে ঢুকে ভেতরের নরম অংশ কুরে কুরে খায়। আক্রান্ত ডগা নেতিয়ে পড়ে ও শুকিয়ে যায় ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

২. ক্ষেত পরিষ্কার রাখতে হবে।

৩. জৈব বালাইনাশক নিমবিসিডিন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৪. সিমবুশ/সিমফিল/রিপকর্ড ১ মিলি প্রতি লিটার পানির সথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

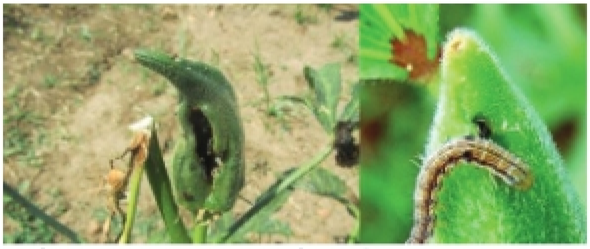

চিত্র: ঢেড়ঁসে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ

২) কাটুই পোকা/ উরচুঙ্গা (Mole cricket)

লক্ষণ: এ পোকা গাছের কান্ড বা গোড়া কেটে দিয়ে ক্ষতি সাধন করে। বিশেষ করে চারা গাছের বেশি ক্ষতি করে।

চিত্র: কাটুই পোকার আক্রমণ

চিত্র: কাটুই পোকা/ উরচুঙ্গা

দমন ব্যাবস্থাপনা

১. প্রতিদিন ভোর বেলা খুঁজে খুঁজে কর্তিত কান্ডের গোড়ার মাটি খুঁড়ে পোকা ধরে মেরে ফেরতে হবে।

২. ডার্সবান বা সারফস ২০ ইসি ৫ মিলি কীটনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে।

খ) রোগবালাই:

১) হলুদ শিরা বা মোজাইক ভাইরাস রোগ: এই রোগটি ঢেড়ঁসের অন্যতম প্রধান শত্রু।

লক্ষণঃ ভাইরাস জনিত কারণে পাতা হলদে হয়ে কুচকে যায়। আক্রান্ত ফল ও হলুদ রং ধারণ করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

২. আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ফেলা এবং নির্দিষ্ট একটি গর্তে আক্রান্ত গাছ মাটিচাপা দেওয়া বা পুড়িয়ে ফেলা।

৩. পারফেকথিয়ন ৪০ ইসি বা মেটাসিস্টক্স ২৫ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর স্প্রে করলে হোয়াইট ফ্লাই পোকার (বাহক পোকা) আক্রমণ কমে এবং এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম পরিলক্ষিত হয়।

৪. "বারি ঢেড়ঁস-১" জাতটি হলুদ শিরা ভাইরাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। তাই এই জাত ব্যবহার করা যেতে পারে।

চিত্র: হলুদ শিরা বা মোজাইক ভাইরাস রোগ

৪.৩.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফলের পরিপক্কতার নির্ধারণ: ফল ধারণের ৭-৮ দিন পর সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফলের বয়স ১০ দিনের বেশি হওয়া যাবে না। ১০ দিনের বেশি হলে ফল আঁশময় ও পুষ্টিমানের দিক দিয়ে নিকৃষ্ট হয়ে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়।

ফসল সংগ্রহ: যত বেশি ফল সংগ্রহ করা যায় তত বেশি ফলন দেয়। ফুল ফোটার ৫/৬ দিন পর থেকেই ফল সংগ্রহ করা যায়। প্রতি একদিন অন্তর ফসল সংগ্রহ করতে হয়।

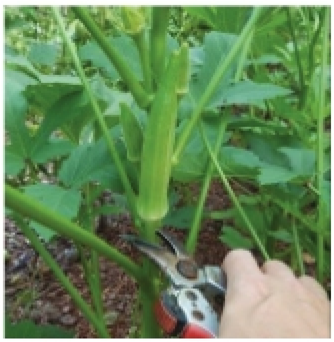

চিত্র: ফসল সংগ্রহ

বাজারজাতকরণ: সংগ্রহ করার পর দ্রুত বাজারজাতকরণ করতে হয়।

ফলন: প্রতি শতকে ফলন ৬০ থেকে ৬৫ কেজি।

পাঠ সংক্ষেপ

১. শিম একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ সবজি।

২. কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন(BADC) কতৃক উদ্ভাবিত বরবটির "কেগরনাটকী' জাতটি এদেশে ভিষণ জনপ্রিয়।

৩. বাউনিতে বরবটির লতা যত মুক্তভাবে বাইতে পারবে ফলনও তত বেশি হবে।

৪. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত "বারি ঢেড়ঁস -১" জাতটি ঢেড়ঁসের হলুদ শিরা রোগ প্রতিরোধী উচ্চ ফলনশীল জাত হিসাবে পরিচিত।

৫. তাপ ও দিবস নিরপেক্ষ জাত হলে বছরের যে কোন সময় শিমের বীজ বপন/ রোপণ করলে ফুল-ফল ধারণ করবে।

৬. বরবটি ক্ষেতে প্রচুর রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয়।

৭. উষ্ণ ও আদ্র আবহাওয়ায় বরবটি ভালো জন্মে।
৮. ঢেড়ঁসের ফল ধারণের ৭-৮ দিন পর সংগ্রহের উপযোগী হয়।
৯. ঢেড়ঁসের বীজের অঙ্কুরোদগম অনিয়মিত।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তোমরা শিম, বরবটি ও ঢেড়ঁশ চাষে বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড় ও রোগবালাই সম্পর্কে জেনেছো। নিম্নোক্ত ছকে কয়েকটি পোকা/রোগের আক্রান্ত ছবির নমুনা দেওয়া হয়েছে। তুমি ছবি দেখে পোকা/রোগ সনাক্ত করে ফসলের নাম ও দমনের উপায় লিখ।

ক্র/নং	ফসলের নাম	পোকা/রোগের নাম	ছবি দেখে উত্তর লিখ	দমনের উপায়
০১)				
০২)				
০৩)				
০৪)			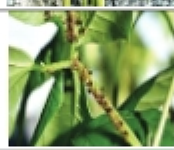	
০৫)				
০৬)				

অনুসন্ধানমুলক প্রশ্ন

ইতিমধ্যে তুমি বরবটি চাষে বিভিন্ন প্রকার সার সম্পর্কে জেনেছো। তুমি তোমার বসতবাড়ীর পাশে ১ শতক জমিতে বরবটি চাষ করার পরিকল্পনা করেছো। তাই উক্ত জমিতে তুমি সফলভাবে বরবটি চাষ করতে বিভিন্ন জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ এবং আন্ত:পরিচর্যা করবে সেই সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ শিমের ২টি জাতের নাম লিখ।
১. কখন শিম চাষের উপযুক্ত সময়?
২. কত তাপমাত্রায় শিমের ফলন কমে যায়?
৩. শিমের কোন জাতটি সারা বছর চাষ করা যায়?
৪. শিম গাছ কত দিন ধরে ফল দেয়?
৫. ৩টি বরবটির জাতের নাম লিখ।
৬. কত তাপমাত্রায় বরবটি ভাল হয়?
৭. বরবটি ফসলে কোন সার কম দিতে হয়?
৮. বীজ বপনের কত দিন পর ফসল তোলা হয়?
৯. জাত ভেদে কি কি রংগের বরবটি দেখা যায়?
১০. ঢেড়ঁসের ২টি জাতের নাম লিখ।
১১. কখন ঢেড়ঁস চাষের উপযুক্ত সময়?
১২. কত তাপমাত্রায় ঢেড়ঁসের ফলন কমে যায়?
১৩. ঢেড়ঁসের কোন জাতটি হলুদ শিরা প্রতিরোধী?
১৪. কোন পোকা ঢেড়ঁসের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে?
১৫. ঢেড়ঁসের বয়স ১০ দিনের বেশি হলে কি হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১) শিম কোন ধরনের আবহাওয়ার এবং কী ধরনের মাটিতে ভালো হয়?
২) আধুনিক উচ্চফলনশীল জাতের শিমের নাম লিখ।
৩) "বারি ঢেড়ঁস-১" জাতের বৈশিষ্ট্য লিখ।
৪) শিমের জাব পোকা দমনের উপায় কী?
৫) বরবটির জন্য প্রয়োজনীয় জলবায়ু ও মাটির বিবরণ দাও।
৬) বরবটির চাষে কোন জাতীয় সারের প্রয়োজন।
৭) বরবটি ফসলের পরিপক্কতার লক্ষণ কী?
৮) বরবটির জন্য বাউনী দেওয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ?
৯) ঢেড়ঁসে কোন ধরনের আবহাওয়ার এবং কি ধরণের মাটিতে ভালো হয়?

১০) ঢেড়ঁসের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১১) পিপিই বলতে কি বুঝায়?

১২) শিমের ফল ছিদ্রকারী পোকা কী ক্ষতি করে?

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১ শিমের বেড তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা কর।

২ শিমের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন পদ্ধতি আলোচনা কর।

৩ বরবটি চাষের মাদা তৈরি ও বেড তৈরি এবং সার প্রয়োগ পদ্ধতির বিবরণ দাও।

৪ বরবটি পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন পদ্ধতি আলোচনা কর।

৫ বরবটির ক্ষেতের বাউনি দেওয়ার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৬ ঢেড়ঁসের বেড তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি বিবরণ দাও।

৭ ঢেড়ঁসের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন পদ্ধতি আলোচনা কর।

জব ৪.১: শিম ফসলের চাষাবাদ করার দক্ষতা অর্জন।

শিখনফল

- জমি নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে পারবে।
- বেড তৈরি, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে পারবে।
- সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ ও চারার পরিচর্যা করতে পারবে।
- সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে সবজি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের জমি প্রস্তুত করা;

২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নর্ধািরণ ও সংগ্রহ করা;

৩. বালাইনাশক স্প্রে করার র্পূবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;

৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;

৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;

৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	এপ্রোন	প্রয়োজনমত	১টি
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাবস	স্ট্যান্ডার্ড	১ জোড়া
৫	গামবুট	প্রয়োজনমত	১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

শিম চাষের জন্য বাড়ির আশেপাশে উঁচু বন্যামুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। জমি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভাল। পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমি আলো-বাতাস ও রৌদ্রযুক্ত হওয়া দরকার। উর্বর দো-আঁশ মাটি উত্তম। বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও সবজি ভালো হয়। পর্যাপ্ত জৈব সার ও অনুমোদিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। মাটির পিএইচ ৬-৭ বেশি উপযোগী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি ২। বীজ বা চারা ৩। কোদাল ৪। লাঙ্গল ৫। মই ৬। নিড়ানী ৭। আঁচড়া ৮। খুটি ৯। রশি ১০। টেপ ১১। বাঁশে চটা ১২। জৈব ও রাসায়নিক সার ১৩। নিক্তি ১৪। ঝুড়ি বা প্লাস্টিকের বাটি ১৫। খন্তা ১৬। টুকরি ১৭। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

১) আলো ও বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

২) জুলাই-আগষ্ট মাসের মধ্যে বপন সময় নির্ধারণ করে জাত নির্বাচন ও শতক প্রতি ৩০-৪০ গ্রাম (চারা রোপণের ক্ষেত্রে) বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

৩) জমির পাশে উচু স্থানে ৩ মি.×১ মি. আকারের বীজতলা তৈরি করে বীজতলায় চারা উৎপাদন ও পরিচর্যা করতে হবে। চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে মূল জমিতে চারা রোপন করতে হবে।

৪) মূল জমিতে প্রতি শতকে ৪০ কেজি জৈব সার, ১.৫০ কেজি টিএসপি সার, ১.০০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করে জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

৫) শিম পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। চারার গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুরূপ মাটি শুকিয়ে গেলে সেচের দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬) বৃষ্টিজনিত বা সেচজনিত কারণে মাটিতে চটা হলে সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে। বেড়ে আগাছা হলে সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে উঠিয়ে দিতে হবে।

৭) প্রতি শতক জমিতে নিম্নোক্তভাবে ইউরিয়া ও পটাশ সারের উপরিপ্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	মাদায় উপরিপ্রয়োগ (বপন/রোপণের ৩০ দিন পর)
ইউরিয়া	৫০ গ্রাম
এমওপি	১২৫ গ্রাম

৮) শিমের চারা পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জমি সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে, প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত অংশ কেটে মাটির গর্তে পুতে / আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং বিভিন্ন প্রকার ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনীয় বালাই দমনে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

৯) ফসল সংগ্রহের ১ সপ্তাহ পূর্বে সেচ বন্ধ করতে হবে।

১০) ফসল তোলার ১৫ দিন আগে থেকেই যে কোন ধরনের বালাইনাশক স্প্রে করা উচিত নয়।

১১) পরিপক্কতার লক্ষণ দেখে জাতভেদে বীজ বপনের ৯৫ থেকে ১৪৫ দিন পর শিম সংগ্রহ করতে পারবে।

১২) প্রতিটি কাজ ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখে শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর নিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১. সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে জমিতে সমানভাবে পড়ে।

২. সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা

সফলতার সাথে শিম চাষ করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ৯.২: বরবটি ফসলের চাষাবাদ করার দক্ষতা অর্জন।

শিখনফল

১. জমি নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে পারবে।

২. বেড তৈরি, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে পারবে।

৩. সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ ও চারার বাউনি তৈরী করতে পারবে।

৪. সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে সবজি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের জমি প্রস্তুত করা;

২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্ধারণ ও সংগ্রহ করা;

৩. বালাইনাশক স্প্রে করার পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;

৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;

৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;

৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	এপ্রোন	প্রয়োজনমত	১টি
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ জোড়া
৫	গামবুট	প্রয়োজনমত	১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

বরবটি চাষের জন্য বাড়ির আশেপাশে উঁচু বন্যামুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। জমি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভাল। পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমি আলো-বাতাস ও রৌদ্র যুক্ত হওয়া দরকার। উর্বর দো-আঁশ মাটি উত্তম। বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও সবজি ভালো হয়। পর্যাপ্ত জৈব সার ও অনুমোদিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। মাটির পিএইচ ৬-৭ বেশি উপযোগী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি ২। উন্নত জাতের বীজ বা চারা ৩। কোদাল ৪। লাঙ্গল ৫। মই ৬। নিড়ানী ৭। আঁচড়া ৮। খুটি ৯। রশি ১০। টেপ ১১। বাশের কঞ্চি ১২। জৈব ও রাসায়নিক সার ১৩। নিক্তি ১৪। ঝুড়ি বা প্লাস্টিকের বাটি ১৫। খন্তা ১৬। টুকরি ১৭। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

১) আলো ও বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

২) মার্চ- এপ্রিল মাস মধ্যে বপন সময় নির্ধারণ করে জাত নির্বাচন ও শতক প্রতি ৪০ গ্রাম (চারা রোপণের ক্ষেত্রে) বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

৩) জমির পাশে উচু স্থানে ৩ মি.× ১ মি. আকারের বীজতলা তৈরি করে বীজতলায় চারা উৎপাদন ও পরিচর্যা করতে হবে। চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে মূল জমিতে চারা রোপণ করতে হবে।

৪) মূল জমিতে প্রতি শতকে ৬০ কেজি জৈব সার, ৬০০ গ্রাম টিএসপি সার, জিপসাম ৪০০ গ্রাম, জিংক সালফেট ৫০ গ্রাম, বোরাক্স ৪০ গ্রাম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

৫) বরবটি পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। চারার গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুরূপ মাটি শুকিয়ে গেলে সেচের দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬) বৃষ্টিজনিত বা সেচজনিত কারণে মাটিতে চটা হলে সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে। বেড়ে আগাছা হলে সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে উঠিয়ে দিতে হবে।

৭) প্রতি শতক জমিতে নিম্নোক্তভাবে ইউরিয়া ও পটাশ সারের উপরিপ্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	মোট পরিমাণ	বপন/রোপণের ৪-৫ দিন পূর্বে মাদায় প্রয়োগ	বপনের ৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ
ইউরিয়া	২০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
এমওপি	৬০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম

৮) বরবটির চারা পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জমি সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে, প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত অংশ কেটে মাটির গর্তে পুতে/আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং বিভিন্ন প্রকার ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনীয় বালাই দমনে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

৯) ফসল সংগ্রহের ১ সপ্তাহ পূর্বে সেচ বন্ধ করতে হবে।

২০১৪

১০) ফসল তোলার ১৫ দিন আগে থেকেই যে কোন ধরনের বালাইনাশক স্প্রে করা উচিত নয়।

১১) পরিপক্কতার লক্ষণ দেখে জাতভেদে বীজ বপনের ৪০ থেকে ৪৫ দিন পর বরবটি সংগ্রহ শুরু করতে পারবে।

১২) প্রতিটি কাজ ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখে শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর নিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১) সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে জমিতে সমানভাবে পড়ে।

২) সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা

সফলতার সাথে বরবটি চাষ করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মাশরুম চাষ

(Mushroom Cultivation)

আমরা দেশের গ্রামাঞ্চলে বাড়ির আনাচে-কানাচে ছায়াযুক্ত স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ছাতার আকৃতির সাদা রংয়ের এক ধরনের ছত্রাক জন্মাতে দেখি। একে আমরা ব্যাঙের ছাতা বলে অভিহিত করে থাকি। এক সময় মাশরুমকে ব্যাঙের ছাতা বলে কত হাসাহাসিই না করেছি। সেই মাশরুম আজ বাংলাদেশের একটি অর্থকরী সবজি। বর্তমানে দেশে প্রায় ৪০-৪২ হাজার মে.টন মাশরুম উৎপাদন হচ্ছে যার অধিকাংশই ওয়েস্টার মাশরুম। মাশরুম ব্যাঙের ছাতার মতো এক ধরণের ছত্রাক জাতীয় নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদ। মাশরুম ও ব্যাঙের ছাতা দেখতে একই রকম হলেও এদের মাঝে অনেক পার্থক্য। একইরূপ দেখতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের মাধ্যমে যে ছত্রাক উৎপাদিত হয়, তা হলো মাশরুম যা অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং বর্তমান বিশ্বে সবজি হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। যে কোন সবজির চেয়ে এর খাদ্যগুণ অনেক বেশি। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন আছে। মাশরুমের চাষ এবং এর ব্যবহার আমাদের দেশে এখনও তেমন প্রসার ঘটেনি। চলো আমরা মাশরুমের গুণাগুণ ও উপকারিতা, চাষ পদ্ধতি, ব্যবহার ইত্যাদি জেনে নেই এবং চেষ্টা করি মাশরুমকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে নিতে।

এই অধ্যায় শেষে-

- বিভিন্ন মাশরুমের পরিচিতি এবং ব্যবহার বর্ননা করতে পারবে
- মাশরুমের পুষ্টি ও ঔষধিগুণ ব্যাখ্যা করতে পারবে
- মাশরুম চাষের উপযোগী ঘর ও তাক তৈরি করতে পারবে
- মাশরুমের স্পন প্যাকেট (বীজ) সংগ্রহ, কর্তন ও স্থাপন করতে পারবে
- অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে পারবে
- রোগবালাই দমন ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে

৫ মাশরুম চাষ

৫.১ মাশরুম পরিচিতি

ছত্রাক এর বেশ কিছু প্রজাতি রয়েছে। যার মধ্যে কিছু প্রজাতির ছত্রাক খাদ্য হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। এমন ছত্রাক এর নামই হচ্ছে মাশরুম। ভলভেরিলা *(volvariella)*,প্লিওরেটাস *(pleurotus)*, এগারিকাস *(Agaricus)* ইত্যাদি মাশরুম খাদ্য হিসেবে খাওয়া হয়। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ মুখরোচক খাবার হিসেবে মাশরুম গ্রহণ করে আসছে এবং র্বতমান বিশ্বে সব দেশের মানুষই মাশরুম খেয়ে থাকেন। লক্ষ্যনীয়, উন্নত দেশগুলোর মানুষই বেশি পরিমাণে মাশরুম খেয়ে থাকেন। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে অত্যন্ত মর্যাদাপুর্ণ খাবার হিসেবে মাশরুমের কথা উল্লেখ আছে। স্বাদ, পুষ্টি, ও ঔষধিগুণের কারণে ইতোমধ্যেই এটি সারা দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাশরুম চাষ হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা মাশরুম চাষ করছেন। কিছু ক্ষেত্রে গৃহিনীরাও চাষ করছেন। অর্থাৎ আমাদের দেশে ঘরোয়া এবং বানিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষ করা হচ্ছে।

৫ .১.১ মাশরুম কী?

মাশরুম হলো খাবার উপযোগী মৃতজীবি ছত্রাকের ফলন্ত অংগ যা অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও ঔষধিগুণসম্পন্ন। বর্তমান ছত্রাকবিদরা বিশ্বে প্রায় ২ লক্ষাধিক প্রজাতির ছত্রাক চিহ্নিত করেছেন। এ অসংখ্য ছত্রাকের মধ্য থেকে দীর্ঘ যাচাই ও বাছাই করে যে সমস্ত ছত্রাক সম্পূর্ণ খাওয়ার উপযোগী, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু সে সমস্ত ছত্রাকসমূহকে তাঁরা মাশরুম হিসেবে গণ্য করেছেন । অন্যদিকে প্রাকৃতিক ভাবে যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা ছত্রাক হল ব্যাঙের ছাতা যা সাধারণত খাওয়ার উপযোগী নয় বরং বিষাক্ত।

চিত্র: ব্যাঙের ছাতা

চিত্র: মাশরুম

মাশরুমের সাধারণ গঠন : মাশরুমের দেহ দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত

১। অঙ্গজ মাইসেলিয়াম

২। ফ্রুটিংবডি।

মাশরুমের ফ্রুটিংবডি প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত। যথা- ১) টুপি (Cap) বা পিলিয়াস (Pileus): পরিণত মাশরুমের ডাঁটার ওপর যে অংশ ছাতার মতো দেখায় তাকে মাশরুমের টুপি বা পিলিয়াস বলে। সাধারণত এই অংশটি মাংসল (Fleshy) এবং মাশরুমের প্রধান ভোজ্য অংশরূপে ব্যবহার হয়।

২) স্টাইপ (Stipe) বা ডাঁটা (Stalk): একটি সাধারণ মাশরুমে স্টাইপ বা ডাঁটা সাধারণত দন্ডাকৃতি হয়। সাধারণভাবে ডাঁটার নিচের অংশ টুপির সংযোগস্থল থেকে ক্রমশ সরু হয়। কিন্তু বিভিন্ন মাশরুমের ডাঁটা বিভিন্ন আকৃতির হয়।

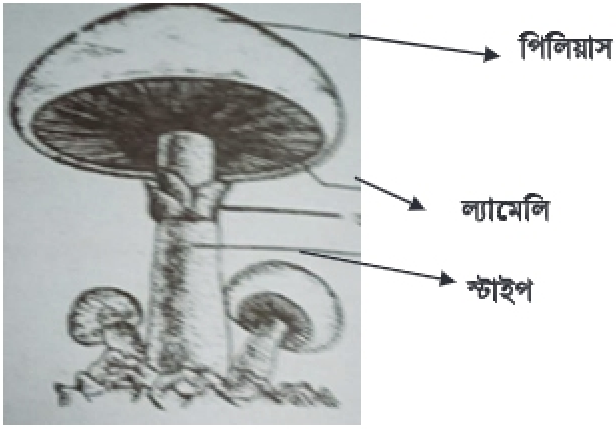

মাশরুমের সাধারণ গঠন

৫.১.২ বিভিন্ন ধরণের মাশরুমের পরিচিতি ও ব্যবহার

বাংলাদেশে চাষকৃত মাশরুম: বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে বানিজ্যিকভাবে ০৭ ধরণের মাশরুম চাষ হচ্ছে। মাশরুম গুলো হলো-

ক) ওয়েস্টার মাশরুম: সারা বছর চাষযোগ্য মাশরুম। অনেক পুষ্টি ও ঔষধিগুণসম্পন্ন । চাষ পদ্ধতি সহজ ও বসতবাড়িতে উৎপাদন করা যায়। দেশের বাজারে চাহিদা অনেক। ব্যাপক চাষ বৃদ্ধির সুযোগ আছে।

খ) ঋষি মাশরুম: গরমকালে চাষযোগ্য ঔষধি মাশরুম। সম্প্রতি এর উৎপাদন ও ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ) মিল্কি মাশরুম: গরমকালে চাষযোগ্য সবজি মাশরুম। অতি গরমেও চাষ করা যায়। সংরক্ষণকাল ও বাজার মূল্য বেশি।

ঘ) বাটন মাশরুম: বাটন বিশ্বের নামকরা মাশরুম। এ মাশরুম চাষের জন্য নিম্ন তাপমাত্রা এবং একই সাথে উচ্চ আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে শীতকালে আংশিক নিয়ন্ত্রিত (Semi control) পরিবেশে এ মাশরুম চাষ করা যায়। তবে, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত (Total control) পরিবেশে সারা বছর চাষ করা যায়। চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোতে বাটন মাশরুম বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঙ) শীতাকে মাশরুম: শীতকালে চাষযোগ্য উচ্চ ঔষধিগুণসম্পন্ন সবজি মাশরুম। শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। বিশ্বে শুকনো শীতাকে মাশরুমের চাহিদা ভাল। বাংলাদেশের বাজারে তাজা শীতাকের চাহিদা অনেক।

চ) স্ট্র মাশরুম: গরম কালে চাষযোগ্য উত্তম স্বাদের মাশরুম। খুবই অল্প সময়ে এ মাশরুম বসত বড়িতে উৎপাদন করা যায়। সংরক্ষণকাল কম।

ছ) কান মাশরুম: সারা বছর চাষযোগ্য উচ্চ ঔষধিগুণসম্পন্ন সজি মাশরুম। পাহাড়ী এলাকায় চাহিদা ভাল।

ওয়েস্টার মাশরুম

মিল্কি মাশরুম

ঋষি মাশরুম

স্ট্র মাশরুম

কান মাশরুম

বাটন মাশরুম

শীতাকে মাশরুম

চিত্র: বিভিন্ন ধরনের মাশরুম

৫.১.৩ মাশরুমের পুষ্টি ও ঔষধিগুণ

পুষ্টি বিচারে মাশরুম নিঃসন্দেহে সবার সেরা। কারণ আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকার অতি প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন- প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলস পরিমাণ খুব বেশি । অন্যদিকে যেসব খাদ্য উপাদানের আধিক্য আমাদেরকে জটিল মরণব্যধির দিকে নিয়ে যায়, যেমন - ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট তা মাশরুমে নেই বললেই চলে। মাশরুমের প্রোটিন হল অত্যন্ত উন্নত, এবং উঁচুমানের কারণ মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় ৯টি এমাইনো এসিডের সবগুলোই মাশরুমে আছে। প্রাণীজ আমিষ যেমন- মাংস ও ডিমের আমিষ উন্নত ও সর্ম্পূণ হলেও তার সঙ্গে কোলস্টেরেল সমস্যা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে মাশরুমে চর্বি ও কার্বোহাইড্রেটের নিম্ন উপস্থিতি এবং কোলস্টেরল ভাঙ্গার উপাদান থাকায় শরীরে কোলস্টেরল জমার ভয় থাকে না। এ কারণে প্রোটিনের অন্যান্য সব উৎসের তুলনায় মাশরুমের প্রোটিন উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ । মাশরুমে ভিটামিন বি-১২ আছে প্রচুর পরিমাণে যা অন্য কোন উদ্ভিজ্জ উৎসে নেই।

বিভিন্ন মাশরুমের পুষ্টি মূল্য (প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনা মাশরুম)

মাশরুমের নাম	প্রোটিন (গ্রাম)	কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম)	ফ্যাট (গ্রাম)	ফাইবার (গ্রাম)	শক্তি (কিলো ক্যালরি)
ওয়েস্টার	৩০.৪০	৫৭.৬০	২.২০	৮.৭০	২৬৫
মিল্কি	১৭.৬৯	৬৪.২৬	৪.১০	৩.৪০	৩৯১
স্ট্র	৩৭.৫০	৫৪.৮০	২.৬০	৫.৫০	৩০৫
কান	৪.২০	৮২.৮০	৮.৩০	১৯.৮০	৩৫১

শীতাকে	৩২.৯৩	৪৭.৬০	৩.৭৩	২৮.৮০	৩৮৭
বাটন	৩৩.৪৮	৪৬.১৭	৩.১০	২০.৯০	৪৯৯

(উৎস: মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট)

মাশরুম স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী – নিয়মিত খেলে মাশরুম ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রন করে; ক্যান্সার, জন্ডিস ইত্যাদি প্রতিরোধ করে; হৃদরোগ, টিউমার, যৌন অক্ষমতা, রক্তস্বল্পতা ও মেদভুরি ইত্যাদি প্রতিরোধ ও নিরাময় করে; হাড় ও দাঁত শক্ত করে এবং চুল পাকা ও চুল পড়া রোধ করে। এছাড়া-

১। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে: মাশরুমে উচ্চমাত্রার আঁশ থাকে, সোডিয়ামের পরিমাণ কম থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম থাকে যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এছাড়া মাশরুমে কোলেস্টেরল কমানোর বিশেষ উপাদান এবং ভিটামিন বি, সি ও ডি থাকায় নিয়মিত মাশরুম খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ নিরাময় হয়।

২। ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে: মাশরুমের ফাইবার বা আঁশ পাকস্থলি দীর্ঘক্ষণ ভরা রাখতে সাহায্য করে। মাশরুম রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ওজন কমাতে সহায়তা করে।

৩। ত্বক সুস্থ রাখে: মাশরুমে নিয়াসিন ও রিবোফ্লাবিন থাকে যা ত্বকের জন্য উপকারী। ৮০-৯০ ভাগ পানি থাকে যা ত্বককে নরম ও কোমল রাখে।

৪। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হলো আমাদের শরীরের সুস্থ্যতা ও যৌবন ধরে রাখার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। মাশরুমে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এই অত্যাবশ্যকীয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো মারাত্মক কিছু রোগ, যেমন- স্ট্রোক, স্নায়ুতন্ত্রের রোগ এবং ক্যান্সার থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

৫। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে: এটি মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শীতাকে মাশরুম দৈনন্দিন কিছু অসুখ যেমন- কফ ও ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে।

৬। ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে: ক্যান্সার ও টিউমার প্রতিরোধে মাশরুম বেশ উপকারী।

৭। স্নায়ুতন্ত্র: মাশরুমের ভিটামিন বি স্নায়ুর জন্য উপকারী এবং বয়সজনিত রোগ যেমন- আলঝেইমার্স রোগ থেকে রক্ষা করে।

৮। ডায়াবেটিস: মাশরুম গ্রহণ করলে রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। মাশরুমে এনজাইম ও প্রাকৃতিক ইনসুলিন থাকে যা চিনিকে ভেঙ্গে হজম করে।

৯। পরিপাক: এতে থাকা ফাইবার ও এনজাইম হজমে সহায়তা করে। এটি অন্ত্রে উপকারি ব্যাকটেরিয়ার কাজ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং কোলন এর পুষ্টি উপাদান শোষণকেও বাড়তে সাহায্য করে।

১০। হাড় ও দাঁত মজবুত করে: মাশরুমের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-ডি আছে। শিশুদের দাঁত ও হাড় গঠনে এই উপাদানগুলো অত্যন্ত কার্যকরী।

১১। মাশরুম কিডনি রোগ ও এলার্জি রোগের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে

১২। মাশরুম খেলে হাইপার টেনশন দূর হয় এবং মেরুদন্ড দৃঢ় থাকে।

১৩। হেপাটাইটিস বি ও জন্ডিস প্রতিরোধ করে। অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

১৪। মাশরুমের খনিজ লবণ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক।

৫.১.৪ মাশরুমের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে জমির অপ্রতুলতা, ব্যাপক বেকারত্ব, নিদারুন পুষ্টিহীনতা, মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান, সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় মাশরুম একটি সম্ভাবনাময় ফসল। মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরুপ-

ক) মাশরুম একটি পুষ্টিকর (উন্নত মানের আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ), সুস্বাদু ও ঔষধিগুণসম্পন্ন সবজি।

খ) মাশরুম চাষের জন্য উর্বর জমির প্রয়োজন হয়না এবং অল্প জায়গায় অধিক পরিমাণ মাশরুম উৎপাদন করা যায়।

গ) মাশরুম চাষের জন্য বালাইনাশক এমনকি রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয়না। ফলে, মাশরুম চাষ ভূমি ও বায়ুর উপরে কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না, বরং মাশরুম চাষের পর পরিত্যক্ত স্পন প্যাকেট মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

ঘ) স্বল্প পুঁজিতে মাশরুম চাষ শুরু করা যায়। তাই হত দরিদ্র ভূমিহীন মানুষও মাশরুম চাষ করতে পারেন।

ঙ) মানুষের র্কমসংস্থান/ আত্মকর্মসংস্থান বিশেষ করে বেকার, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের র্কমসংস্থানের সুযোগ করা সম্ভব।

চ) বিশ্বব্যাপী মাশরুমের ব্যপক চাহিদা আছে।

ছ) বাংলাদেশে যে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বিরাজ করে তাতে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেই সারা বছর মাশরুম চাষ করা সম্ভব।

জ) উৎপাদন মাধ্যমের পর্যাপ্ততা রয়েছে যেমন- খড়, আখের ছোবড়া ও কাঠের গুড়া। এগুলো দিয়ে বিপুল পরিমাণ মাশরুম উৎপাদন সম্ভব।

ঝ) মাশরুম চাষে অল্প দিনেই ফলন পাওয়া যায় এবং লাভসহ পুঁজি ঘরে আসে। তাই, দারিদ্র্য দূরীকরণে মাশরুম গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঞ) মাশরুম ঘরে চাষ করা হয় বিধায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাশরুমের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

৫.১.৫ মাশরুম চাষের সুবিধা ও অসুবিধা

৫.১.৫.১ সুবিধা (Advantages)

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু মাশরুম চাষের অত্যন্ত উপযোগী। সে সাথে চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণও (যেমন- খড়, কাঠের গুড়া, আখের ছোবড়াসহ বিভিন্ন কৃষিজ ও শিল্পজ বর্জ্য) অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য।

(১) মাশরুম চাষে আবাদী জমি দরকার হয় না

(২) ঘরের মধ্যে চাষ করা যায়

(৩) তাকে তাকে সাজিয়ে একটি ঘরকে কয়েকটি ঘরের সমান ব্যবহার করা যায়

(৪) অত্যন্ত অল্প সময়ে অর্থাৎ মাত্র ৭-১০ দিনের মধ্যে বীজ বা স্পন থেকে মাশরুম পাওয়া যায় যা বিশ্বের অন্য কোন ফসলের বেলায় প্রযোজ্য নয়

মাশরুম চাষে অর্থনৈতিক সুবিধা

মাশরুম চাষ একটি সর্বোত্তম লাভজনক ব্যবসা। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে কোন ব্যবসা সর্বাধিক লাভজনক তখনই ধরা যাবে যখন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো সর্বোচ্চ অনুকূল অবস্থা থাকবে। যেমন-

(১) কম পুঁজির দরকার হবে।

(২) বিনিয়োগকৃত অর্থ অল্প সময়ের মধ্যে তুলে আনা সম্ভব হবে এবং

(৩) অল্প শ্রমের মাধ্যমে তা সম্ভব হবে।

অপরদিকে বিনিয়োগের বিপরীতে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে:

(১) যদি একক প্রতি ফলন অধিক হয়

(২) বাজার মূল্য অধিক হয়

(৩) একক প্রতি লাভ অধিক হয়, তবে তা সর্বোত্তম ব্যবসা বটে

কেবল মাশরুমের ক্ষেত্রেই উপরোক্ত সবকটি বিষয় প্রযোজ্য। তাই মাশরুম ব্যবসা মানেই সর্বোত্তম লাভজনক ব্যবসা। এছাড়া অধিক উৎপাদনের মাধ্যমে বিদেশ থেকে মাশরুম আমদানী কমিয়ে দেশী মুদ্রা সাশ্রয় হবে। আরও অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হলে বিদেশে মাশরুম রপ্তানীর মাধ্যমে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা ঘরে এনে জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

মাশরুম চাষের সামাজিক সুবিধাসমূহ

মাশরুম চাষে যে সমস্ত সামাজিক সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলো হলো-

(১) মাশরুম চাষে, সংরক্ষণে, প্রক্রিয়াজাতকরণে ও বাজারজাতকরণে কর্মহীন লোকদের নিয়োজিত করে জনগণকে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

(২) প্রচলিত সামাজিকতার কারণে শিক্ষিত হবার পর যারা রোদে পুড়ে, মাঠে কাদা মাটির সাথে মিশে নিজেদেরকে প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত করতে অনীহা প্রকাশ করেন, সেসমস্ত বেকার ছেলেমেয়েদের জন্য মাশরুম চাষ একটি আশীর্বাদ।

২০১৪

(৩) মাশরুম এমন একটি সবজি যা চাষ করে মহিলারা আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সাথে সংগতি রেখে, সংসারের কাজকর্ম করেও অধিক উপার্জন করতে পারেন।

মাশরুম চাষে পরিবেশের সুবিধা

১। অধিকাংশ মাশরুমে রাসায়নিক সার বা কীটনাশক কোনটাই ব্যবহার করতে হয়না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ উপায়ে মাশরুম উৎপাদন করা হয়। তাই মাশরুম সর্বোচ্চ পরিবেশ এবং শরীরের বান্ধব।

২। মাশরুম চাষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ কৃষি, বনজ ওশিল্পের উপজাত যেগুলোর যত্রতত্র এবং অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত করে। সেগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে প্রক্রিয়াজাত করে সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। ফলে পরিবেশ অধিক দূষনমুক্ত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি জোর করে বলা যায় যে, মাশরুম চাষের মাধ্যমে এদেশের পুষ্টি উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা বেকারত্বদূরীকরণ (বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি), আমদানী বিষয় হ্রাস এবং রপ্তানী আয়বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ উন্নয়নের এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

৫.১.৫.২ অসুবিধা

(১) সম্ভাবনাময় এ ফসলটির চাষ সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায়গুলো হলো- আমাদের খাদ্যাভ্যাসে মাশরুম না থাকা;

(২) মাশরুমের মত দেখতে ব্যাঙের ছাতার সর্বত্র উপস্থিতি যা পঁচা, স্যাতস্যাতে জায়গায় জন্মায় বিধায় মানুষকে মাশরুম খাবার হিসেবে গ্রহণে অনাগ্রহী করে তোলে;

(৩) মাশরুম খাওয়া যাবে কি যাবে না, অর্থাৎ হালাল কি হারাম এ বিষয়ে দ্বিধা;

(৪) এদেশের প্রচলিত অন্যান্য ফসলের চাষ পদ্ধতির সাথে মাশরুম চাষ পদ্ধতির মিল না থাকা এবং মাশরুম চাষে উচ্চ মূল্যের যন্ত্রপাতি ও উচ্চ প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন প্রশিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন হওয়া। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের গবেষণায় এদেশে মাশরুম চাষের উপযোগী স্বল্প খরচের যন্ত্রপাতি ও সহজ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে, তবুও এসব যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক পরিচিতির অভাব রয়েছে।

৫.২ মাশরুম উৎপাদন পদ্ধতি

৫.২.১ বিভিন্ন ধরণের মাশরুমের চাষ ঘরের উপযোগিতা নির্ধারণ: বিভিন্ন ধরণের মাশরুম চাষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও আলো প্রয়োজন হয়। কোন জাতের মাশরুম চাষ করবে সে অনুযায়ী চাষঘরে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.২.১.১ মাশরুম চাষের প্রতিবেশ: মাশরুম চাষের জন্য মূলত ৫টি বিষয়ের উপরে নজর দিতে হবে। এ ৫টি বিষয়কে মাশরুম চাষের মূলনীতি হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

১। **অক্সিজেনের উপস্থিতি:** ছত্রাক মূলতঃ কাঠের গুড়াকে পচিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় খাদ্য খায়। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে মাশরুম বিভিন্ন এনজাইমের সহায়তায় জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়ায় কাঠের গুড়া ভেঙ্গে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান বের করে আনে, যা মাইসেলিয়াম খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। মাশরুম উৎপাদনের সময় প্রচুর

পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। অক্সিজেন না পেলে খাদ্য উৎপাদনের এ কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং মাশরুম উৎপাদন সম্ভব হয়না। তাই মাশরুম চাষ ঘরে অক্সিজেনের উপস্থিতি থাকা অতীব জরুরী।

২। কার্বনডাই-অক্সাইড বের করার ব্যবস্থা: মাশরুম খাদ্য তৈরিতে অক্সিজেন ব্যবহার করেও কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। মাশরুম চাষঘরে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান বেড়ে গেলে মাশরুমের উৎপাদন ব্যাহত হয়। এ কার্বন ডাই অক্সাইড ভারী বিধায় প্যাকেটের চারিপাশে স্তর তৈরি করে থাকে। ফলে প্যাকেটের চারিপাশে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। তাই অক্সিজেনের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার জন্য ঘর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বের করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আর এর জন্য ঘরের মধ্যে ভেন্টিলেশন অথবা ঘরের নিচের অংশ ফাঁকা অথবা একজস্ট ফ্যান লাগিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করার ব্যবস্থা করতে হবে।

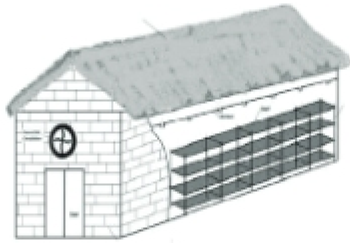

চিত্র:মাশরুম চাষঘর

চিত্র: চাষঘরে রাখা তাক/র‍্যাকে মাশরুম

৩। আলো:বিভিন্ন মাশরুম বিভিন্ন মাত্রার আলো পছন্দ করে। তাই মাশরুম চাষঘরে প্রয়োজনীয় মাত্রার আলোর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এ আলো মাশরুমের অঙ্কুর গজাতে সহায়তা করে। ওয়েষ্টার মাশরুম চাষের জন্য চাষঘর আবছা আলোযুক্ত হতে হবে, যেন একজন লোক খালি চোখে খবরের কাগজ পড়তে পারেন। মিল্কী মাশরুম চাষের জন্য চাষঘরে অনেক আলোর প্রয়োজন হয় । বাটন মাশরুম চাষের জন্য আলো না হলেও চলে।

৪। তাপমাত্রা: প্রত্যেকটি মাশরুম গজানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন। ওয়েস্টার মাশরুমের ফ্রুটিংবডি গজানোর জন্য তাপমাত্রার প্রয়োজন ২০-৩০° সেলসিয়াস। এর উর্ধ্বে অথবা নিম্নে মাশরুমের ফলন ও কোয়ালিটি দারুনভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। একই ভাবে অন্যান্য মাশরুম চাষের জন্য চাষঘরে প্রয়োজনীয়মাত্রার তাপমাত্রা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। আর্দ্রতা:মাশরুম আর্দ্র অবস্থা পছন্দ করে। প্রত্যেকটি মাশরুমের গজানোর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রার আপেক্ষিক আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। ওয়েস্টার মাশরুমের জন্য এই আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭০% -৮০%। সুতরাং চাষঘরে মাশরুম প্যাকেটের চারিপাশে উচ্চ মাত্রার আর্দ্রতা বজায় রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিচর্যার মাধ্যমে উপরোক্ত মাত্রার আর্দ্রতা সহজে বজায় রাখা যায় ।

৫.২.২ বীজ প্যাকেট সংগ্রহ: মাশরুম উৎপাদন করার জন্য স্পন বা বীজের প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বা বেসরকারীভাবে গড়ে ওঠা মাশরুম ফার্ম থেকে বীজ সংগ্রহ করে মাশরুম চাষ করা যাবে।

২০১৪

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে জাতের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন করা সম্ভব। সুতরাং এখানে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি তুলে ধরা হল।

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ উৎপাদন পদ্ধতি ফ্লো চার্ট

ওয়েস্টার মাশরুমের বাণিজ্যিক স্পন তৈরি: ওয়েস্টার মাশরুমের বাণিজ্যিক স্পনের কাঁচামাল হিসেবে কাঠের গুড়া, আখের ছোবড়া, ধানের খড়, গমের খড়, কচুরিপানা, সুপারির ছাল, জুট তুলা প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। কাঠের গুড়া দিয়ে অত্যন্ত সহজে স্পন তৈরি করা যায়। সবসময় ও সব পরিবেশে চাষ উপযোগী হওয়ায় নিম্নে কাঠের গুড়া দিয়ে বাণিজ্যিক স্পন তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো (৫০০ গ্রাম ওজনের ১০০ স্পন এর জন্য)

উপকরণ	পরিমাণ
কাঠের গুড়া	১৬.০ কেজি
গমের ভুষি	৮.০ কেজি
ধানের তুষ/কাটা খড়	১.০ কেজি
ক্যালসিয়াম কার্বনেট	১০০ গ্রাম
পানি	২৫ লিটার

এছাড়া আধা কেজির প্যাকেটের জন্য ৭X১০এবং ১ কেজির জন্য ১০X১২সাইজের পিপি ব্যাগ, প্লাস্টিক নেক, ব্রাউন পেপার, রাবার ব্যান্ড, কটন ও একটি কাঠের কাঠির প্রয়োজন হবে।

উল্লেখিত পরিমাণ কাঠের গুড়া, গমের ভুষি, ধানের তুষ, চুন ও পানি মিক্সার মেশিনে অথবা হাতে ভালভাবে মিশাতে হবে। পিপি ব্যাগে ৫০০ গ্রাম অথবা ১ কেজি করে মিশ্রণ ভরে তাপ সহনশীল নেক ও রাবার ব্যান্ড দিয়ে পিপি ব্যাগের মুখ বাধঁতে হবে। একটি শক্ত কাঠি দিয়ে মিশ্রণ ভরা প্যাকেটের মুখে গর্ত করে নিতে হবে। কটন বল দিয়ে প্যাকেটের মুখ বন্ধ করে ব্রাউন পেপার দিয়ে ঢেকে তা রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। তারপর অটোক্লেভ মেশিনে ১২১° সেঃ তাপমাত্রায় ও ১.১-১.৫ কেজি/সি.মি.২ চাপে প্যাকেট গুলোকে ন্যূনতম ২ ঘন্টাকাল জীবাণুমুক্ত করতে হবে। অটোক্লভ এর পরিবর্তে ড্রামে ৪-৫ ঘন্টা রেখে জীবাণুমুক্ত করা যাবে। জীবাণুমুক্ত করার পর প্যাকেট ঠান্ডা হলে পূর্বে প্রস্তুতকৃত মাদার কালচার (প্রতি প্যাকেটে ১ চামচ পরিমাণ) দিয়ে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পরিবেশে ক্লিনবেঞ্চ / ইনুকুলেশন বক্সের ভিতরে ইনুকুলেশন করতে হবে। মাদার কালচার দেয়ার পর প্যাকেটগুলোকে ইনকিউবেশনের জন্য গ্রোথ চেম্বারে ২০-২৫°ডিগ্রী সেঃ

তাপমাত্রায় রাখতে হবে। গ্রোথ চেম্বারে প্যাকেটের ভেতর সাদা মাইসেলিয়াম বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং ১৮ থেকে ২৮দিনের মধ্যে প্যাকেট গুলো সম্পূর্ণ সাদা হয়ে যাবে। এই সাদা মাইসেলিয়াম পূর্ণ প্যাকেটকে বাণিজ্যিক স্পন বলে।

চিত্র:জীবানুমুক্তকরণ ও ইনকিউবেশন কক্ষ

৫.২.৩ ওয়েস্টার মাশরুমের বীজ প্যাকেট কর্তন ও স্থাপন

৫.২.৩.১ প্যাকেট কর্তন: চাষ ঘরে বসানোর পূর্বে স্পন প্যাকেট সঠিক নিয়মে কেটে চেছে পানিতে চুবিয়ে নেয়া প্রয়োজন। স্পন প্যাকেটের কোণাযুক্ত দুই কাঁধ বরাবর প্রতি কাঁধে ২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি নিচে ব্যাস করে উল্টা “D" আকারে পিপি কেটে ফেলতে হবে। উভয় পার্শ্বের এই কাটা জায়গা ব্লেড দিয়ে সাদা অংশ চেছে ফেলতে হবে। এই কাটা ও চাছা প্যাকেটকে ৫-১৫ মিনিট পানিতে উপুড় করে চুবিয়ে ভালভাবে পানি ঝরিয়ে সরাসরি চাষ ঘরের মেঝে অথবা তাকে সারি করে সাজিয়ে চাষ করতে হবে।

৫.২.৩.২ পরিচর্যা: চাষ ঘরের মেঝে অথবা তাকে/র‍্যাকে মাশরুম স্পন থেকে স্পন এবং সারি থেকে সারি ৫ সেমি পর পর সাজিয়ে দিলে মাশরুমের ফলন ভাল হয়। স্পন প্যাকেটের চারিপাশের আর্দ্রতা ৭০% - ৮০% রাখার জন্য গরমের দিনে ৪/৫ বার, শীতে ও বর্ষায় দিনে ২/৩ বার (প্রয়োজনে কমবেশী) পানি স্প্রে করতে হবে যেন প্যাকেট ও এর আশেপাশে ভেজা ভেজা ভাব থাকে কিন্তু পানি জমে না থাকে। স্প্রে করার সময় স্প্রেয়ারের নজল প্যাকেটের ১ ফুট উপরে রেখে পানি এমনভাবে স্প্রে করতে হবে যেন কাটা জায়গার অংকুরের উপর সরাসরি পানির ফোটার আঘাতে অংকুর ভেঙ্গে না যায়। তবে পানি ভোরে সূর্য ওঠার পূর্বে এবং সূর্য ডোবার পরে স্প্রে করলে ফলন বহগুন বেড়ে যায়।

চিত্র:মাশরুমে পানি স্প্রে

চিত্র: কাঠের গুড়ার স্পন প্যাকেটে মাশরুম

মাশরুম চাষের অন্যান্য পরিচর্যা হচ্ছে —

মাশরুম ঘরের চারপাশ সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে কারণ মাশরুম একটি স্পর্শকাতর সবজি।

ক) পরিচর্যা ঠিক হচ্ছে কিনা তা বোঝার উপায় হচ্ছে ২-৩ দিনের মধ্যে মাশরুমের অংকুর পিনের মত বের হবে। ৫-৭ দিনের মধ্যে মাশরুম তোলার উপযোগী হবে।

খ) যদি এক সাথে অনেকগুলো অংকুর আসে তবে সম আকারের মানসম্পন্ন মাশরুম পাওয়ার জন্য নিচের ছোট অংকুর গুলি ধারালো সারজিক্যাল ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলতে হবে এবং প্রতি পাশের থোকায় ৮ থেকে ১২টি ফ্রুটিং বডি (৫০০ গ্রাম প্যাকেটে) রাখতে হবে।

গ) প্রথমবার মাশরুম তোলার পর প্যাকেট ১ দিন বিশ্রাম অবস্থায় রাখতে হবে এবং পরের দিন পূর্বের কাটা অংশে পুনরায় চেছে ফেলে পূর্বের ন্যায় পানি স্প্রে করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে প্যাকেট যেন গর্ত না হয়।

ঘ) ২য় বার মাশরুম সংগ্রহ করা যাবে ১০ - ১৫ দিন পর ।

ঙ)একইভাবে ১ টি প্যাকেট থেকে ৫/৬ বার মাশরুম সংগ্রহ করা যায়, তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য ২/৩ বার সংগ্রহ করা উচিত। এতে একটি প্যাকেট থেকে নূন্যতম ২০০-২৫০ গ্রাম মাশরুম পাওয়া যাবে।

চ) মানসম্মত মাশরুম পাওয়ার জন্য এবং বেশী সময় স্বাভাবিক অবস্থায় মাশরুম সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহের পূর্বে অন্তত ১২-১৫ ঘন্টার মধ্যে মাশরুমের গায়ে সরাসরি পানি স্প্রে করা যাবে না।

ছ) ১টি প্যাকেট থেকে ৭৫ দিন থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত ভালোভাবে মাশরুম পাওয়া যায় (প্যাকেট যতদিন সাদা থাকে)।

জ)মাশরুম উৎপাদন শেষ হলে প্যাকেট চাষ ঘর থেকে সরিয়ে পি.পি খুলে পঁচা কাঠের গুড়ার কম্পোস্ট একটি গর্তের মধ্যে রেখে কম্পোষ্ট তৈরী করে কৃষিকাজে ব্যবহার করা যাবে।

অংকুর বা পিনহেড

মিডিয়াম স্টেজ মাশরুম

সংগ্রহোপযোগী মাশরুম

৫.৩ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

৫.৩.১ পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ ও জৈব উপায়ে মাশরুম উৎপাদন করা হয়। তাই মাশরুম সর্বোচ্চ পরিবেশ বান্ধব।

৫.৩.২ মাশরুমের বালাই: মাশরুমের বালাই বলতে এমন সব জীবন্ত বস্তুকে বোঝায় যা চাষ করা মাশরুম নষ্ট করে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক অংশে কমিয়ে এবং মাশরুম এর গুনগত মান নষ্ট করে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে চাষ করলে মাশরুম সাধারণতঃ কোন রোগ-বালাই কিংবা পোকা মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয় না। তবে অপরিচ্ছন্ন হলে কখনও কখনও বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের যেমন- (১) বিভিন্ন ধরণের মাছি (স্ক্যারিড, ফোরিড, সেসিড ও লেপটোসেরা) (২) মাইট, (৩) উইভিল, (৪) স্প্রিং টেইলস (৫) পিপড়া, (৬) তেলাপোকা, (৭) ইঁদুর ইত্যাদি মাশরুমের ক্ষতি করতে পারে। এ সকল পোকা মাকড় শুরু থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত মাশরুমের বিভিন্ন ক্ষতি করে থাকে। মাশরুম চাষের জন্য যে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বজায় রাখা হয় তা পোকামাকড়ের বংশ বিস্তার ও সক্রিয়তা বৃদ্ধির উপযোগী। এ কারণে চাষীর বাড়িতে মাশরুম চাষের সময় পোকা মাকড়ের অনুপ্রবেশ ও বংশবিস্তার খুব সহজেই ঘটে। নিম্নে এদের ক্ষতির প্রকৃতি ও দমন ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হল

৫.৩.২.১ পোকামাকড়

১। মাছি

ক) স্ক্যারিড মাছি: এই মাছি সরাসরি ওকীড়া অবস্থায় মাশরুমের ক্ষতিসাধন করে থাকে। এর কীড়াগুলির মাথা কালো রঙের বলে সহজে চেনা যায়। পিনহেড বা ছোট স্ট্রেজে এই মাছি সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। এর কীড়া পিনহেডের ভিতরে ঢুকে এর নরম টিস্যু গুলো খেয়ে ফেলে। এছাড়া এমাছি অন্যান্য ছত্রাকের বাহক হিসেবে কাজ করে বিধায় এর মাধ্যমে ছত্রাক জাতীয় রোগ ছড়ায়।

খ) ফোরিড মাছি: এর কীড়ার মাথায় কোন কালো দাগ থাকেনা। এই মাছির কীড়া মাশরুমের সাদা মাইসিলিয়াম খেয়ে ফেলে যে কারণে মাশরুমের পিনহেড বের হতে পারে না, বর্ষাকাল ও শরৎকালে এর আক্রমণ বেশি হয়। তবে স্ক্যারিড মাছির মত কোন ক্ষতিকর ছত্রাক বহন করে না।

এক নজরে মাছি মাশরুম চাষে যে সব সমস্যার সৃষ্টি করে:

- মাশরুমের উৎপাদন কমিয়ে দেয়
- কম্পোষ্ট নষ্ট করে ফেলে
- প্যাকেটের মাইসেলিয়াম খেয়ে ফেলে
- রোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে রোগ বিস্তার করে।
- পরিচর্যাকারীর বিরক্তির কারণ হয়।
- মাশরুমের গুণগত মান নষ্ট করে বাজার মূল্য কমিয়ে দেয়।

সুতরাং মাছির ব্যবস্থাপনা মাশরুম চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

১) মাছি পোকার ক্ষতি থেকে রেহাই পেতে চাষ ঘরের চারপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরী। এক্ষেত্রে মাশরুম ঘরের জানালা দরজায় নেট ব্যবহার করে প্রতিরোধ করা যায়। তাছাড়া ঘরের চারপাশে নিমের পাতাসহ ডাল রেখে মাছির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

- মাছি মারার ফাঁদ বানিয়েও মাছি দমন করা যায়। এক্ষেত্রে একটি পাত্রে অথবা পানির বোতল কেটে ১০০ গ্রাম মাশরুম কুচি কুচি করে কেটে তার সাথে ১০ ফোটা ডিপট্যারেক্স অথবা অন্য যে কোন কম গন্ধের কীটনাশক মিশিয়ে ঘরের ভিতর রেখে দিলে এর গন্ধে মাছি আকৃষ্ট হয়ে খেতে যাবে এবং মারা পড়বে।

- মাশরুম চাষ ঘরের র‍্যাকে হলুদ রংগের আঠাযুক্ত কাগজ মুড়ে রাখলে হলুদ রঙ্গে আকৃষ্ট হয়ে মাছি কাছে আসে ও আঠায় আটকে যায় এভাবে পুর্ণাঙ্গ মাছি দমন করা যায়।
- বর্ষার সময় মাশরুমের মধ্যে অথবা কাটা জায়গায় মাছির কীড়া নড়াচড়া করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে প্যাকেটের ভেজা নরম কাঠের গুড়া গুলো চেছে পুড়িয়ে ফেলে এক/দুই দিন পানি স্প্রে বন্ধ রাখলে এবং সেই সাথে মাছি পোকা প্রতিরোধের উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করলে সহজে এ সমস্যা দুর করা যায়।

৫) পিপড়া: পিপড়া মাশরুমের স্পন প্যাকেট ছিদ্র করে এবং মাশরুমের রস চুষে খায় যার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া থেকে সহজে মাশরুমকে আক্রমণ করে।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার: চাষ ঘরের চারপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ফিনিস পাউডার (কীটনাশক) ঘরের চারপাশে ও তাকের পিলারের চারপাশে ছিটিয়ে দিতে হবে। মাশরুম র‍্যাক জল কান্দাতে বসালে পিপড়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৬) তেলাপোকা: তেলাপোকা পিনহেড থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ মাশরুম কেটে খায়। তেলাপোকা মাশরুমের গুনগতমান সহ ফলন কমিয়ে দেয়।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার: ম্যাজিক চক তাকের বিভিন্ন জায়গায়, দেয়ালে এবং পিলারের চারপাশে দাগ কেটে দিয়ে তেলাপোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া পিটিয়ে মেরেও তেলাপোকা দমন করা যায়। বাজারে নকরোচ নামক কীটনাশক তাকের চারপাশে ছিটিয়ে দিয়ে তেলাপোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৭) ইঁদুর: ইদুর স্পন প্যাকেট কেটে নষ্ট করে। তাছাড়া পিনহেড থেকে শুরু করে পুর্ণাঙ্গ মাশরুম কেটে ফেলে এবং ফলন কমিয়ে দেয়।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার: মাশরুম ঘরের নিচ দিয়ে নেট, ইঁদুর মারা ফাঁদ ও ইঁদুর নাশক ঔষধ ব্যবহার করে এ ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

৫.৩.২.২ রোগ: মাশরুম অত্যন্ত বিশুদ্ধ উপায়ে তৈরি হয় বলে রোগব্যাধি খুবই কম হয়। তবে মাশরুমের স্পন প্যাকেট যদি সম্পূর্ণরূপে জীবানুমুক্ত না হয় তাহলে প্যাকেটে রোগ ব্যাধির সংক্রামন হতে পারে। এছাড়া চাষঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলে অথবা বিশুদ্ধ পানি স্প্রে না করলে অথবা জীবাণুবাহী পোকামাকড় মাশরুমে আক্রমণ করলে অনেক সময় মাশরুমে বিভিন্ন রোগব্যাধির আক্রমণ দেখা দেয়। রোগব্যাধির আক্রমণ চেনার সহজ উপায় হচ্ছে মাশরুম পচে যাওয়া, কাটা জায়গায় সাদা তুলার মত হওয়া, অথবা কাটা জায়গায় সবুজ বা কালো হয়ে যাওয়া। এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হলে সরাসরি মাশরুম বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

মাশরুম অল্প দিনে জীবন চক্র সম্পন্ন করে বলে এর বালাই ব্যবস্থাপনা খুব কঠিন। তাই কম খরচে সময়মত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন অতীব জরুরী। বালাই ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা হলে মাশরুমের উৎপাদন বহগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৫.৪ মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

৫.৪.১ মাশরুম সংগ্রহ প্রণালী

৫.৪.১.১ মাশরুম সংগ্রহের সময়: যথাসময়ে/ সঠিক সময়ে মাশরুম সংগ্রহ করতে পারলে মাশরুমের সংরক্ষণকাল বেড়ে যায় এবং চাষী লাভবান হয়।

ক) ওয়েষ্টার - মাশরুম যথেষ্ট বড় হয়েছে কিন্তু মাশরুম পিলিয়াসের শিরাগুলো ঢিলা হয়নি অথবা কিনারা পাতলা হয়ে ফেটে যায়নি এমতাবস্থায় মাশরুম সংগ্রহ করতে হবে।

খ) মিল্কি হোয়াইট - এ মাশরুমের সংরক্ষণকাল সবচেয়ে বেশী সাধারণ রুম তাপমাত্রায় একে ৪-৫ দিন সংরক্ষণ করা যায় । এর সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হলো মাশরুমের আকার প্রায় ৪-৫ ইঞ্চি হবে এবং মাশরুম যথেষ্ট রসালো থাকেবে। এ সময় সংগ্রহ করলে প্যাকেটে মাশরুমের পরিমাণ বেশি পাওয়া যাবে এবং মাশরুমের বাজার মূল্য বেড়ে যাবে।

গ) স্ট্র মাশরুম সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, এর সংরক্ষণকাল ২৪ ঘন্টারও কম। মাশরুমের ক্যাপ ফোটে যায়নি অথাৎ বাটন/এগ অবস্থায় সংগ্রহ করা উপযুক্ত সময়।

৫.৪.১.২ মাশরুম সংগ্রহ কৌশল

১) চাষঘরের তাপমাত্রা অতিরিক্ত থাকলে মাশরুম সংগ্রহ করা উচিত নয়, সেজন্য সকালে অথবা বিকেলে মাশরুম সংগ্রহ করা উচিত।

২) এক হাতে প্যাকেট ধরে অন্য হাতের পাঁচ আঙ্গুলের সাহায্যে আলতো মোচড় দিয়ে মাশরুম তুলে নিতে হবে।

৩) সংগৃহীত মাশরুমের গোড়ার ময়লা অংশ কেটে পরিচ্ছন্ন করতে হবে এবং গ্রেডিং করতে হবে।

৪) গ্রেড অনুযায়ী মাশরুম গুলোকে ০.২-০.২৫ মিঃ মিঃ পুরুত্বের পিপি ব্যাগে ভরে সিলিং করে বাজারজাত করতে হবে।

৫) এবং তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

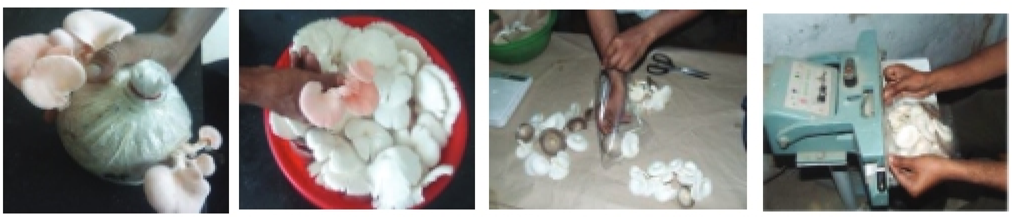

চিত্র: মাশরুম প্যাকেজিং

৫.৪.২ মাশরুম সংরক্ষণ প্রণালী

৫.৪.২.১ মাশরুম কেন সংরক্ষণ করা উচিত:

তাজা মাশরুমে পানির পরিমান বেশী থাকায় এর সংরক্ষণকাল খুবই কম। মাশরুম তুলে আনার পরপরই এর রং এবং গঠনের দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ করলে রং ও গঠন ঠিক রেখে বেশীদিন ব্যবহার করা যায়। তাই মাশরুম ঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হলে কিছু বিষয় সব সময় মেনে চলতে হবে। যেমন-

- মাশরুম সঠিক সময়ে অথাৎ পরিপক্ক অবস্থায় তুলতে হবে।
- যথা নিয়মে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- সংরক্ষণ অবশ্যই ঠান্ডা বায়ুরোধী অবস্থায় করতে হবে।

৫.৪.২.২ তাজা মাশরুম সংরক্ষণ

- তাজা মাশরুম তোলার ১২ ঘন্টা পূর্বে সরাসরি গায়ে পানি স্প্রে না করলে সেই মাশরুম তুলে, কেটে গ্রেডিং করে পিপি ব্যাগের মধ্যে সিলিং করে ঘরে ঠান্ডা জায়গায় ২ থেকে ৩দিন রেখে খাওয়া যায়।
- রেফ্রিজারেটরের মধ্যে নরমাল চেম্বারে (১০ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায়) সিলিং অবস্থায় ৭/৮দিন রেখে খাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে প্যাকেটটি রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে একবারেই পুরো প্যাকেটের মাশরুম খেয়ে ফেলতে হবে। তাই প্যাকেট করার সময় পারিবারিক প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট ছোট প্যাকেট করা উচিত।
- বাসাবাড়িতে দীর্ঘদিন রেখে খাওয়ার জন্য ২% ফুটন্ত লবণ পানিতে ২থেকে ৩ মিনিট সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে টিফিন বক্সে অথবা ঢাকনাযুক্ত কৌটায় ডিপ ফ্রীজের মধ্যে ৫ থেকে ৬মাস রাখা যাবে।
- এছাড়া মাশরুম ব্লানচিং করে লবণ দ্রবণে ৫-৬ মাস রেখে খাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ব্লানচিং করার পদ্ধতি হচ্ছে ২% ফুটন্ত লবণ পানিতে ২ থেকে ৫ মিনিট মাশরুম সিদ্ধ করে বিশুদ্ধ ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ২% লবণ (সোডিয়াম/পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট) ও ১% সাইট্রিক এসিড মিশ্রিত লবণ দ্রবণে বায়ুরোধী করে জীবাণুমুক্ত করার পর ঠান্ডা করে ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

৫.৪.২.৩ মাশরুম ক্যানিং: এই পদ্ধতিতে মাশরুম এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। বিদেশের বাজারে মাশরুম রপ্তানী করতে হলে ক্যানিং পদ্ধতি সবচেয়ে ভালো।

৫.৪.২.৪ শুকনা মাশরুম সংরক্ষণ: মাশরুম শুকিয়ে এবং শুকনো মাশরুম পাউডার করে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করা যায়। মাশরুম রোদে, ডিহাইড্রেশন পদ্ধতিতে অথবা ইলেকট্রিক ড্রায়ারে শুকিয়ে এয়ার টাইট প্যাকেটে ৫-৬ মাস রেখে সংরক্ষণ করা যায়। শুকনা মাশরুম ব্লেন্ডার মেশিনে পাউডার করে এয়ার টাইট প্যাকেটে রেখে একই ভাবে ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

চিত্র: ইলেকট্রিক ড্রায়ার

৫.৪.২.৫ মাশরুমের রন্ধন প্রণালী / ব্যবহার পদ্ধতি/ মাশরুম রান্নার মাধ্যমে সংরক্ষণ

মাশরুম এমন একটি সবজি যা বিভিন্নভাবে খাবার তৈরি করে খাওযা যায়। মাশরুম দিয়ে চাইনিজ ও স্টার হোটেল গুলোতে বিভিন্ন প্রকার মুখরোচক খাবার তৈরি করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশীয় পদ্ধতিতে মাশরুম দিয়ে নানা রকম খাবার যেমন- মাশরুম সবজি, মাশরুম চিকেন স্যুপ, চিংড়ি মাশরুম, মাশরুম ফ্রাই, মাশরুম চিকেন বিরিয়ানী, ছোট মাছের সাথে মাশরুম, মাশরুম পোলাও, মাশরুম নুডুলস ইত্যাদি তৈরি করা যায়। অর্থাৎ প্রায় যে কোন খাবার মাশরুম দিয়ে রান্না করা যায়।তাজা, শুকনা ও পাউডার তিনভাবে মাশরুম খাওয়া

যায় তবে শুকনা মাশরুম ব্যবহারের পূর্বে ১০-১৫ মিনিট গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। পাউডার মাশরুম দিয়ে চা, কফি, মিষ্টিজাতীয় দ্রব্যাদি, সকালের রুটির আটায় এমনকি তরকারীতে হলুদ, মরিচের গুড়ার মত ব্যবহার করা যায়। এছাড়া আচার, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি তৈরি করেও সংরক্ষণ করা যায়।

মাশরুম ক্রিসপি (দশ জনের জন্য):

উপকরণঃ মাশরুম- ২০/২৫ টি (২০০ গ্রাম), আটা- ৪ কাপ, লবণ- পরিমাণ মত, হলুদ গুড়ো- ১/২ চা চামচ, মরিচ গুড়ো- ১চা চামচ, জিরার গুড়া – ১/৪ চা চামচ, গোল মরিচের গুড়া- ১/৪ চা চামচ, সয়াবিন তৈল – ১ কাপ ও পানি - পরিমাণ মত।

প্রণালী: ১) প্রথমে তাজা মাশরুম লম্বালম্বা করে চিরে নিতে হবে।

২) পাতলা ধরনের মাশরুম হলে বেশি ভালো হয়।

৩) গোলমরিচ গুড়াবাদে আটাসহ উপরোক্ত সকল উপকরণ মিশিয়ে পাতলা করে গোলা তৈরী করে নিতে হবে।

৪) উপরোক্ত গোলায় মাশরুম ডুবিয়ে নিতে হবে।

৫) অতঃপর ডুবানো মাশরুম গোলমরিচ ও লবণ মিশ্রিত আটায় গড়িয়ে নিয়ে ডুবা তেলে ভাজতে হবে।

৬) বাদামী বর্ণ ধারণ করলে নামিয়ে নিতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

১) বাংলাদেশে বানিজ্যিকভবে সাত ধরণের মাশরুম চাষ হয়।

২) মাশরুম এমন একটি সবজি যা বিভিন্নভাবে খাবার তৈরি করে খাওযা যায়।

৩) তাজা, শুকনা ও পাউডার তিনভাবে মাশরুম খাওয়া যায়।

৪) মাশরুমের প্রোটিন হল অত্যন্ত উন্নত, সর্ম্পূণ এবং নির্দোষ মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় ৯টি এমাইনো এসিড সবগুলোই মাশরুমে আছে।

৫) মাশরুম নিজের খাদ্য তৈরীতে অক্সিজেন ব্যবহার করে ও কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে।

৬) স্পন প্যাকেটের চারিপাশের আর্দ্রতা ৭০% - ৮০% রাখার জন্য গরমের দিনে ৪/৫ বার, শীতে ও বর্ষায় দিনে ২/৩ বার (প্রয়োজনে কমবেশী) পানি স্প্রে করতে হবে।

৭) মাশরুম যথেষ্ট বড় হয়েছে কিন্তু মাশরুম পিলিয়াসের কিনারা পাতলা হয়ে ফেটে যায়নি এমতাবস্থায় মাশরুম সংগ্রহ করতে হবে।

২০১৪

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তুমি মাশরুমের বিভিন্ন জাত সম্পর্কে জেনেছ। নিম্ন ছকে কয়েকটি জাতের উল্লেখ করা হয়েছে। তুমি ছবি দেখে জাতের নাম, বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন মৌসুম ও ব্যবহার উল্লেখ কর।

ক্রমিক নং	ছবি	জাতের নাম ও বৈশিষ্ট্য	উৎপাদন মৌসুম	ব্যবহার
০১				
০২				
০৩				
০৪	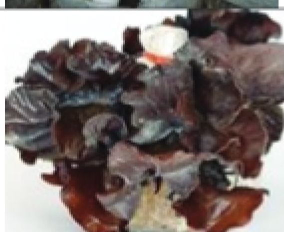			
০৫				
০৬	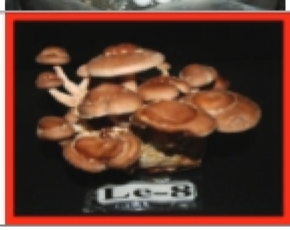			

২০২৪

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

ইতোমধ্যে তুমি মাশরুম চাষের প্রতিবেশ সম্পর্কে জেনেছ। তুমি তোমার বাড়িতে মাশরুম চাষের পরিকল্পনা করেছ। তুমি সফলভাবে মাশরুম চাষ করতে কিকি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ।

অথবা

তুমি তোমার এলাকায় সরেজমিনে একটি মাশরুম ফার্ম পরিদর্শনপূর্বক নিম্নলিখিত প্রশ্নের আলোকে মাশরুম চাষের আয় ব্যয়ের প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

ক) ফার্মের নাম ও ঠিকানা

খ) উৎপাদিত পণ্যের নাম ও পরিমাণ যেমন তাজা মাশরুম, শুকনা মাশরুম, স্পন প্যাকেট, আচার, ক্যাপসুল ইত্যাদি

গ) স্পন প্যাকেট প্রাপ্তির উৎস যেমন নিজে/ সরকারী প্রতিষ্ঠান/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

ঘ) কোথা হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

ঙ) স্পন প্যাকেট তৈরির যন্ত্রপাতি ও চাষঘরের বর্ননা

চ) কোথায় বাজারজাত করেন

ছ) কতজন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কয় ধরণের মাশরুম চাষ করা হয়

২। বীজ উৎপাদনের ধাপ কয়টি?

৩। দিনে কতবার পানি স্প্রে করতে হয়

৪। বানিজ্যিক স্পণ তৈরির মূল উপকরণ কি?

৫। কয়ভাবে মাশরুম ব্যবহার করা যায়।

৬। বিশ্বের নামকরা মাশরুমের নাম কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

২। মাশরুম চাষের প্রতিবেশ উল্লেখ কর।

৩। কিভাবে স্পণ প্যাকেট কর্তন করা হয়।

৪। মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি লিখ

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। প্যাকেট কর্তন ও পরিচর্যা সম্পর্কে লিখ

২। কাঠের গুড়ায় স্পণ প্যাকেট উৎপাদন পদ্ধতি বর্ননা কর।

৩। ছবিসহ মাশরমের গঠন বর্ননা কর

৪। বালাই কি? মাশরুমের ৫টি বালাই সম্পর্কে লিখ।

৫। মাশরুমের পুষ্টি ও ঔষধিগুণ সম্পর্কে লিখ

জব ৫.১ মাশরুম চাষে দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- মাশরুম চাষের উপযোগী ঘর ও তাক তৈরি করতে পারবে।
- মাশরুমের স্পন প্যাকেট সংগ্রহ , কর্তন ও স্থাপন করতে পারবে
- অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে পারবে
- বালাই দমন করতে পারবে
- মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে

পারদর্শীতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান নির্বাচন ও প্রস্তুত করা
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
৩. মাশরুম চাষঘর ও তাক তৈরির সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করা
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা
৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেওয়া

ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	হ্যান্ড গ্লাভস		
২	এপ্রোন		
৩	সেফটি গগলস		
৪	গামবুট		
৫	সেফটি মাস্ক		

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী: মাশরুম ঘরের ফসল কারণ উচচ আর্দ্রতা সম্পন্ন ও ছায়াযুক্ত স্থানে এটি চাষ হয়। এটি চাষের জন্য কোন আবাদি জমি দরকার হয়না। ভিন্ন ধরণের মাশরুম চাষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও আলো প্রয়োজন হয়। কোন জাতের মাশরুম চাষ করবে সে অনুযায়ী চাষঘরে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। মাশরুম চাষের জন্য মূলত ৫টি বিষয়ের উপরে নজর দিতে হবে। এ ৫টি বিষয়কে মাশরুম চাষের মূলনীতি হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

মাশরুম: ওয়েস্টার মাশরুম

চাষঘর: মাশরুম চাষের ৫টি মূলনীতিকে অনুসরন করে কাঠ, বাঁশ, লোহা, টিন, ছন দিয়ে ঘর তৈরি করতে হবে। পাকা ঘর তৈরি করা যেতে পারে। আবার ৫টি মূলনীতিকে অনুসরন করে বিদ্যমান ঘরেও চাষ করা যেতে পারে।

ঘর: প্রতিদিন ৫-৬ কেজি ওয়েস্টারমাশরুম উৎপাদনের জন্য ২২ ফুট**X**১২ ফুট ঘর তৈরি করতে হবে।

তাক: কাঠ, বাঁশ, লোহা, পিভিসি পাইপ দিয়ে ১০ ফুটX২.৫ফুট মাপের ৪টি তাক তৈরি করতে হবে।
যন্ত্রপাতি ও উপকরণ: কাঠ/ বাঁশ/ লোহা, টিন/ ছন/ ইট, ব্লেড, বালতি, স্প্রে মেশিন
মানসম্মত বীজ: সরকারী / সেরকারী নির্ভযোগ্য প্রতিষ্ঠানহতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

ভাল/ মানসম্মত বীজের বৈশিষ্ট্য

- প্যাকেট সাদা মাইসেলিয়ামে পরিপূর্ণ থাকবে
- প্যাকেট টাইট হতে হবে।
- প্যাকেটের গায়ে জাতের নাম ও তারিখ লিখা থাকবে।

কাজের ধারা: ১) অক্সিজেন প্রবেশ/ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আছে, কার্বনডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন, উপযুক্ত আলো, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিশ্চিতকরণ করা যাবে এমন জায়গা চাষঘর হিসাবে নির্বাচন করতে হবে।

২) সরকারী মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টটিডিউট বা বেসরকারীভাবে গড়ে ওঠা মাশরুম র্ফাম থেকে বীজ সংগ্রহ করে

৩) স্পন প্যাকেটের কোণাযুক্ত দুই কাঁধ বরাবর প্রতি কাঁধে ২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি নিচে ব্যাস করে উল্টা “D" আকারে পিপি কেটে ফেলতে হবে। উভয় পার্শ্বের এই কাটা জায়গা ব্লেড দিয়ে সাদা অংশ চেছে ফেলতে হবে। এই কাটা ও চাছা প্যাকেটকে ৫-১৫ মিনিট পানিতে উপুড় করে চুবিয়ে ভালভাবে পানি ঝরিয়ে সরাসরি চাষ ঘরের মেঝে অথবা তাকে সারি করে সাজিয়ে চাষ করতে হবে।

৪) প্যাকেটগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে মাশরম বের হওয়ার পর একপাশের মাশরুমের সাথে অপরপাশে স্পর্শ না লাগে।

৫) স্পন প্যাকেটের চারিপাশের আর্দ্রতা ৭০% - ৮০% রাখার জন্য গরমের দিনে ৪/৫ বার, শীতে ও বর্ষায় দিনে ২/৩ বার (প্রয়োজনে কমবেশী) পানি স্প্রে করতে হবে যেন প্যাকেট ও এর আশেপাশে ভেজা ভেজা ভাব থাকে।

৬) জাতভেদে প্যাকেট কাটার ২-৩ দিনের মধ্যে মাশরুমের অংকুর পিনের মত বের হবে। ৫-৭ দিনের মধ্যে মাশরুম তোলার উপযোগী হবে।

৭)মাশরুম যথেষ্ট বড় হয়েছে কিন্তু মাশরুম পিলিয়াসের শিরাগুলো ঢিলা হয়নি অথবা কিনারা পাতলা হয়ে ফেটে যায়নি এমতাবস্থায় মাশরুম সংগ্রহ করতে হবে।

৮) প্রথমবার মাশরুম তোলার পর প্যাকেট ১ দিন বিশ্রাম অবস্থায় রাখতে হবে এবং পরের দিন পূর্বের কাটা অংশে পুনরায় চেছে ফেলে পূর্বের ন্যায় পানি স্প্রে করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে প্যাকেট যেন গর্ত না হয়।

৯) ১০ - ১৫ দিন পর ২য় বার মাশরুম সংগ্রহ করা যাবে।

১০) একইভাবে ১ টি প্যাকেট থেকে ৫/৬ বার মাশরুম সংগ্রহ করা যায়, তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য ২/৩ বার সংগ্রহ করা উচিত। এতে একটি প্যাকেট থেকে নূন্যতম ২০০-২৫০ গ্রাম মাশরুম পাওয়া যাবে।

কাজের সতর্কতা

১) প্যাকেট সাবধানে পরিবহন করতে হবে।

২) সঠিক নিয়মে কাটতে হবে।

৩) সুষ্ঠ পরিচর্যা করতে হবে।

৪) পানি স্প্রে করার স্প্রে নজল কমপক্ষে ১ ফুট দূরে রেখে স্প্রে করতে হবে।

৫) মাশরুম সংগ্রহ করার ১২-১৮ ঘন্টা পূর্বে পানি স্প্রে বন্ধ করতে হবে।

৬) পরিছন্ন চাষাবাদ করতে হবে যাতে পোকার আক্রমণ না হয়।

৭) পোকামাকড় দেখা গেলে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা

মাশরুম চাষ করার সফলতা অর্জন করেছ।

ফলাফল

আশাকরি বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ করতে পারবে।

২০২৪

ফ্রুট এ্যান্ড ভেজিটেবল কল্টিভেশন-২

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অধ্যায়
শরৎকালীন ফল চাষ
(Cultivation of Autumn Fruits)

বাংলাদেশ ফলের দেশ। এদেশে ফলের ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে এবং প্রায় ৭২ ধরনের বিভিন্ন প্রজাতির প্রচলিত ও অপ্রচলিত ফল জন্মে, যার ক্ষুদ্র একটি অংশ বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হয়। আমাদের বাড়ির আঙ্গিনায় বা আশেপাশে আমরা বাতাবিলেবু, মালটা, ডালিম, তাল, নারিকেল ইত্যাদি ফল গাছ লাগিয়ে থাকি। বাংলাদেশে বিভিন্ন মৌসুমে বা ঋতুতে বিভিন্ন ধরণের ফল জন্মে। শরৎকালে লেবুজাতীয় ফল যেমন মাল্টা, বাতাবিলেবু ইত্যাদি এবং অন্যান্য ফল যেমন- আমলকি, তাল, নারিকেল, ডালিম জন্মে থাকে। আমাদের দেশ খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য ফল উৎপাদনের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন প্রকার খনিজ ও ভিটামিনের সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হচ্ছে ফল। এই অধ্যায়ে আমরা শরৎকালীন ফলের সাথে পরিচিত হবো এবং চাষাবাদ কৌশল সম্পর্কে জানব।

এই অধ্যায় শেষে-

- ফল বাগানের জমি তৈরী করতে পারবে
- নির্দিষ্ট প্রজাতির ফলের কাংখিত জাত নির্বাচন করতে পারবে
- ফলের চারা তৈরি করতে পারবে
- ফলের চারা রোপণ করতে পারবে
- অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে পারবে
- পরিপক্ক ফল সংগ্রহ ও ফল সংরক্ষণ করতে পারবে

১.১ মাল্টা (Malta)

মাল্টা সাইট্রাস ফসলের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় ফল। মাল্টাতে আছে ভিটামিন বি, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, এবং চর্বিমুক্ত ক্যালরি। মিষ্টি কমলা বা Sweet orange (*Citrus sinensis*) বাংলাদেশে মাল্টা নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বাজারে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সবুজ ও কমলা রঙের মাল্টা বিক্রি করতে দেখা যায়। কমলার সাথে এর প্রধান পার্থক্য হলো কমলার খোসা ঢিলা কিন্তু মাল্টার খোসা সংযুক্ত (টাইট)। বিশ্বের সর্বমোট উৎপাদিত সাইট্রাস ফসলের দুই তৃতীয়াংশ হলো মাল্টা। কমলার তুলনায় এর অভিযোজন ক্ষমতা বেশি হওয়ায়, পাহাড়ি এলাকা ছাড়াও দেশের অন্যান্য এলাকায় সহজেই চাষ করা যাচ্ছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ করে সফল হচ্ছেন। উন্নত জাত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করে এর উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমলা, মাল্টা, লেবু এবং বাতাবিলেবুর উৎপাদন ছিল তিন লাখ ৮০ হাজার ৬৬ টন।

১.১.১ উৎপত্তি: ভিয়েতনাম, ভারত ও চীন মাল্টার আদি উৎপত্তিস্থল। তবে বর্তমানে এই ফলটি বিশ্বের উষ্ণ ও অব উষ্ণমন্ডলীয় এলাকায় বেশি চাষাবাদ হচ্ছে।

১.১.২ চাষের জলবায়ু: কম বৃষ্টিবহুল সুনির্দিষ্ট গ্রীষ্ম ও শীতকাল অর্থাৎ শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ু মাল্টা চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। বায়ুমন্ডলের আর্দ্রতা ও বেশি বৃষ্টিপাত মাল্টা ফলের গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। বাতাসে অধিক আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপ্রবণ এলাকায় মাল্টার খোসা পাতলা হয় এবং ফল বেশি রসালো ও নিম্ন মানের হয়। শুষ্ক আবহাওয়ায় ফলের মান ও স্বাদ উন্নতমানের হয়।

১.১.৩ জমি ও মাটি নির্বাচন: সারাদিন রোদ পড়ে ও বৃষ্টির পানি জমে না এমন উঁচু বা মাঝারি উঁচু জমি মাল্টা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। আগাছা পরিষ্কার ও আশেপাশে উঁচু গাছ থাকলে ডাল ছেঁটে দিতে হবে। মাল্টা চাষের জন্য নির্বাচিত জমি সমতল হতে হবে, তা না হলে মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। সব ধরণের মাটিতে জন্মালেও সুনিষ্কাশিত, উর্বর, মধ্যম থেকে হালকা দোআঁশ মাটি মাল্টা চাষের জন্য উত্তম। মধ্যম অম্ল থেকে সামান্য ক্ষারীয় মাটিতে মাল্টা জন্মে। তবে ৫.৫ থেকে ৬.৫ (pH) অম্লতায় ভালো জন্মে। জলাবদ্ধতা মোটেও সহ্য করতে পারে না।

১.১.৪ লে আউট তৈরি: ষড়ভুজ বা বর্গাকার পদ্ধতিতে চারা বা কলম রোপণ করতে হবে। মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য ভাদ্র (মে- আগস্ট) মাস রোপণের উত্তম সময়। তবে পানি বা সেচের ব্যবস্থা থাকলে সারা বছর রোপণ করা যায়।

২০২৪

১.১.৫ গর্ত তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পুর্বে উভয় দিকে ৩/৪ মিটার দুরত্বে ৭৫X৭৫X৭৫ সেমি মাপে গর্ত খুড়তে হবে।

১.১.৬ সার প্রয়োগ: প্রতি গর্তে ১৫ কেজি পচা গোবর, ৪/৫ কেজি ছাই, ২৫০গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ৫ গ্রাম বরিক এসিড, ৫০০ গ্রাম চুন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গর্তে ভরে দিতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পরে চারা রোপণ করতে হবে।

১.১.৭ জাত নির্বাচন: দেশি বিদেশি বিভিন্ন জাত রয়েছে। এদেশে চাষ উপযোগী জাতের মধ্যে বারি মাল্টা-১ অন্যতম।

বারি মাল্টা-১ এর বৈশিষ্ট্য: নিয়মিত ফল দানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ খাটো, ছড়ানো ও ঝোপালো। মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র মাস পর্যন্ত গাছে ফুল আসে এবং কার্তিক মাসে ফল আহরণের উপযোগী হয়। ফল গোলাকার ও মাঝারি (১৫০ গ্রাম) আকৃতির। পাকা ফলের রং সবুজ। ফলের পুষ্প প্রান্তে পয়সা সদৃশ সামান্য নিচু বৃত্ত বিদ্যমান। ফলের খোসা মধ্যম পুরু ও শাঁসের সাথে সংযুক্ত। শাস হলুদ ভাব, রসালো, খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু। গাছ প্রতি ৩০০-৪০০ ফল ধরে। হেক্টর প্রতি ফলন ২০ টন। দেশের সব অঞ্চলে চাষের উপযোগী।

চিত্র: বারি মাল্টা-১

১.১.৮ চারা/ কলম ও বংশবিস্তার পদ্ধতি: বীজ ও কলমের মাধ্যমে মাল্টার বংশবিস্তার করা যায়। তবে বীজের চারা আমাদের দেশের মাটি ও আবহাওয়ার সাথে সমন্বয় করে বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। তাই কলমের মাধ্যমেই চারা তৈরি করা উত্তম। তাছাড়া কলমের তৈরি চারায় মাতৃগুণ বজায় থাকে ও দ্রুত ফল ধরে। এছাড়া রোগ প্রতিরোধী ও বলিষ্ঠ শিকড় সমৃদ্ধ আদিজোড়ের মাধ্যমে কলম করলে গাছের জীবনকাল ও ফলন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

জোড় কলম (Grafting): গ্রাফটিং এর জন্য প্রথমে আদিজোড় (Root stock) উৎপাদন করতে হবে। আদিজোড় হিসেবে বাতাবিলেবু, রাফলেমন, আদাজামির প্রভৃতি গাছের চারা ব্যবহার হয়। অত:পর কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছ হতে উপজোড় (Scion) সংগ্রহ করে আদিজোড়ের উপর স্থাপন করে মাল্টার গ্রাফটিং তৈরি করা হয়। আদিজোড় হিসেবে এক থেকে দেড় বছর বয়সের সুস্থ্য , সবল, সোজা, বাড়ন্ত চারা নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত মাতৃগাছ হতে সায়ন তৈরির জন্য দুটি চোখ সহ ৫/৬ সেমি লম্বা ও ৮/৯ মাস বয়সের ডাল সংগ্রহ করতে হবে। মধ্য বৈশাখ-মধ্য ভাদ্র (মে- আগস্ট) মাস পর্যন্ত গ্রাফটিং করা যায়। ভিনিয়ার ও ক্লেফট গ্রাফটিং (ফাটল জোড় কলম) উভয় পদ্ধতিতে মাল্টার কলম তৈরি করা যায়। সাধারণত কলম করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে আদিজোড় ও উপজোড়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হয় ও সায়নের চোখ ফুটে কুশি বের হয়। কলম হতে

২০২৪

একাধিক ডাল বের হলে সুস্থ্য সবল ও সোজা ভাবে বেড়ে ওঠা ডালটি রেখে, বাকীগুলো কেটে ফেলতে হবে। আদিজোড় থেকে বাড়ন্ত কুশি নিয়মিত কেটে ফেলে দিতে হবে।

১.১.৯ চারা/ কলম সংগ্রহ ও রোপণ: গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পরে চারা/ কলম গর্তের মাঝ বরাবর সোজা করে রোপণ করতে হবে। রোপণের পর খুঁটি দিয়ে বেধে দিতে হবে। প্রয়োজন মত সেচের ব্যাবস্থা করতে হবে।

১.১.১০ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সার প্রয়োগ: চারার যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময় মত সঠিক পরিমাণ ও পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। বয়স ভেদে গাছ প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ নিম্নররূপ-

গাছের বয়স	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া সার (গ্রাম)	টিএসপি সার (গ্রাম)	এমওপি সার (গ্রাম)	জিংক সালফেট (গ্রাম)	বরিক এসিড (গ্রাম)
১-২	১০-১২	২০০-৩০০	১০০-১৫০	১০০-১৫০	১০	৫
৩-৪	১২-১৫	৩০০-৪৫০	১৫০-২০০	১৫০-২০০	১৫	৮
৫-৭	১৫-১৮	৪৫০-৬০০	২০০-৩০০	২০০-২৫০	২০	১০
৮-১০	১৮-২০	৬০০-৭০০	৩০০-৪৫০	২৫০-৩০০	২৫	১২
১০ এর অধিক	২০-২৫	৭৫০	৫০০	৪৫০	৩০	১৫

প্রতি বছর মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (মার্চ) এবং মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে বর্ষার পূর্বে ২ বার ও বর্ষার পরে মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে ১ বার মোট তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষার আগে ও পরে ২ কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা ভালো।

আগাছা দমন: বর্ষার পরে সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে বিভিন্ন লতাপাতা বা খড় দ্বারা বৃত্তাকারে মালচ করে দিলে আগাছা দমন সহ শুষ্ক মৌসুমে আর্দ্রতা সংরক্ষিত হয়।

সেচ: ভালো ফলের জন্য শুষ্ক মৌসুমে বা খরার সময় নিয়মিত সেচ দেওয়া দরকার। বর্ষার সময় গাছের গোঁড়ায় যেন পানি না জমে, সে জন্য দ্রুত নিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল-পালা ছাঁটাই: মাল্টা গাছের জন্য ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পরে ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে, যাতে গাছ উঁচু না হয়ে চারদিকে ছড়াতে পারে। কারণ পার্শ্ব ডালে ফল বেশি ধরে। কান্ডের এক মিটার উচ্চতার সকল ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাইয়ের পরে কাঁটা অংশে বোর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে। এছাড়া শোষক শাখা (water sucker) উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে ফেলতে হবে। মরা, শুকনা, রোগাক্রান্ত ডাল ছেঁটে ফেলতে হবে।

ফল পাতলাকরণ: বারি মাল্টা-১ জাতের গাছে প্রতি বছর প্রচুর ফল আসে। সমস্ত ফল রাখা হলে ফল ছোট ও নিম্ন মানের হয়। এজন্য প্রতি পুষ্প মঞ্জুরিতে সুস্থ্য ও সবল দেখে দুটি ফল রেখে, বাকিগুলো ছোট (মার্বেল আকৃতি) থাকা অবস্থায় ছাঁটাই করে দিতে হবে। কলমের গাছ প্রথম বা দ্বিতীয় বছর থেকে ফল দেওয়া শুরু করে। গাছের ভালো বৃদ্ধির জন্য প্রথম ২ বছর ফল না রাখাই ভালো। ফলের আকৃতি সবুজ হওয়ায় পাখি বা

পোকার আক্রমণ কম হয়। তবে পরিপক্কতার পূর্বে ব্যাগিং করলে অবাঞ্ছিত পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ব্যাগিং: ব্যাগিং করা মাল্টা চাষের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি। চীনে উৎপাদিত এ ব্যাগ এখন আমাদের দেশেও পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিটির মূল্য আড়াই থেকে তিন টাকা। ব্যাগিং করলে ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ হয় না। তাই ফল পরিপক্কতার আগেই ছত্রাকনাশক (টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলিলিটার/১ লিটার) প্রয়োগ করে ব্যাগিং করতে হবে। এর কিছু বাড়তি সুবিধাও আছে। যেমন-পাতার ঘর্ষণ থেকে ফলকে রক্ষা করে। তীব্র সূর্যকিরণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বিভিন্ন পাখি এবং বাঁদুরের উপদ্রব হয় না। ফল নিরাপদ হয়। পরিবেশ ভালো থাকে। বাজার মূল্য পাওয়া যায় বেশি। এ ব্যাগ দুই-তিন বছর ব্যবহার করা যায়। দেশীয় পদ্ধতিতে পলিথিন, কাপড় কিংবা বাটার পেপার দিয়ে ব্যাগিং করা যেতে পারে।

বালাই ব্যবস্থাপনা: মাল্টা ফসলে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় এবং রোগের আক্রমণ হতে পারে। পোকার মধ্যে সাইলিড সবচেয়ে ক্ষতিকর। এছাড়া রয়েছে পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা, ফল ছিদ্রকারী পোকা, উঁইপোকা। রোগের মধ্যে রয়েছে আগা মরা রোগ, গ্রিনিং, ক্যাংকার এবং আঠাঝরা।

১) সাইলিড পোকা: পোকার বাচ্চা গাছের পাতা, পাতার বোঁটা, কচি ডগা এবং ফলের রস চুষে খায়। এতে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। রস চোষার সময় এরা গাছের রসের মধ্যে গ্রিনিং রোগের ভাইরাস ছড়ায়। সেইসাথে মিষ্টি আঠালো পদার্থ নির্গত করে।

চিত্র: সাইলিড পোকা

প্রতিকার: পোকাসহ আক্রান্ত পাতা বা ডাল অপসারণ করতে হবে। মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক যেমন- অ্যাডমায়ার বা ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক যেমন- সুমিথিয়ন ২মিলিলিটার/লিটার পানিতে মিশিয়ে মাল্টা গাছে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। তাহলে ডিম ও পোকা থাকলে ধ্বংস হবে। গ্রিনিং রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

২) পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা: এ পোকা ছোট অবস্থায় (কীড়া) মাল্টা পাতায় আক্রমণ করে। এরা রাতের বেলা গাছের কচি পাতায় গর্ত খুঁড়ে আঁকা বাঁকা দাগের সৃষ্টি করে। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়ে যায়।

প্রতিকার: আক্রান্ত অংশ কেটে ফেলতে হয়। তামাক নির্যাস ও সাবান গোলা পানি স্প্রে করা যেতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে ইটাপ ৫০ এসপি ১.২০ গ্রাম হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

রোগসমূহ

১) মাল্টার আগা মরা রোগ

লক্ষণ: এ রোগ দেখা দিলে পুরো গাছ বা গাছের ডাল আগা থেকে শুরু করে ক্রমশ নিচের দিকে মরে যেতে দেখা যায় । এ রোগটি ছত্রাকের আক্রমণে হয়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১। আক্রান্ত গাছে সুষম মাত্রায় জৈব সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা এবং নিয়মিত সেচ প্রদান করতে হবে।

২। ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাটাই করে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

৩।কিছুটা সুস্থ অংশসহ আক্রান্ত অংশ কেটে পুড়ে ফেলা এবং কর্তিত অংশে বোর্দো মিশ্রণ বা কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন- কুপ্রাভিট ৭ গ্রাম / লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৪। নতুন পাতা বের হলে ব্যাভিস্টিন ১ গ্রাম / লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করা ।

৫। বাগান অপরিচ্ছন্ন রাখা যাবে না।

৬। নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করতে হবে।

২) মালটার গ্রিনিং রোগ: ভাইরাস জনিত রোগ, কমলাতেও হয়, সাইলিড পোকা এ রোগের বাহক।

লক্ষণ: পাতার মধ্যশিরা হলদে হয়ে যায় এবং শেষ পর্যায়ে হলুদাভ রং ধারণ করে। শিরা উপশিরাগুলো ক্রমশ গাঢ় সবুজ হতে থাকে, শিরা দুর্বল ও পাতা কুঁকড়ে যায়। এটি ভাইরাস জনিত রোগ। সাইলিড পোকা দ্বারা এই রোগ বিস্তার লাভ করে থাকে।

মালটার গ্রিনিং রোগের লক্ষণ

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১। নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করতে হবে।

২। আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।

৩।মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রতিমাসে একবার ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক যেমন: অ্যাডমায়ার বা ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক যেমন: সুমিথিয়ন ২ মিলি. / লি. হারে পানিতে মিশিয়ে কমলা ও নিকটস্থ কামিনী গাছে ছিটিয়ে সাইলিড পোকা দমন করতে হবে।

৪। জীবানুমুক্ত চারা/ বীজ লাগাতে হবে।

৫। ৯০% সাইলিডবাগ লেডিবার্ড বিটল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই এদের রক্ষা করতে হবে। ১০৩৪

৬। বাগান পরিষ্কার/পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ।

১.১.১১ ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: ফলের পরিপক্কতার সাথে সাথে ফলের গাঢ় সবুজ বর্ণ, হালকা সবুজ বর্ণে বা ফ্যাঁকাসে সবুজ হতে থাকে। বারি মাল্টা-১ সেপ্টেম্বর- অক্টোবর মাসে আহরণ করা যায়। ফল সংগ্রহের পর নষ্ট বা আঘাত প্রাপ্ত ফল আলাদা করতে হবে। ভালো মানের ফলগুলো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

চিত্র: মাল্টার পরিপক্কতার লক্ষণ

১.২ ডালিম (Pome Granate)

ডালিম বাংলাদেশে বেদেনা বা আনার নামে পরিচিত। ডালিম খুবই আকর্ষণীয়, মিষ্টি, সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর উষ্ণমন্ডলের একটি অতি প্রিয় ফল। ফুল, ফল ও দানা খুবই আকর্ষণীয় লাল বর্ণের। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Punica granatum*. বিশ্বের অনেক দেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হলেও বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে অনেক বাড়িতে ফল ও শোভাবর্ধনের জন্য এ গাছ লাগানো হয়। ভক্ষণযোগ্য অংশের প্রতি ১০০ গ্রামে ৭৮ ভাগ পানি, ১.৫ ভাগ আমিষ, ০.১ ভাগ স্নেহ, ৫.১ ভাগ আঁশ, ১৪.৫ শ্বেতসার, ০.৭ ভাগ খনিজ পদার্থ, ১০ মি. গ্রা. ক্যালসিয়াম, ১২ মি. গ্রা. ম্যাগনেসিয়াম, ১৪ মি. গ্রা. অক্সালিক এসিড, ৭০ মি. গ্রা ফসফরাস, ০.৩ মি. গ্রা রাইবোফ্লাভিন, ০.৩ মি. গ্রা. নায়াসিন ও ১৪ মি. গ্রা. ভিটামিন সি থাকে। ডালিমের রস কুষ্ঠ রোগের উপকারে আসে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রেও এর ব্যবহার সবর্জন স্বীকৃত।

১৫.২.১ উৎপত্তি: হিমালয়ের পাদদেশে অনেক বন্য প্রজাতি দেখা গেলেও বৈজ্ঞানিকগণ ইরানকেই ডালিমের জন্মস্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইরানে এর জন্মস্থান হলেও দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এর চাষ হয়ে থাকে।

১.২.২ চাষের জলবায়ু: ডালিম চাষের জন্য উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়া খুবই ভাল। আর্দ্র আবহাওয়ায় ফলের স্বাদ ভাল হয় না। বর্ষাকাল ডালিম চাষের উপযুক্ত মৌসুম। ঠান্ডা বেশি হলে শীতকালে পাতা ঝরে পড়ে।বাংলাদেশে যদিও ডালিম উৎপাদন করা যায়, কিন্তু এখানকার জলবায়ু ডালিম চাষের জন্য আদর্শ নয়।

১.২.৩ জমি ও মাটি নির্বাচন: সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬০০ মি উঁচুতেও ডালিমের চাষ করা যায়। সব ধরনের মাটিতেই ডালিমের চাষ ভাল হলেও সুনিষ্কাশিত গভীর মাটি ডালিম চাষের জন্য উপযোগী। বেলে দোঁআশ বা পলি মাটিতে ডালিম গাছ খুব ভাল জন্মে। অল্প ক্ষারযুক্ত মাটিতেও এ গাছ জন্মায়। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও রংপুর এলাকায় ডালিম ভাল জন্মে।

১.২.৪ লে আউট তৈরি: গাছ বর্গাকার বা ষড়ভূজাকার পদ্ধতিতে রোপণ করা যেতে পারে।

১.২.৫ গর্ত তৈরি: জমি ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করতে হবে। জমি তৈরির পর ৪ মিটার দূরে দূরে সারি করে ৪ মিটার দূরে গর্ত করতে হবে। গর্তের আকার হবে ১ মিটার চওড়া ও ১ মিটার গভীর।

১.২.৬ সার প্রয়োগ: গর্ত করার ৮-১০ দিন পর গর্তের মাটির সাথে নিম্নলিখিত হারে সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

সারের নাম	পরিমাণ / গর্ত (গ্রাম)
কম্পোস্টের গুড়া	৫০০
ইউরিয়া	১৫০
টি এস পি	১০০
এম ও পি	১০০
জিপসাম	৭০

১.২.৭ জাত নির্বাচন: বাংলাদেশে ডালিমের জাত প্রকরণ নিয়ে কোন কাজ হয়নি। এর কোন উন্নত জাত এদেশে নেই। পৃথিবীর উন্নত জাতের মধ্যে রুবি, পেপার সেল, ওয়ান্ডারফুল, মাসকেট রেড, ঢোলকা, ভাদকি, ম্রিডুলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১.২.৮ চারা/ কলম ও বংশবিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন: বীজ থেকেই সাধারণত চারা তৈরি করা হয়। শাখাকলম বা গুটিকলমের দ্বারা এর অঙ্গজ বংশবিস্তার করা যায়। তবে ডালিমের বংশবিস্তারের সবচেয়ে সহজ ও সাধারণ পদ্ধতি হচ্ছে শাখাকলম পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কলম তৈরির জন্য ১ বছর বয়সের গাছের শক্ত ডাল নির্বাচন করতে হবে যা দৈর্ঘ্যে ২৫-৩০ সেমি। কাটিং বা শাখাকলম এর নীচের অংশ হরমোন ২০০০ পিপিএম ইনডোল এ্যাসেটিক এসিড/ ৩০০০পিপিএম ইনডোল বিউটারিক এসিড দ্রবণে চুবিয়ে নিলে শিকড় গজানো ত্বরান্বিত হয়।

১.২.৯ চারা/ কলম সংগ্রহ ও রোপণ: গর্ত ভরার ২০/২৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে। বর্ষাকাল চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়সের সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা বা কলম রোপণ করতে হবে। গর্তের মাঝখানে চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পরপরই পানি সেচ দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ রস থাকে।

২০২৪

১.২.১০ অন্তর্বতীকালীন পরিচর্যা

ডাল ছাঁটাই: ডালিমের শাখা-প্রশাখা ছাঁটাই বা প্রুনিং করলে অধিক সংখ্যায় নতুন ডালপালা গজায়, এতে ফলন বৃদ্ধি পায়। তাই ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা ও পোকাক্রান্ত ডাল ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে।

শিকড় ছাঁটাই: গাছে সারা বছরই ফুল ও ফল হয়। তবে বসন্তে ও বর্ষায় বেশি ফুল আসে। বসন্তের ফুল থেকে গ্রীষ্মকালে ফল পাওয়া যায় এবং এর গুণাগুণ খুবই নিম্নমানের হয়ে থাকে। কিন্তু বর্ষার ফুল থেকে প্রাপ্ত ফল অক্টোবর-নভেম্বরে সংগ্রহ করা হয় যার গুণগত মান খুবই ভাল হয়।

সার ব্যবস্থাপনা: চারা রোপণের ২ থেকে ৩ মাস পর হতে প্রথম বছর বা ফুল আসার পূর্ব পর্যন্ত প্রতি মাসে প্রতি গাছে নিম্নলিখিত হারে সার দিতে হবে।

সারের নাম	পরিমাণ / গাছ (গ্রাম)
কম্পোস্ট	৫০
ইউরিয়া	১৫
টি এস পি	০৫
এম ও পি	০৫

রোগ দমন

১) এনথ্রাকনোজ রোগ: এক ধরণের ছত্রাকের কারণে হয়।

রোগের লক্ষণ: প্রথমে ফলের গায়ে ছোট ছোট বাদামী রঙের দাগ পড়ে। পরবর্তীকালে ফল কালো হয়ে ঝরে পড়ে।

প্রতিকার: আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। ফল ধরার পর ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে বা ১% বর্দোমিশ্রণ ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

চিত্র: এনথ্রাকনোজ রোগ

ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন: অনেক পোকা দ্বারাই ডালিমের ক্ষতি সাধিত হয়। ডালিমের ক্ষতিকর পোকাসমূহ হচ্ছে ডালিমের ফল ছিদ্রকারী পোকা, কান্ড ছিদ্রকারী বিটল, পাতাখেকো বিছাপোকা, শুঁয়ো পোকা, ফলের মাছি, উইভিল, পাতার রস শোষণকারী পোকা, স্কেল ইনসেক্ট ও সাদা মাছি।

১) ডালিমের ফল ছিদ্রকারী পোকা

ক্ষতির ধরণ: শুককীট ডালিমের গায়ে ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ছিদ্র দিয়ে শুককীটের মল ফলের বাইরে বের হয়ে আসে। ফলে ছিদ্রের চারদিকে মল দেখতে পাওয়া যায়। আক্রান্ত ফল হতে বিশ্রী গন্ধ বের হয়। আক্রান্ত ডালিম মাটিতে ঝরে পড়ে ও ফল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে।

প্রতিকার: i) আক্রান্ত ফল ও পোকা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

ii) বাড়ন্ত ফলগুলোকে কাপড়ের থলে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে স্ত্রী প্রজাপতি ফলের গায়ে ডিম পাড়তে না পারে।

ii) ডালিম গাছে যখন ফল ধরতে শুরু করে তখন ১ মিলিলিটার ফসফামিডন ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতিটি গাছে ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চিত্র: আক্রান্ত ফল

চিত্র: ব্যাগিং

২) কান্ড ছিদ্রকারী বিটল

ক্ষতির ধরণ: গ্রাব বা শুককীট গাছের গোড়ায় ছিদ্র করে এবং গাছের রস খায়। বিটলগুলো দিনের বেলা সবুজ ডালপালা ও বাকল চিবিয়ে খায়। গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।

প্রতিকার ১.৫ মিলিলিটার সিসটক্স বা বাইড্রিন ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতিটি গাছে স্প্রে করতে হবে।

৩) পাতাখেকো বিছাপোকা

ক্ষতির ধরণ: শুককীটগুলো একত্রে দলবদ্ধ ভাবে থাকে এবং সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে। অতিরিক্ত আক্রান্ত হলে এরা কচি গাছ একেবারে ছেটে বা কেটে ফেলে।

প্রতিকার

i) শুককীট সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে।

ii) আক্রমণ বেশী হলে ১ মিলিলিটার ডাইক্লুরোভস ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতিটি গাছে স্প্রে করতে হবে।

৪) শুয়ো পোকা

ক্ষতির ধরণ: পাতা খেয়ে গাছ একেবারে পাতা শূন্য করে দেয়।

প্রতিকার: আক্রমণের প্রারম্ভেই শুককীটগুলো সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে।

৫) ফলের মাছি পোকা

ক্ষতির ধরণ: শুককীট কাঁচা বা পাকা উভয় রকমের ডালিমের মারাত্মক ক্ষতি করে। আক্রান্ত ডালিম বিক্রির অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

প্রতিকার: i) ফলের মাছি পোকার বংশবৃদ্ধি রোধের জন্য একেবারে সব ফল সংগ্রহ করতে হবে। ফল পাকার পূর্বেই ফল সংগ্রহ করতে হবে।

ii) আক্রান্ত ডালিম ধ্বংস করতে হবে।

ii) ডালিম সংগ্রহের ২ সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্ত কমপক্ষে ৩-৪ বার প্রতিলিটার পানিতে ২ মিলিলিটার ম্যালাথিয়ন বা ডাইমেথোয়েট বা ২.৫ গ্রাম সেভিন মিশিয়ে প্রতিটি গাছে স্প্রে করতে হবে।

iv) বিষটোপ ব্যবহার করেও এই মাছি পোকা দমন করা যায়।

১.৩.১১ ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: ডালিম গাছে ৪ বছর বয়স থেকেই অল্প অল্প ফল আসে এবং ৮-১০ বছর বয়সী গাছে প্রচুর ফল আসে। তবে কলমের গাছে ২ বছর পর থেকেই ফল আসে। ফলের খোসার বর্ণ হলদে বাদামী হলেই ফল সংগ্রহ করতে হয়। একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে বছরে ৮০-১০০ টি ফল পাওয়া যায়। তবে ভালভাবে পরিচর্যা নিলে ২০০-২৫০ টি ফল পাওয়া যেতে পারে।

১.৩ আমলকি (Aonla/ Indian gooseberry)

আমলকিকে বাংলাদেশের একটি অবহেলিত মূল্যবান ফল হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। সুদৃশ্য ফল হিসেবে আমলকি আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত। এটি খেতে কষ স্বাদের হলেও খাওয়ার পর পানি খেলে মুখ মিষ্টি লাগে। এই রহস্যময় ব্যাপারটির জন্যই আমলকির ব্যাপক পরিচিতি। আমলকি মাঝারি ধরণের পত্রঝরা বৃক্ষ, ৩-৪ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। হালকা সবুজ রঙের ছোট ছোট পুরুষ ও স্ত্রী ফুল একই গাছে ধরে, তবে স্ত্রী ফুলের তুলনায় পুরুষ ফুলের সংখ্যা অনেক বেশী হয়। ফলের রং হালকা সবুজ বা হলুদ এবং আকৃতি গোল। এটি সকলের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে এবং খুবই পুষ্টিকর। প্রতি ১০০ গ্রাম টাটকা আমলকিতে গড়ে ৭০০-১৬০০ মি. গ্রা. ভিটামিন-সি থাকায় এটি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম ফল হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার দাবি রাখে।

১.৩.১ আমলকির উৎপত্তি: সম্ভবত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে যে কোন দেশ এর আদি জন্মস্থান।

১.৩.২ চাষের জলবায়ু: আমলকি একটি কষ্টসহিষ্ণু উদ্ভিদ, তাই নিরক্ষীয় ও অবনিরক্ষীয় উভয় এলাকায় এর চাষ। এটি আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু পছন্দ করে।

১.৩.৩ জমি ও মাটি নির্বাচন: আমলকির চাষ প্রায় সর্বত্রই করা যায়। তবে জমিতে যেন জলাবদ্ধতা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তাই উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। আমলকি চাষের জন্য দরকার বেলে দোআঁশ মাটি। বেলে দোআঁশ মাটি না পাওয়া গেলে বাগানের মাটির সাথে বালি মিশিয়ে ও মাটি তৈরি করা যায়। আমলকি চাষের জন্য প্রায় এক মাস আগে থেকে মাটি তৈরি করে রাখতে হবে। বেলে দোআঁশ মাটির সাথে গোবর পার মিশিয়ে মাটি তৈরি করে রাখতে হবে।

১.৩.৪ লে আউট তৈরি: জমি সমতল করে নিতে হবে। সমতল জমিতে বর্গাকারে বা আয়তাকার বা ত্রিভুজাকার পদ্ধতিতে চারা রোপণ করতে হবে। জমি যদি উঁচু নিচু হয় বা পাহাড়ি জমি হয় তাহলে কন্টুর বা ধাপ চাষ পদ্ধতিতে চারা রোপণ করতে হবে।

১.৩.৫ গর্ত তৈরি: চারা রোপণ করার ১৫-২০ দিন আগে ১০ মিটার দূরে দূরে ১×১×১ মিটার আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের মাটির সাথে ভালো করে সার মিশিয়ে দিতে হবে।

১.৩.৬ সার প্রয়োগ: গোবর সার বা জৈব সার ১০-১৫ কেজি টিএসপি সার ৫০০ গ্রাম এমওপি সার ২৫০ গ্রাম ও জিপসাম সার ২০০ গ্রাম ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে দিতে হবে। প্রয়োজনে জল সেচ দিতে হবে।

১.৩.৭ চারা/ কলম বংশ বিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন: বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন কলমের মাধ্যমে যেমন চোখ কলম ও শিকড়ের মাধ্যমে বংশবিস্তার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রায় সব নার্সারীতেই আমলকির চারা পাওয়া যায়। এ গাছ কেটে ফেললে আবার কাটা স্থান থেকে কুশি জন্মায় এবং ক্রমে তা পূর্ণাঙ্গ গাছে পরিণত হয়।

১.৩.৮ চারা/ কলম সংগ্রহ ও রোপণ

বীজ সংগ্রহ: আমলকি গাছে মার্চ-মে মাসে ছোট ছোট হলুদাভ ফুল দেখা গেলেও ফল পাকে নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী মাসে। প্রতিটি ফলে ৫-৬টি প্রকোষ্ঠ থাকে এবং প্রতি প্রকোষ্ঠে একটি করে বীজ থাকে। ফলের মাংসল অংশ খেয়ে শক্ত আবরণসহ বীজ রোদে শুকালে ফেটে বীজ বের হয়। আমলকির বীজ নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী মাসে সংগ্রহ করতে হবে। প্রতি কেজিতে ৪০০০-৫০০০টি বীজ পাওয়া যাবে।

চারা তৈরি: ১। বীজ থেকে তৈরি করা চারা খুব ভালো হয় কিন্তু বীজ থেকে তৈরি চারা গাছে ফল আসতে দেরি হয়। বীজতলা ভালো ভাবে তৈরি করতে হয় এবং সাধারনত গ্রীষ্মকালে বীজ বুনতে হয়।

২। বীজ সংগ্রহের সাথে সাথে বীজ মাটিতে বা সীড বেড়ে/বীজতলায় বপন করতে হয়।

৩। বীজ বোনার আগে ঠান্ডা পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে তারপর বীজ বুনতে হবে। বীজ মাটিতে বোনার ১৫ দিন পর বীজ গজাতে শুরু করে। তবে অঙ্কুরোদগম হার মাত্র ৪০ ভাগ।

৪। এক্ষেত্রে বীজ ৮০ডিগ্রী সে. তাপে ৫ মিনিট ভিজিয়ে রেখে বপন করলে ১০ দিনে বীজ গজাতে শুরু করে এবং অঙ্কুরোদগমের হার হয় শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত।

৫। বীজতলা যদি আগাছা মুক্ত থাকে তাহলে তিন মাসের মধ্যেই চারা উপযুক্ত হয়ে যাবে এবং মূল জমিতে রোপন করা যাবে।

৬। তবে বর্ষার প্রথম দিকে চারা তৈরি করে তা বীজতলায় রেখে বড় করে নিতে হবে তারপর পরের বর্ষাকালে তা রোপন করা ভালো।

৭। এছাড়া পলিথিন ব্যাগে জৈব সার যুক্ত মাটি দিয়ে তাতেও চারা তৈরি করা যায়।

৮। গাছের শিকড় থেকে অনেক সময় চারা গাছ বের হয়। সেই চারাগাছ কে প্রধান শিকড় থেকে আলাদা করে সরাসরি মূল জমিতে লাগানো যায়।

রোপনের সময়

বর্ষাকালের শুরুতে অর্থাৎ বৈশাখ মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে চারা রোপন করার উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষাকালের শেষের দিকে অর্থাৎ ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে ও চারা রোপন করা যায়। বর্ষার মাঝামাঝি সময়ে রোপন না করা ভালো।

২০২৪

চারা রোপন: গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। বাছাই কৃত চারাটি সোজাভাবে গর্তে দিয়ে চারদিকে থেকে গোড়ায় মাটি চেপে দিতে হবে।চারার গোড়া যেন সোজা থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে । প্রয়োজনে চারার সাথে বাঁশের খুটি ও বেড়া দিতে হবে। এবং সেচ দিতে হবে।

১.৩.৯ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সার প্রয়োগ: গুনগত মান সম্পন্ন ফলন পেতে হলে গাছে প্রয়োজনীয় সার প্রদান করতে হবে।

- ১-২ বছর বয়সী গাছের জন্য জৈব সার ৫- ১০ কেজি, ইউরিয়া ২০০ গ্রাম, টিএসপি ১০০ গ্রাম এমওপি ১০০ গ্রাম জিপসাম ৫০ গ্রাম দিতে হবে ।
- ৩-৫ বছর বয়সী গাছের জন্য জৈব সার ১০-১৫ কেজি ইউরিয়া ৩০০-৫০০ গ্রাম, টিএসপি ২০০-৩০০ গ্রাম, এমওপি ২০০-৩০০ গ্রাম জিপসাম ১০০ গ্রাম দিতে হবে ।
- গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমান বাড়বে।

আগাছা দমন: আমলকি চাষে জমি সবসময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়ায় বা আশে পাশে যেন আগাছা জন্মাতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে বর্ষাকালের শুরু ও শেষ দিকে জমি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: আমলকির চারা রোপন করার সময় প্রথমদিকে ভালোভাবে সেচ দেওয়া দরকার হয়। শুকনা মৌসুমে সেচ দিতে হবে। জমিতে অতিরিক্ত পানি যেন জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে নালা তৈরি করে দিতে হবে।

ডাল ছাটাইকরণ: গাছকে একটি সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য ডাল ছাটাই করা প্রয়োজন। গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত ডালপালা ছাটাই করে দিতে হবে। গাছে যদি মরা ডাল পাতা জন্মে থাকে এবং দুর্বল ডালপাতা থাকে তাহলে তা ছাটাই করে দিতে হবে।

১.৩.১০ ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

- আমলকী গাছ লাগানোর ৪/৫বছরের মধ্যে তা ফলবান হয়। তবে পরিপূর্ণভাবে ফলবান হতে ৭/৮ বছর লাগে।
- ফল পরিপক্ক হলে তা সংগ্রহ করতে হবে। ফল পাড়ার সময় ঝাঁকুনি দিয়ে পাড়া যাবে না তাতে ফল মাটিতে পড়ে নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে।
- তবে গাছের নিচে জাল ধরে তারপর তা পাড়া যেতে পারে। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে প্রায় ৫০-৬০ কেজি ফল পাওয়া যায়। এক কেজিতে সাধারণত ২০০-২২০টি আমলকী পাওয়া যায়।
- একটি মাঝরি আকারের আমলকি গাছের ফল বিক্রি করে বছরে ৭/৮শ টাকা আয় করা সম্ভব।

১.৪ বাতাবিলেবু (Pomelo)

বাতাবিলেবু বা জাম্বুরা এক প্রকার লেবু জাতীয় টক-মিষ্টি ফল। এটি ভিটামিন সি জাতীয় জনপ্রিয় একটি ফল। বাজারে এর চাহিদাও প্রচুর। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কাঁচা ফলের বাইরের রঙ সবুজ এবং পাকলে হালকা সবুজাভ বা হলুদ রঙের হয়। এর ভেতরের কোয়াগুলো সাদা বা গোলাপি রঙের। লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে আকারে এটি সবচেয়ে বড়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক দৈনিক গড়ে ৫০ গ্রাম বাতাবিলেবু খেলেই প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি এর অভাব পূরণ হয়।

১.৪.১ উৎপত্তি: এর আদিভূমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

১.৪.২ চাষের জলবায়ু: বাতাবিলেবু আসলে একটি উষ্ণমন্ডলীয় সাইট্রাস বা লেবু জাতীয় ফল। বাংলাদেশের জলবায়ু বাতাবিলেবু চাষের জন্য খুব উপযোগী।

১.৪.৩ জমি ও মাটি নির্বাচন: সাধারনত উঁচু ও মধ্যম উঁচু জমি বাতাবি লেবু চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। জমির মাটি সমতল করে আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর গর্ত তৈরি করতে হবে। বাতাবিলেবু চাষের জন্য হালকা দোআঁশ মাটি অথবা পলি দোআঁশ যুক্ত মাটি বিশেষ উপযোগী। জমি সুনিষ্কাশিত হতে হবে। বাতাবি লেবু চাষের মাটি জৈবপদার্থ যুক্ত হতে হবে। তবে সাধারণত মধ্যম অম্লীয় মাটিতে এটি ভালো জন্মে।

১.৪.৪ লে আউট তৈরি: বর্গাকারে বা আয়তাকার পদ্ধতিতে চারা রোপণ করতে হবে। এছাড়া পাহাড়ি জমিতে যদি চারা বা কলম রোপন করা হয় তাহলে কন্টুর বা ধাপ চাষ পদ্ধতিতে রোপন করতে হবে।

১.৪.৫ গর্ত তৈরি: চারা বা কলম রোপন করার জন্য ১৫-২০ দিন আগে ৬×৬ মিটার দূরে ৬০×৬০×৬০ সেমি আকারের গর্ত তৈরি করে কিছুদিন খোলা অবস্থায় রাখতে হবে যাতে প্রচুর সূর্যালোক পড়ে।

১.৪.৬ গর্তে সার প্রয়োগ: গর্ত তৈরি করার পর গর্তে সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি গর্তে জৈব সার বা গোবর সার দিতে হবে ১০-১৫ কেজি, টিএসপি সার দিতে হবে ২৫০ গ্রাম, এমওপি দিতে হবে ২৫০ গ্রাম।সার গুলো মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে তারপর গর্ত ভরাট করে দিতে হবে।

১.৪.৭ জাত পরিচিতি: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট বারি বাতাবি লেবু-১, বারি বাতাবি লেবু-২, বারি বাতাবি লেবু-৩ ও বারি বাতাবি লেবু-৪ উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে।

চিত্র:বাতাবিলেবু (থাই)

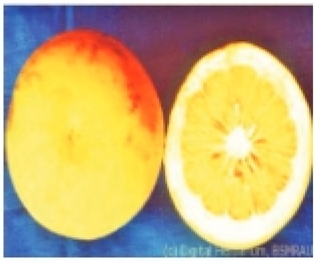

চিত্র: বারি বাতাবিলেবু-১

চিত্র: বারি বাতাবিলেবু-২

১.৪.৮ চারা/কলম ও বংশ বিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন: বাতাবিলেবুর বংশবিস্তার সাধারনত কলমের সাহায্যে হয়ে থাকে। গুটি কলম, চোখ কলম, জোড় কলম এর সাহায্যে চারা তৈরি করা হয়ে থাকে।বাতাবিলেবুর গ্রাফটিং এর জন্য সাধারনত ৮-১০ মাস বয়সী চারা আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।রোপণের জন্য যে চারা বা কলম বাছাই করা হবে সেটি যেন সোজা হয় ও দ্রুত বৃদ্ধি সম্পন্ন হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১.৪.৯ চারা/ কলম সংগ্রহ ও রোপণ: গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পরে চারা/ কলম গর্তের মাঝ বরাবর সোজা করে রোপণ করতে হবে। রোপণের পর খুঁটি দিয়ে বেধে দিতে হবে।বাতাবি লেবুর চারা রোপন করার জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত উপযুক্ত সময়।

১.৪.১০ অন্তর্বতীকালীন পরিচর্যা

সার ব্যবস্থাপনা: গাছের বয়স অনুযায়ী সারের পরিমান ভিন্ন হবে। সার প্রয়োগ করার সময় মাটিতে রস না থাকলে পানি সেচ দিতে হবে। বাতাবিলেবু চাষে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়বে। সার একেবারে গাছের গোড়ায় না দিয়ে যতদূর পর্যন্ত ভালোভাবে গাছের ডালপালা বিস্তার লাভ করেছে সে এলাকার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। উল্লেখিত সার সমান তিন কিস্তিতে মধ্য মাঘ থেকে মধ্য ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি), মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ (মে) ও মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক (অক্টোবর) মাসে প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	গাছের বয়স			
	১-২বছর	৩-৪বছর	৫-১০ বছর	১০ বছর এর উর্ধ্বে
গোবর সার (কেজি)	৭-১০	১০-১৫	২০-২৫	২৫-৩০
ইউরিয়াসার (গ্রাম)	১৭৫-২২৫	২৭০-৩০০	৫০০-৬০০	৬০০-৭০০
টিএসপি(গ্রাম)	৮০-৯০	১৪০-১৭০	৪০০-৪৫০	৪৫০-৫০০
এমওপি(গ্রাম)	১৪০-১৬০	৪০০-৫০০	৫০০-৫৫০	৬০০-৬৮০

আগাছা দমন: গাছের গোড়ায় যেন আগাছা না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আগাছা নিয়মিত পরিষ্কার করে দিতে হবে। আগাছা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধা দেয় এবং গাছের পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে। চারা রোপন করার প্রথম কয়দিন গাছের গোড়ার মাটি ঝুরঝুরে রাখা উচিত।এতে চারার বৃদ্ধি দ্রুত হয়। আবার সেচ

দেওয়ার পর মাটিতে জো এলে মাটি হালকা ভাবে কুপিয়ে মাটির দলা ভেঙে দিতে হবে।তাতে মাটির পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আর গাছ সহজে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে ।

সেচ ব্যবস্থাপনা: বাতাবিলেবু গাছে ফুল আসা ও ফল ধরার সময় পানির অভাব দেখা দিতে পারে। পানির অভাব হলে ফল ঝরে পড়ে যায়।তাই জমিতে প্রয়োজনীয় পানি সেচ দিতে হবে।চারা লাগানোর সময়, সার দেওয়ার পরে এবং শুকনা মৌসুমে ১০-১৫ দিন পর পর পানি সেচ দিতে হবে। বাতাবিলেবুর চারা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই গাছের গোড়ায় যেন জল জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে নালা তৈরি করে দিতে হবে যেন অতিরিক্ত জল বের হয়ে যেতে পারে।

পোকামাকড় ও রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

রোগসমূহ

১) গামোসিস: বাতাবিলেবু গাছে একটি মারাত্নক রোগ হচ্ছে গামোসিস। আক্রান্ত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই এ রোগ গাছের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে গাছের অংশবিশেষ অথবা সমপুর্ণ গাছটি মরে যায়।

রোগের লক্ষণ: এ রোগের আক্রমণে আক্রান্ত অংশের বাকল থেকে প্রচুর আঠা নির্গত হয়। রোগাক্রান্ত কাণ্ড ও বাকল বাদামি রঙের হয়ে যায় ও আঠা ফোঁটা আকারে বের হতে থাকে। আক্রান্ত অংশে ১-৩ মিলিমিটার চওড়া ফাটল দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা: এ রোগে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত শাখা কেটে ফেলতে হবে অথবা আক্রান্ত অংশ চেঁছে ফেলে গাছে বর্দোপেস্ট লাগাতে হবে পেস্টের মতো করে। জমি অতিরিক্ত ভেজা থাকা যাবে না। গাছকে সবসময় সবল ও সতেজ রাখতে হবে। স্যাঁতসেঁতে মাটি, অতিরিক্ত সেচ এবং জলাবদ্ধতা পরিহার করতে হবে। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা ও সেচের পানি গাছের কাণ্ড স্পর্শ করা থেকে বিরত রাখা ভালো।

২) ডাইব্যাক: এ রোগের প্রধান লক্ষণ হলো গাছে ধীরে ধীরে সজিবতা হারায়, ফলন কমে যায়, গাছের পাতা ও ডগা শুকিয়ে নিচের দিকে নামে এবং পরবর্তীতে গাছ মারা যায়।

দমন ব্যবস্থা: এ রোগ দমনের জন্য রোগ প্রতিরোধী জাত আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। মাটি সুনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। সুষম সার ব্যবহার ও পানি সেচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সুস্থ ও সবল গাছ রোপণ করতে হবে। আক্রান্ত শাখা বা ডাল কেটে ফেলা এবং কর্তিত অংশে বর্দোপেস্ট লাগানো ভালো। আক্রান্ত অংশে ডাইথেন এম-৪৫ (০.২%) এবং বর্দোমিশ্রণ (১%) সেপ্র করতে হবে।

পোকমাকড়

১) পাতার ছোট সুড়ঙ্গ পোকা/ লিফ মাইনর: এ পোকার ক্ষুদ্র কীড়াগুলো পাতার উপত্বকের ঠিক নিচে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ করে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। এতে পাতা কুঁকড়ে বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে ঝরে যায়।

দমন ব্যবস্থা: গাছে নতুন পাতা গজানোর সময় রগর বা পারফেকথিয়িন ৪০ ইসি ২ মিলিলিটার হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর সেপ্র করতে হবে। নতুন পাতা গজানোর সময় ম্যালাথিয়িন বা সুমিথিয়িন ১ মিলিলিটার হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার সেপ্র করতে হয়।

১৫.৪.১১ ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: ফল পরিপক্ক হলে ফলের উপরিভাগ খসখসে থেকে কিছুটা পরিবর্তন হয়ে তেলতেলে ভাব হয় ও ফল কিছুটা হলুদ রঙ ধারন করে। এ অবস্থায় ফল সংগ্রহ করতে হবে।ফল

কিছুটা হলদে বর্ণ ধারণ করলে ভাদ্রের প্রথম থেকে মধ্য আশ্বিন পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।সঠিক ভাবে চাষ করতে পারলে একটি বাতাবিলেবু গাছ থেকে প্রায় ৫০-৫৫ টি ফল সংগ্রহ করা যায়।

১.৫ তাল (Palm)

তাল বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অপ্রচলিত ফল। একক লম্বা কান্ড ও তার আগায় সুন্দরভাবে এক গুচ্ছ পাতার সমারোহে সুশোভিত তাল গাছ দেখতে অপূর্ব লাগে। নারিকেল, খেজুর, সুপারির মতো তাল একই 'পামেসী' পরিবারভুক্ত। বয়স্ক গাছ ৬০-৮০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছের আগায় ৩৫-৫০টা শক্ত পাতা থাকে। পাতার আগা সূচালো হওয়ায় বজ্রপাত রোধক গাছ হিসেবে এ ফলের আবাদ অতি জনপ্রিয়। একই কারণে বজ্রপাতের কবল থেকে প্রাণিকুলকে রক্ষা করার জন্য ও গাছের বহুবিধ ব্যবহার সুবিধাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে তাল ফল সম্প্রসারণে অনেক দেশেই প্রাধান্য দেয়া হয়। একই গুরুত্বে বাংলাদেশ সরকার তাল চারা রোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

পুষ্টিগুণ: তাল অতি পুষ্টিকর ও ঔষধিগুণ সমৃদ্ধ। সব ধরনের ফলে দেহের জন্য উপযোগী বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও মিনারেলস সমৃদ্ধ হলেও তালে এর বহির্ভূত কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। অন্য ফলের তুলনায় এ ফলে ক্যালসিয়াম, লৌহ, আঁশ ও ক্যালোরির উপস্থিতি অনেক বেশি। বয়স্কদের জন্য এ ফলের উৎস থেকে সহজেই হজমযোগ্য পর্যাপ্ত আঁশ প্রাপ্তিতে অতি গুরুত্ব বহন করে। আখের গুড়ের চেয়ে তালের গুড়ে প্রোটিন,ফ্যাট ও খনিজের উপস্থিতি বেশি। পাকা তালের খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে জলীয় অংশ ৭৭.২ গ্রাম, খনিজ ০.৭ গ্রাম, আঁশ ০.৫ গ্রাম, আমিষ ০.৭ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম শর্করা ২০.৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৯ মিলিগ্রাম ও খাদ্য শক্তি ৮৭ কিলোক্যালরী রয়েছে।

তালের ব্যবহার: তালের রস বিভিন্ন প্রকার পিঠা, মিছরি ও গুড় তৈরীতে ব্যবহার হয়। সদ্য আহরিত তালের রস সুস্বাদু পানীয়। তালগাছের পাতা ও আঁশ পাখা ও অন্যান্য কুটির শিল্পজাত দ্রব্য তৈরীর জন্য ব্যবহার করা যায়। বয়স্ক তালগাছ থেকে উৎকৃষ্ট মানের কাঠ পাওয়া যায় যা গৃহ নির্মাণ ও সৌখিন দ্রব্য প্রস্তত করা জন্য ব্যবহার করা হয়। পাকা তালের রস কনফেকশনারীতে শুকনো খাবার প্রস্ততকরণের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১.৫.১ উৎপত্তি: তালের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ।

১.৫.২ চাষের জলবায়ু: প্রাচীনতম এ ফল উষ্ণ ও অব উষ্ণ আবহাওয়ায় ভাল জন্মে।

১.৫.৩ উৎপাদন পদ্ধতি

জমি ও মাটি নির্বাচন: প্রায় সব ধরনের মাটিতেই তাল ফসলের আবাদ করা যায়। তবে উঁচু জমিতে এবং ভারী মাটি এর চাষের জন্য বেশী উপযোগী। এদেশে বাগান আকারে কোন তাল ফসলের আবাদ নেই। বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছা মুক্ত করে নিতে হবে।

লে আউট তৈরি: অন্য ফলের মতো বাগান আকারে তালের চাষ প্রচলন এদেশে নেই। তবে সমতল ভূমিতে তালের বীজ সাধারনত বর্গাকার বা ষড়ভূজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। তবে উঁচু নিচু পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর প্রনালী লাগানো যেতে পারে।

গর্ত তৈরি: প্রতিটা গাছের দূরত্ব নির্ধারণ করে নিয়ে ২X২X২ ফুট মাপের গর্ত তৈরি করে সার মাটি দিয়ে পুনরায় তা ভরাট করে বীজ/চারা রোপণ করা উচিত।

গর্তে সার প্রয়োগ: রোপণের আগে প্রতিটা গর্তে ১০-১৫ কেজি গোবর এবং ২৫০ গ্রাম করে টিএসপি ও এমওপি সার মিলে মোট ৫০০ গ্রাম গর্তের মাটির সাথে ভালোভাবে মেশানো প্রয়োজন। গোবর সার প্রাপ্তি সুবিধা না থাকলে নিকটস্থ জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করলেও রোপিত বীজ/চারা বাড়তে সহায়ক হবে। গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে বীজ বপন করতে হবে।

জাত নির্বাচন: দেশ-বিদেশে তালের কোনো সুনির্দিষ্ট জাত দেখা যায় না। তাল ফলের আকার, রঙ ও ফল ধরার অবস্থা বিবেচনায় স্থানীয়ভাবে জাতের বিভিন্ন নামকরণ হয়। পাকা তালের রঙ হালকা বাদামি, গাঢ় হলুদ এবং কালো হতে পারে। এছাড়া কিছু বারোমাসি জাতের তাল গাছ দেখা যায়। যেহেতু খেজুর ও লটকনের মতো তাল গাছের পুরুষ ও স্ত্রী গাছ আলাদাভাবে জন্মে। এজন্য টিস্যু কালচার বা অনুরূপ ব্যবস্থায় বংশবিস্তার ব্যবস্থা ছাড়া বীজ থেকে প্রাপ্ত চারায় জাতের বৈশিষ্ট্যতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

চিত্র: তালের বিভিন্ন জাত

চারা/ কলম বংশবিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন: বীজের মাধ্যমে তালের বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। দুই ভাবে তাল গাছ লাগানো যায়। একটি পদ্ধতি হলো সরাসরি বীজ বপন করে অথবা বীজতলায় চারা উৎপাদন করে চারা রোপনের মাধ্যমে এর আবাদ করা যায়। পাকা তাল বা বীজ কোনভাবে জমিতে, রাস্তা, পুকুর বা দিঘির পাড়ে পড়ে থাকলে তা থেকেই নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। যেহেতু বীজ গজিয়ে চারা তৈরি করে তা থেকে ফল পেতে ১০-১২ বছর সময় লেগে যায়, এজন্য অন্য ফলের মতো বসতবাড়িতে বা বাগান আকারে তাল গাছ রোপণে কারো আগ্রহ দেখা যায় না। তবে রাস্তা, বাঁধের ধার, চিংড়ির ঘের, রেললাইনের পাশে ও অন্য কমিউনিটি স্থানে বৃক্ষ রোপণে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহ ও নির্বাচন: চারা তৈরির জন্য প্রথমে ভালো উন্নত মানের বেশি ফলদানে সক্ষম এমন মাতৃগাছ নির্বাচন করে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিত। পাকা ফল সংগ্রহের দুই সপ্তাহের মধ্যে রোপণ করা উচিত। ২০২৪

অন্যথায় বীজ শুকিয়ে গেলে তা থেকে চারা গজায় না। অসময়ে তাল প্রাপ্তির প্রয়োজনে বারোমাসি জাতের গাছ থেকে তাল বীজ সংগ্রহ করা উত্তম। আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত তাল পাকে। এ সময় তাল বীজ বেশি সংগ্রহ সুবিধা রয়েছে। তবে বারোমাসি জাতের তালের বীজ এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে সংগ্রহ করে সরাসরি বীজ রোপণ অথবা জুলাই-আগস্ট মাসের মধ্যে তৈরি চারা রোপণ করা বেশি উপযোগী। বিশেষ করে হাওর অঞ্চলে চারা রোপণের ক্ষেত্রে আগাম চারা তৈরি করে নিয়ে হাওরের কিনারের অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি থেকে পানি নেমে গেলে সেসব স্থানে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চারা রোপণ কাজ শেষ করা উত্তম।

বীজ বপনের দূরত্ব: সারি থেকে সারি ৭ মিটার এবং চারা থেকে চারা ৭ মিটার।

বীজতলা তৈরী ও চারা উৎপাদন: প্রায় ১০ ফুট লম্বা এবং ৩ ফুট চওড়া বীজতলায় এক হাজার তালের আঁটি বা বীজ বসানো যায়। বীজ থেকে চারা গজানোর সময় শিকড় দ্রুত মাটির নিচে প্রবেশ করে এবং তা উঠিয়ে পলিব্যাগে সংরক্ষণ করা কষ্টকর হয়। এ অবস্থায় মাটি থেকে চারা উঠালে অধিকাংশ চারা মারা যেতে পারে। এজন্য বীজ তলার নিচের অংশে পাতলা টিনের শিট বা পুরু পলিথিন বিছিয়ে অথবা তলার এ অংশ ২-৩ ইঞ্চি পুরু করে সিমেন্ট বালি খোয়া দিয়ে ঢালাই করে নিয়ে তা তালের চারা তৈরির কাজে ব্যবহার করলে সুবিধা হয়, তাতে শিকড় মাটির ভেতরে প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয়। এতে গজানো আঁটি সহজেই উঠিয়ে পলিব্যাগে সংরক্ষণ উপযোগী হয়। বীজতলা তৈরিকালে নিচের অংশ কম্পোস্ট/পচা গোবর ও ছাই মিশ্রিত বেলে-দো-আঁশ মাটি দিয়ে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ ভরাট করে তাতে সারি করে বীজ বসাতে হয়। বীজগুলো বসানো হলে মোটা বালু ও মাটির মিশ্রণ দিয়ে প্রায় ১ ইঞ্চি (২-৩ সেমি) পুরু করে বসানো বীজের উপরিভাগ ঢেকে দিতে হয়।

চারা পলিব্যাগে স্থানান্তর ও নার্সারীতে পরিচর্যা: বীজতলার মাটিতে নিয়মিত হালকা পানি সেচ দিয়ে ভেজাতে হয়। বীজ বপনের ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হওয়া শুরু হবে। গজানো বীজ থেকে মোটা শিকড়ের মতো নরম, আগা কিছুটা সুচালো এক প্রকার টিউব তৈরি হয়। এ টিউবের মধ্যে শিকড় ও সুপ্ত পাতা একই সঙ্গে বড় হয়ে ৮-১০ সপ্তাহের মধ্যে গজানো পাতা প্রায় ১৫-৩৫ সেমি লম্বা হয়। পাতা বের হওয়া শুরু হলে টিউবের আবরণ শুকিয়ে বা পচে ভেতরের পাতা ও শিকড় আলাদাভাবে বড় হওয়া শুরু করে। এ সময় চারাগুলো আঁটিসহ উঠিয়ে পুরু শক্ত ২৫ X ২৫ ইঞ্চি মাপের পলিব্যাগে অথবা পরিত্যক্ত সিমেন্টের বস্তা দিয়ে তৈরি ব্যাগে ভালো মানের পটিং মিডিয়া (বেলে দো-আঁশ মাটি ৫০%, জৈব পদার্থ ৪০% এবং ১০% কেকোডাস্ট বা কাঠের গুঁড়া) ব্যবহার করে তা সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেয়া হয়। অনেক সময় তৈরি নতুন চারার শিকড় বেশি বড় হয়, এ ক্ষেত্রে ব্যাগিং করার সময় কাজের সুবিধার্থে গাজানো শিকড় ১০-১৫ সেমি রেখে অবশিষ্ট অংশ সিকেচার বা ধারালো চাকু দিয়ে কেটে ফেলা উত্তম হবে। চারা ব্যাগিং করার প্রথম ২-৩ সপ্তাহ হালকা ছায়া দেয়ার ব্যবস্থা করা ভালো।

১.৫.৯ বীজ/ চারা/ কলম সংগ্রহ ও রোপণ: চারা তৈরি, সংরক্ষণ, পরিবহন ও তা রোপণ কাজ অনেক ঝামেলা/ কষ্টকর ও ব্যয় বহুল। এজন্য বেশি পরিমাণে তাল সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সরাসরি জমিতে বীজ রোপণ করা সহজতর। বিদ্যুৎ লাইনের অবস্থান বিবেচনায় এনে তাল বীজ/চারা রোপণ ব্যবস্থা নিতে হয়। দু'এক সারি তাল বীজ/চারা রোপণের জন্য ৪-৫ মিটার দূরত্ব দিলেই চলে।

মাঠে চারা রোপণ: মৌসুমী বৃষ্টিপাত আরম্ভ হওয়ার পরপরই পলিব্যাগে উত্তোলিত ৩০-৩৫ সে. মি. লম্বা পাতা বিশিষ্ট চারা মাঠে রোপন করা উচিত। তবে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে আর্দ্রতা থাকলে অথবা পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে চারা এপ্রিল- মে মাস পর্যন্ত লাগানো যেতে পারে। চারা লাগানোর নির্দিষ্ট স্থানে পলিব্যাগের আকৃতি অনুসারে গর্ত করে পলিথিন ছিড়ে পলিব্যাগের মাটিসহ চারা গর্তে বসাতে হবে। গুড়ো মাটি দিয়ে গর্তের ফাঁক ভরাটসহ ভালভাবে চারার গোড়ার মাটি চেপে দিতে হবে। চারাগুলো আগাছমুক্ত রাখা ও গবাদি পশুর উপদ্রব থেকে রক্ষার ব্যবস্থা দিতে হবে। চারা রোপণের পর অন্তত প্রথম তিন বছর রোগ- বালাই ও কীট -পতঙ্গের আক্রমণের হাত হতে চারা রক্ষা করা আবশ্যক।

১.৫.১০ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: তাল বীজ/ চারা রোপণের পর খুব একটা যত্ন নেয়া হয় না। তবে দু'এক মাসের ব্যবধানে গাছের গোড়া আগাছামুক্ত রাখার প্রয়োজন হয়। খরা মৌসুমে গাছের গোড়ায় ৩-৫ সেমি দূর পর্যন্ত স্থানের মাটি আগলা করে দিয়ে কচুরিপানা/খড়কুটা অথবা স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য অনুরূপ দ্রবাদি দিয়ে ঢেকে মালচিং ব্যবস্থা নেয়া ভালো। পরবর্তীতে এ মালচিং দ্রবাদি পচে জৈব সার হিসেবে গাছের উপকারে আসবে। তাতে মাটিতে রস সংরক্ষিত থাকবে, আগাছা সহজেই দমন হবে। খরা মৌসুমে পানি সেচ এবং বর্ষাকালে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ: তাল গাছে সার প্রয়োগ করার প্রচলন এদেশে নেই। তবে রোপিত গাছে প্রথম বছর পচা গোবর-১০ কেজি, ইউরিয়া-৩০০ গ্রাম, টিএসপি-২৫০ গ্রাম এবং এমওপি-২০০ গ্রাম হারে সার প্রয়োগ করা হলে গাছ ভালোভাবে বাড়বে, ফলন বেশি দিবে। এ সারের অর্ধেক পরিমাণ বর্ষার আগে এবং বাকি অর্ধেক সার বর্ষা শেষে বছরে দুইবার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তাল গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতি বছর ১০% হারে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং এ প্রবৃদ্ধি ৭-৮ বছর পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে। এরপর প্রতিটা বয়স্ক গাছের জন্য পচা গোবর-২০ কেজি, ইউরিয়া-১ কেজি, টিএসপি-৯০০ গ্রাম এবং এমওপি-৮০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করার প্রয়োজন হবে।

ট্রেনিং/প্রুনিং: নারিকেল, সুপারি, বোটল পাম এ সব গাছের বয়স্ক পাতা হলুদ হয়ে নিজে থেকেই ঝরে পড়ে। তবে একই পরিবারভুক্ত হলেও তাল-খেজুর গাছের বয়স্ক পাতা প্রাকৃতিক ভাবে ঝরে পড়েনা। এজন্য নিচের দিকে ঝুলে থাকা বয়স্ক পাতাগুলো কান্ড বরাবর ধারালো দা দিয়ে সময়মত ছেঁটে ফেলা জরুরী। এছাড়াও ফলন্ত গাছের ফলের কাঁদির ও পুরুষ গাছের ফুলের বয়স্ক ছড়া ছেঁটে পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন।

পোকামাকড় ও রোগবালাই: অন্য ফল গাছের তুলনায় তাল গাছে পোকামাকড়ের উপদ্রব কম। এছাড়া অতি লম্বা গাছের আগায় পাতা, ফুল ও ফলে ছত্রাক/কীটনাশক ব্যবহার করা ততটা সহজ নয়। তথাপি রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব দেখা দিলে তা সময় মতো দমন করা উচিত।

১.৫.১১ ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : বীজ-চারা রোপণের ১০-১২ বছর পর থেকে গাছে ফুল ফল ধরা আরম্ভ করে। জানুয়ারি মাস হতে শুরু করে মার্চ মাস পর্যন্ত তাল গাছে ফুল ফুটে। তবে বারোমাসি জাতের তাল গাছে সারা বছরই কম-বেশি ফুল ফল ধরে। আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত পাকা তালের ভরা মৌসুম। মে-জুন মাস কচি তাল পাওয়ার উপযোগী সময়। প্রতিটা গাছে ২০০-৩০০টা কাঁচা পাকা তাল ধরে। সুস্থ সবল গাছে ১০-১৫টা তালের কাঁদি/ছড়া থাকে। তাল পাকা শুরু হলে ৩-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত ক্রমন্বয়ে পাকা

২০২৪

ফল পাওয়া যায়। ফল পাকলে মাটিতে ঝরে পড়ে। অনেকে পুষ্ট ফল পেড়ে ২-৫ দিন ঘরে রেখে পাকিয়ে নিয়ে বাজারজাত করে।

১.৬ নারিকেল (Coconut)

নারিকেল বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। নারিকেল, পামেসি (Palmae) পরিবারভুক্ত। নারিকেলের বৈজ্ঞানিক নাম *Cocos nucifera*। এ গাছের পাতা, ফুল, ফল, কাণ্ড, শিকড় সবকিছুই বিভিন্ন ছোট-বড় শিল্পের কাঁচামাল, মুখরোচক নানা পদের সুস্বাদু খাবার তৈরির উপকরণ, সুস্বাদু পানীয়, রোগীর পথ্য। নারিকেল কেশতেল, ভোজ্যতেল, কোকো মিল্ক, শাঁস (Copra/Carnel) দিয়ে তৈরি মোরব্বা, মোয়া, নানাভাবে তৈরি পিঠা, পায়েশ, হালুয়া সবাইকে আকৃষ্ট করে। এ পরিবারভুক্ত গাছের ডাল, শাখা, প্রশাখা নেই। কেবল কাণ্ডকে আকড়ে ধরে তা থেকে সরাসরি বের হওয়া লম্বা পাতাগুলোই জীবনধারণের জন্য এ গাছের একমাত্র অবলম্বন। সুস্থ, সবল একটা গাছে পাতার সংখ্যা ৩০-৪০টা। গাছে এ সংখ্যা ২৫ টার নিচে থাকলে ধরে নিতে হবে গাছটা খাবার ও যত্নের অভাবে বড় কষ্টে আছে। পাতার সংখ্যা ২০ টার নিচে নেমে গেলে গাছে ফুল ফল ধরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে চলে যাবে।

১.৬.১ পুষ্টিমান ও গুণাগুণ: ডাব ও নারিকেলের সব অংশই আহার উপযোগী, শাঁস (Copra/Carnel) অতি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। এতে প্রচুর পরিমাণ চর্বি, আমিষ, শর্করা, ক্যালসিয়াম, ভিটামিনস ও খনিজ লবণে ভরপুর। ডায়রিয়া, কলেরা, জন্ডিস, পাতলা দাস্ত, পানিশূন্যতা পূরণে ডাবের পানির অবদান অনন্য। ঘন ঘন বমি ও পাতলা পায়খানার কারণে শরীর দুর্বল হয়ে পড়লে এ সময় স্যালাইনের বিকল্প হিসেবে ডাক্তার বা কবিরাজরা ডাবের পানি পান অব্যাহত রাখতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অনেক ভিনদেশি, যারা এ দেশের মিনারেল পানি পানে সন্ধিহান হয়, সেখানে অবাধে তারা ডাবের পানি পেলে পরম তৃপ্তিতে তা পান করে থাকেন।

১.৬.২ উৎপত্তিস্থান: নারিকেলের আদিস্থান প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ। তবে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং ভারত নারিকেল উৎপাদনে অতি অগ্রগামী।

১.৬.৩ জাত: আমাদের দেশে বর্তমানে যে প্রচলিত নারিকেলগুলো রয়েছে তা থেকে ফলন পেতে স্বাভাবিকভাবে ৭ থেকে ৮ বছর সময় লাগে। তাই নারিকেলের ফলন যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তাই নতুন 'ডিজে সম্পূর্ণা

ডোয়ার্ফ (খাটো)’ জাতের নারিকেল আবাদের ব্যাপারে জোড় দেয়া হচ্ছে। নতুন জাতের এ নারিকেল গাছ থেকে যথাযথ পরিচর্যা করলে ২৮ মাসেই ফলন আসবে। ফলনের পরিমাণ আমাদের দেশের জাতের থেকে প্রায় তিনগুণ। উপযুক্ত পরিচর্যা করলে প্রতি বছর প্রায় ২৫০টি নারিকেল পাওয়া যায়। উন্নত এ জাতের সম্প্রসারণ করা গেলে আমাদের দেশের নারিকেলের উৎপাদন প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

বারি উদ্ভাবিত নারিকেল: বারি নারিকেল-১ এবং বারি নারিকেল-২ নামে দুটি নারিকেলের জাত অবমুক্ত করেছে। জাত দুটাই ওপি (Open pollinated) লম্বা জাত (D×T) । এ জাত দুটো উপকূলীয় এলাকার ভেতরের অংশে সম্প্রসারণ যোগ্য।

চিত্র: বারি নারিকেল-২

চিত্র: ‘ডিজে সম্পূর্ণা

১.৬.৪ জলবায়ু ও মাটি: ট্রপিক্যাল ও সাব ট্রপিক্যাল অংশে অবস্থিত দেশগুলোতে মূলত নারিকেল ভালো জন্মে। এ গাছের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া অতি উপযোগী। নারিকেলের জন্য বার্ষিক গড় ২৭০ সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেশি উপযোগী। তবে দিবা-রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য ৬-৭০ সেলসিয়াস হলে ভালো হয়। নারিকেল চাষের জন্য বৃষ্টিপাত খুব জরুরি। সারা বছর ধরে কিছু না কিছু বৃষ্টির পানি নারিকেল গাছ এর জন্য ভাল। বছরে ১০০-৩০০ সেমি. বৃষ্টিপাত নারিকেলের জন্য যথেষ্ট। উপকূলীয় উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া নারিকেল চাষে অতি উপযোগী। যে কোন ধরনের মাটিতে নারিকেল চাষ করা যায়। তবে নিকাশযুক্ত দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত।

১.৬.৫ বংশবিস্তার: বীজ থেকে চারা তৈরি করে নারিকেল এর বংশবিস্তার করা যায়। তবে টিস্যু কালচার করে ও এর বংশবিস্তার করা যায়। সাধারণের মাঝে বীজ থেকে চারা তৈরি করাই সহজ এবং জনপ্রিয়।

চারা উৎপাদন পদ্ধতি: নারিকেল চারা তৈরির জন্য যে গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হবে তার মাতৃ গুণাগুণ (Genetical potenciality) জেনে উন্নত মানের ও জাতের গাছ থেকে সুস্থ, ভালো মানের বীজ নারিকেল সংগ্রহ করে তা চারা উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যাবে। মাতৃগাছ নির্বাচন করে তা থেকে পাকা বীজ নারিকেল কিনে, বেঁলে মাটিতে রেখে মাঝে মাঝে পানি দিলে কিছু দিনের মধ্যেই চারা গজাবে। এ গজানো চারাগুলো ৮-৯ মাস পরেই লাগানোর উপযোগী হবে।

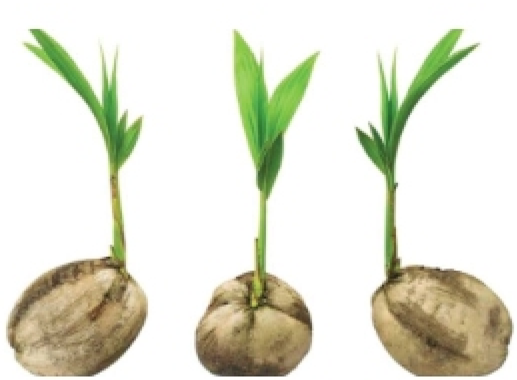

চিত্র: রোপণ উপযোগি নারিকেল চারা

রোপণের সময়: জুন-সেপ্টেম্বর।

রোপণের দূরত্ব: ৬ X ৬ মিটার হিসেবে হেক্টরপ্রতি ২৭৮টি চারা প্রয়োজন। প্রকৃত খাটো জাতের জন্য (৬ মি.×৬ মি.) দূরত্ব, আংশিক খাটো জাতের (৬ মি. ×৭ মি.), এবং লম্বা বা আমাদের দেশি উন্নত জাতের ক্ষেত্রে (৭ মি.×৭ মি.) দূরত্বে নারিকেল চারা লাগানো ভালো। চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহ আগে 'লে আউট প্লান' অনুসরণ করে নির্ধারিত স্থানে গর্ত তৈরি করে নিয়ে তাতে সার প্রয়োগ করে নেয়া উত্তম হবে।

পিট বা গর্ত তৈরি: আদর্শ মাদা বা পিটের মাপ হবে ৩ ফুট X ৩ ফুট X ৩ ফুট। গর্ত তৈরির পর প্রতি গর্তে ১৫ থেকে ২০ কেজি পচা গোবর অথবা আবর্জনা পচা সার দিতে হবে। মাটিতে অবস্থানরত পোকার আক্রমণ থেকে চারা রক্ষার জন্য প্রতি গর্তে ৫০ গ্রাম বাসুডিন প্রয়োগ করতে হবে। সবকিছু মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে দিতে হবে। ভরাটের পর পানি দিয়ে গর্তটাকে ভিজিয়ে দিতে হবে যাতে সব সার ও অন্যান্য উপাদান মাটির সঙ্গে মিশে যায় যা চারা গাছের শিকড়ের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।

জমি নির্বাচন: বর্ষার পানি জমে না থাকলে উঁচু বা মাঝারি উঁচু, বন্যামুক্ত জমিতে নারিকেল লাগানোর জন্য উত্তম। পানি জমে থাকে বা জমি স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকে এমন স্থানে নারিকেল চারা রোপণ করা ঠিক হবে না। তবে এ ধরনের নিচু (৬মি.×৭ মি.) দূরত্বে চারা লাগানোর জন্য 'লে আউট প্লান' করে নিতে হবে। এরপর দুই সারির মাঝে ৩ মিটার চওড়া এবং ৩০-৬০ সে. মিটার গভীর নালা কেটে নালার মাটি দুই ধারে উঠিয়ে উঁচু করে ৩ মিটার চওড়া উঁচু আইলে চারা রোপণের জন্য উপযোগী হবে। দুই সারির মাঝখানে অগভীর নালায় পানিতে জন্মে (কচুরলতি, পানিকচু, চিবিয়ে খাওয়া আখ) এমন ফসল আবাদ করা যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বিশেষ করে বরিশাল এলাকায় এ পদ্ধতিতে চাষ প্রচলন আছে যা সর্জান পদ্ধতি নামে সুপরিচিত।

চারা রোপণ: নির্বাচিত চারা বীজতলা থেকে লম্বা খন্তা বা শাবল দিয়ে সাবধানে যত্ন সহকারে উঠিয়ে নিতে হবে। চারা উঠানোর পর যতদূর সম্ভব এক সপ্তাহের মধ্যেই তা রোপণ কাজ শেষ করতে হবে। গর্তের মাঝখানে নারিকেল চারা এমনভাবে রোপণ করতে হবে যাতে নারিকেলের খোসা সংলগ্ন চারার গোড়ার অংশ মাটির ওপরে থাকে। চারা রোপণের সময় মাটি নিচের দিকে ভালোভাবে চাপ দিতে হবে যাতে চারাটি শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। গাছের গোড়া থেকে ৪০-৫০ সেমি. দূরে বৃত্তাকারে ভালোভাবে ১০-১৫ সেমি. উঁচু করে বাঁধ দিতে হবে।

চিত্র: নারিকেল চারা রোপণ

১.৬.৬ সার প্রয়োগ: অন্যান্য গাছের তুলনায় নারিকেল গাছে সার ও পানি সেচ, নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঠিকমতো হলে গাছের বাড়-বাড়ন্ত খুব বেশি বৃদ্ধি পায়। অন্য খাদ্যের তুলনায় এ গাছে পটাশ জাতীয় খাবারের চাহিদা তুলনামূলক বেশি (Potash loving plant) সাধারণত সুপারিশকৃত সার বছরে দু'বার (বর্ষার আগে ও পরে) সার প্রয়োগ প্রচলন আছে। চারা রোপণের ৩ মাস পর লাগানো চারার গোড়া থেকে ২০ সেমি. দূরে ২০ সেমি. চওড়া ও ১০ সেমি. গভীর করে যেসব সার প্রয়োগ করতে হবে তা হলো পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সার ১০ কেজি, ইউরিয়া ১২৫ গ্রাম, টিএসপি ১০০ গ্রাম এবং এমওপি সার ২৫০ গ্রাম। এ সারগুলো ৩ মাসের ব্যবধানে আরও দুইবার প্রয়োগ করতে হবে। তবে পরের প্রতিবার গাছের গোড়া থেকে কিছু দূরে (৫-৭) সেমি. গাছের গোড়ার চারদিকে নালা তৈরি করে একইভাবে প্রয়োগ ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগ শেষে ২ বালতি পানি দিয়ে গোড়া ভালোভাবে ভেজাতে হবে। খাটো গাছের নারিকেল সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ, পানি সেচ, পানি নিকাশ ও পরিচর্যা গ্রহণ করলে চারা রোপণের ৩-৪ বছর থেকেই ফুল-ফল ধরা আরম্ভ করবে। চতুর্থ বছরের জন্য যে সার সুপারিশ করা গেল তা পরবর্তী বছরগুলোতে প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে। চারা রোপণের পর থেকে চার বছর পর্যন্ত বছর বছর ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও বোরন ৬ মাসের ব্যবধানে বছরে দুইবার প্রয়োগ যোগ্য।

ক্রঃ নং	আইটেম	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪থ বছর ও উর্ধে
১	পচা গোবর/আবজনা পচা সার (কেজি)	৪০	২৫	২৫	৩০
২	ছাই (কেজি)	১০	১০	১০	১০
৩	মুরগি লিটার পচা (কেজি)	১৬	১৬	১৬	১৬
৪	হাড়ের গুঁড়া/শুটকি মাছের গুঁড়া (কেজি)	২	২	২	২
৫	ইউরিয়া (গ্রাম)	৬০০	১২০০	১৪০০	১৬০০
৬	টিএসপি (গ্রাম)	৩০০	৪০০	৬০০	৮০০
৭	এমওপি (গ্রাম)	৪০০	৬০০	১০০০	১৫০০
৮	ম্যাগনেশিয়াম সালফেট (গ্রাম)	১০০	১৫০	১৫০	১৫০
৯	বোরন (গ্রাম)	৫০	১০০	১০০	১০০

২০২৪

১.৬.৭ পরিচর্যা: নারিকেল বাগান বিশেষ করে গাছের গোড়ার চারধার সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। প্রথম ২ বছর গাছের গোড়া থেকে ৬০-৭০ সেমি. দুর পর্যন্ত বৃত্তাকারে চারদিকের অংশে কচুরিপানা শুকিয়ে ছোট করে কেটে ৮-১০ সেমি. পুরু করে মালচিং দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে গাছের গোড়া ঠান্ডা থাকবে, আগাছা জন্মাবে না, মাটির রস সংরক্ষিত থাকবে এবং পরবর্তীতে এগুলো পচে জৈবসার হিসাবে কাজ করবে। তবে এভাবে মালচিং দেয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন তা একেবারে গাছের গোড়াকে স্পর্শ না করে, গাছের গোড়ার অংশ কমপক্ষে ৮-১০ সেমি. ফাঁকা রাখতে হবে। মালচিং অবস্থায় অনেক সময় উঁই পোকাসহ অন্যান্য পোকা আক্রমণ করে। এ জন্য সেভিন, ইমিটাপ, রিজেন্ট, ডারসবান ইত্যাদি যে কোনো কীটনাশক দিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর স্প্রে করা হলে পোকার আবাসন ধ্বংস হবে। গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকা অথবা মাটিতে রস কমে গেলে উভয় ক্ষেত্রেই নারিকেল গাছ অত্যন্ত কষ্ট পায়। এ জন্য বর্ষাকালে গাছ যেন কোনো মতেই জলাবদ্ধতার (Water lodging) কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এজন্য ঠিকমতো নালা কেটে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া খরা মৌসুমে নারিকেল বাগানের মাটিতে যেন পরিমিত রস থাকে এ জন্য ১০-১৫ দিনের ব্যবধানে নিয়মিত সেচ দিতে হবে।

১.৬.৮ পোকামাকড় ও রোগবালাই:

১) বাড রট -কুঁড়ি পচা: এ রোগের আক্রমণে কচি পাতা প্রথমে বিবর্ণ হয়ে যায়, পরে বাদামী রং ধারণ করে। এভাবে একের পর এক ভিতর থেকে বাইরের দিকে পুরাতন পাতা আক্রান্ত হতে থাকে, কেন্দ্রস্থলের পাতাগুলোর বোটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়ে এবং মাঝ খানটা পাতা শুন্য হয়ে পড়ে। কচি নারিকেল কালো হয়ে ঝরে পড়ে বোটা থেকে পচন শুরু হয়ে ফল পচে যায়। ফলে শুরুতে বাদামী পরে কালো দাগ হয়।

প্রতিকার: বাগান ও গাছ পরিস্কার পরিছন্ন রাখা, বৎসরে দুইবার সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা। বর্ষা মৌসুম শেষে গাছের অপ্রয়োজনীয়, মৃত, অর্ধমৃত ডালপালা ছাঁটাই করে আলোবাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা। আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে পুতে ফেলা। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ম্যানকোজেব গ্রুপের রোগনাশক মিশিয়ে আক্রান্ত ফলে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

২) পাতার ব্লাইট: পাতায় হলুদ/বাদামী/মরিচা দাগ হয়, কোষগুলো মরে যায়। রোগাক্রান্ত পাতা ঝলসে যায় ও পোড়া পোড়া দেখায়। সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, গাছ দূর্বল হয়, ফলন কমে যায়। শুকনো মৌসুমে রোগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়।

চিত্র: পাতার ব্লাইট

প্রতিকার: শুকনো মৌসুমে পর্যাপ্ত সেচ দেয়া। বাগান ও গাছ পরিস্কার পরিছন্ন রাখা, বৎসরে দুইবার সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা। পরিমিত সার প্রয়োগ করলে ও যথা সময়ে সেচ এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রোগের আক্রমণ কম হয়। আক্রমণ বেশি হলে প্রোপিকেনাজল গ্রুপের রোগনাশক ১৫ দিন পরপর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

৩) গন্ডার পোকা: এ পোকা রাইনোসেরাস বিটল নারিকেলের মাইজ পাতা বের হবার আগে ভিতরে কেটে দেয় ফলে ত্রিভুজের মত নকশা করে কাটা পাতা বের হয় । পূর্ণ বয়স্ক পোকা গাছের মাথায় আক্রমণ করে ও কান্ড ছিদ্র করে ঢুকে ভিতরের কোষ কলা খেতে থাকে।

চিত্র:পুর্নাঙ্গ পোকা **চিত্র: ক্ষতির লক্ষণ**

প্রতিকার

১। বাগানের কাছে গোবরা বা কমপোস্টের পিট তৈরি করা যাবে না।

২। আক্রান্ত গাছের ছিদ্র পথে লোহার শিক ঢুকিয়ে সহজেই পোকা বের করা যায় বা মারা যায়। ছিদ্র পথে সিরিঞ্জ দিয়ে অরগানো ফসফরাস গ্রুপের কীটনাশক প্রবেশ করালে পোকা মারা যাবে।

৩। আক্রান্ত গাছের নিচে মাটির চাড়িতে পচা খৈইল পানিতে গুলে বা ভেরেন্ডা বীজের গুড়া পানিতে জাল দিয়ে দ্রবণ তৈরী করে দিলে পোকা তার ভিতরে মারা যায়।

৪। প্রাপ্যতা সাপেক্ষে হেক্টর প্রতি ৫টি হারে ফেরোমন ফাঁদ (যেমন: রাইনো লিউর) স্থাপন করা। ২০২৪

৫। সবচেয়ে ভিতরের পাতার গোড়ায় নিমের নির্ঝাস প্রয়োগ করা বা কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক যেমন: সেভিন ২ গ্রাম / লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

৬। বীজতলার ক্ষেত্রে ন্যাফথলিনের ১০ গ্রামের বল বালু দিয়ে ঢেকে (৩-৪ মিটার পর পর ৩-৪ টি হারে) জায়গায় জায়গায় রেখে দেওয়া।

৭। গোবর বা কম্পোস্ট প্রয়োগের আগে তা কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক যেমন: সেভিন ১ গ্রাম / লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে শোধন করে নিন।

৮। নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করতে হবে।

৪) নারিকেলের মাইট

লক্ষণ: নারিকেলে মাকড় আক্রমণ বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। এসব মাকড়ের আক্রমণে কচি অবস্থায় নারিকেলের খোলের ওপর ফাঁটা ফাঁটা শুকনো দাগ পড়ে এবং কুঁচকে বিকৃত হয়ে পরিপক্ব হওয়ার আগেই তা ঝরে পড়ে। আক্রমণের শুরুতে আক্রান্ত নারিকেল দেখে সহজে মাকড় চেনা যায় না। অতীতে আমাদের দেশে নারিকেলে এ রকম সমস্যা দেখা যায়নি। কৃষকের ধারণা মোবাইল টাওয়ারের কারণে নারিকেলে এমনটি হচ্ছে। এসব মাকড়ের ঝাঁক কচি নারিকেলের বোঁটার কাছে বৃতির নিচে বসে নারিকেলের গা থেকে রস চুষে খায়। রস চুষে নেয়ার সময় নারিকেলের যে ক্ষত হয় পরবর্তিতে তা ফাটা বাদামি দাগে পরিণত হয়। পরে সেকেন্ডারি ইনফেকশনের মাধ্যমে আরও বেশি সমস্যায় আক্রান্ত হয়।

মাইট আক্রান্ত নারিকেল

বাতাস, কীটপতঙ্গ ও পাখির মাধ্যমে মাকড় এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়ায়। কচি অবস্থায় ফল ঝরে যায়, খোসা শক্ত ও ছোট হয়ে যায়। কচি পাতার উল্টো দিকে রস চুষে খায়। আক্রান্ত পাতা বিন্দু বিন্দু হলুদ পরে সাদা হয়, পাতা ও ফল বিকৃত হয়। পাতার শিরা বরাবর রুপালী রংয়ের অসংখ্য ক্ষুদ্র দাগ দেখা যায়। ফল বড় হয় না, ফলন কম হয়, গাছ নিস্তেজ হয় ও গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

প্রতিকার

১) বাগান ও গাছ পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা, বৎসরে দুইবার সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

২০২৪

২) বর্ষা মৌসুম শেষে গাছের অপ্রয়োজনীয়, মৃত, অর্ধমৃত ডালপালা ছাঁটাই করে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। আক্রান্ত অংশ পোকাসহ সংগ্রহ করে পুতে ফেলতে হবে।

৩) ডিটারজেন্ট ৩গ্রাম/ লিটার পানি+নিম/ বিষকাঠালী/ ধুতরা/আতা/পেঁপে/ নিশিন্দা/ জবা/গাদা ফুলের ১ কেজি পাতা থেতিয়ে ১২ ঘন্টা ভিজে ১০ লিটার পানি স্প্রে করতে হবে।

৪) এবামেকটিন ১.৮ই (সানমেকটিন/ ভার্টিমেক/একামাইট) ২ মিঃলিঃ/ লিটার পানি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৫) সালফার ৮০ডব্লিউপি (কুমুলাস ডিএফ/থিয়োভিট/সালফক্স/ম্যাগসালফার) ৪ গ্রাম/ লিটার পানি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

১.৬.৯ নারিকেল গাছে ফল ঝরা সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান: অনেক সময় ছোট অবস্থায় নারিকেল ফল ঝরে পড়ে। কখনও নারিকেলের ভেতরে শাঁস কম হয়, আবার কখনও ডাবে তেমন পানি থাকে না। এ ধরনের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধানের প্রধান দিকগুলো নিম্নরুপ-

১) গাছ লাগানোর ৫-৭ বছর পর থেকেই গাছে ফুল-ফল ধরা আরম্ভ করে। প্রথম ২-৩ বছর গাছে ফুল-ফল ধরা ক্ষমতা অপূর্ণ থাকে। ফলে এ সময় ফুল-ফল বেশি ঝরে পড়া তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা নয়।

২) নারিকেল গাছের কাছাকাছি অন্য কোনো ফলন্ত নারিকেল গাছ থাকলে প্রয়োজনীয় পরাগরেণু প্রাপ্তি সম্ভাবনা বেশি থাকে। এজন্য আশপাশে ফলন্ত নারিকেল গাছ থাকা ভালো। অনেক সময় কচি ফলের প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণ নষ্ট (Abortion) হওয়ার কারণে ও নারিকেল গাছে ফল ধরা ব্যহত হয়।

৩) শুকনা মৌসুমে অনেক দিন পর হঠাৎ বৃষ্টি হলে এবং এ বর্ষণ ৫-৭ দিন ধরে চলতে থাকলে ফুল ফল ধরার জন্য পরাগায়ন সমস্যা হয়।

৪) অনেক সময় দেখা যায় নারিকেল গাছের লাগানো জাতটা নিম্ন মানের, স্ত্রী-পুরুষ উভয় ফুল-ফল ধরার ক্ষমতা কম থাকে, যা জাতগত (Genetical) কারণে হয়ে থাকে।

৫) ফুল-ফল ধরাকালে নারিকেল গাছে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণের প্রভাব গাছে ফুল-ফল ঝরার অন্যতম কারণ। এজন্য নারিকেল গাছ যেন সব সময় রোগবালাইমুক্ত থাকে সে ব্যবস্থা অবশ্যাই নিতে হবে।

৬) সর্বোপরি গাছে প্রয়োজনীয় খাবারের অভাব দেখা দিলে, বিশেষ করে পটাশ, বোরন ও ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি ও অন্যান্য অনুখাদ্যের ঘাটতি দেখা দিলে বয়স্ক গাছে ফল ধরার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ে।

পাঠ সংক্ষেপ

১) নারিকেলের জন্য বার্ষিক গড় ২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেশি উপযোগী।

২) নারিকেল গাছে পটাশ জাতীয় খাবারের চাহিদা তুলনামূলক বেশি

৩) বীজ-চারা রোপণের ১০-১২ বছর পর থেকে তাল গাছে ফুল ফল ধরা আরম্ভ করে।

৪) বাংলাদেশে ডালিমের জাত প্রকরণ নিয়ে কোন কাজ হয়নি। এর কোন উন্নত জাত এদেশে নেই।

৫) মাল্টা সাইট্রাস ফসলের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় ফল।

৬) আর্দ্র জলবায়ুতে মাল্টার রোগ ও ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

৭) আদিজোড় বা রুটস্টক থেকে বাড়ন্ত কুশি নিয়মিত কেটে দিতে হবে।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তুমি শরৎকালীন বিভিন্ন ফলের পোকামাকড় ও রোগবালাই সম্পর্কে জেনেছ। নিম্ন ছকে কয়েকটি পোকামাকড় ও রোগবালাই উল্লেখ করা হয়েছে। তুমি ছবি দেখে পোকা/রোগের নাম, লক্ষণ, কোন ফসলে বা ফলে ক্ষতি করে ও প্রতিকার বা দমন ব্যবস্থা উল্লেখ কর।

ক্র নং	ছবি	পোকা/রোগের নাম	লক্ষণ	প্রতিকার/দমন ব্যবস্থা	কোন ফসলে ক্ষতি করে
০১					
০২					
০৩	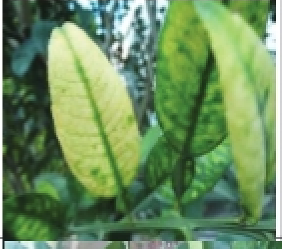				
০৪					

০৫					
০৬	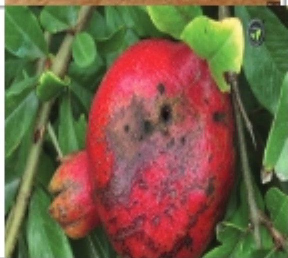				
০৭					

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

তোমার পাশের বাড়ির রহিম চাচা তার ৫ বিঘা জমিতে মাল্টা চাষ করতে চায়। নিম্নের প্রশ্নের আলোকে সফলভাবে মালটা চাষের পরামর্শ প্রদানপূর্বক প্রতিবেদন তৈরি কর।

১) কোন জাত চাষ করবে?

২) চারা প্রাপ্তি ও চারা সংখ্যা উল্লেখ কর।

২) অনুমোদিত মাত্রা অনুযায়ী সারের পরিমাণ উল্লেখ কর।

৩) মালটার গ্রিনিং রোগ ও সাইলিড পোকা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য কি কি করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নারিকেলের উৎপত্তিস্থল কোথায়?

২. নারিকেল চাষে উপযোগি তাপমাত্রা কত?

৩.মালটার গ্রিনিং রোগ এর বাহক কে?

৪. গামোসিস কি?

৫. ব্যাগিং কি?

৩. রোপণের কতদিন পর আমলকি ধরে?

৪. ৪টি ছত্রাকনাশকের নাম লিখ?

৫. কোন অবস্থায় বাতাবিলেবু জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়?

২০২৪

৬. তালের উৎপত্তিস্থল কোথায়?

৭. কোন কোন দেশ নারিকেল উৎপাদনে অতি অগ্রগামী?

৮. কোন ধরনের মাটি মাল্টা পরিবারের সবজি চাষের জন্য উপযোগী?

৯. মাল্টা চাষের জন্য গর্তের আকার কত হলে ভালো হয়?

১০. মাইট দ্বারা হয় ফলের এমন একটি রোগের নাম বল?

১১. ডালিমের ৪টি জাতের নাম লিখ?

১২. বীজ-চারা রোপণের কত বছর পর থেকে তাল গাছে ফুল ফল ধরা আরম্ভ করে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রতি ১০০ গ্রাম তালে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?

২. শরৎকালীন ফল চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা প্রয়োজন?

৩. আমলকি চারা রোপনের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?

৪. প্রুনিং কি?

৫. নারিকেলের বিভিন্ন জাতের নাম লিখ|

৬. মালচিং কি? এর উপকারিতা লিখ?

৭. বারি মাল্টা -১ এর বৈশিষ্ট্য লিখ?

৮. শিকড় ছাটাই কি?

৯. ফল সংরক্ষণের সুবিধা কি?

১০. সার কি? ৪টি সারের নাম লিখ?

১১. তাল ও নারিকেলের ব্যবহার লিখ?

১২.প্রতি ১০০ গ্রাম ডালিমে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। তালের চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। ডালিম চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা কর।

৩। ডালিমের পোকামাকড় দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। মাল্টার চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। নারিকেল গাছে ফল ঝরা সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান বর্ননা কর।

৬। মাল্টার পোকামাকড় দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭। নারিকেলের মাইট আক্রমনের লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। মাল্টা, বাতাবিলেবু ও ডালিমের পরিপক্কতার লক্ষণ লিখ?

৯। আমলকির চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

জব ১.১: মাল্টা/ বাতাবিলেবু/ নারিকেল/তাল/আমলকি উৎপাদন কৌশলের দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

১। উপযুক্ত জমি নির্বাচন করতে পারবে।

২। জমি প্রস্তুত করতে পারবে।

৩। মূল জমিতে চারা রোপণ করতে পারবে।

৪। ফসলের পরিচর্যা করতে পারবে।

৫। পরিপক্কতার মানদন্ড অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ করতে পারবে।

পারদর্শীতার মানদন্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের জমি প্রস্তুত করা ।

২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরন শনাক্ত ও সংগ্রহ করা।

৩। হ্যান্ড গ্লাবস ও গামবুট পরিধান করা।

৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যাবহৃত মালামাল পরিস্কার করা।

৫। অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষন করা ।

৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ টি
২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ জোড়া
৪	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ টি
৫	গামবুট	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী: শরৎকালীন ফলসমূহ যেমন- মালটা, ডালিম, বাতাবিলেবু, তাল ও নারিকেল আমাদের দেশের জনপ্রিয় ফল। এই ফল গুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সি ও বিভিন্ন খনিজ উপাদান আছে। এই ধরনের ফলসমূহ চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু সবচেয়ে উপযোগী। সুনিস্কাশিত উর্বর দোয়াশ ও এটেল মাটি সমৃদ্ধ উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ পায় এরূপ জায়গা এই ধরনের ফল চাষের জন্য উত্তম। মাটিতে যত জৈব পদার্থ থাকবে ফলন ততই ভালো হবে। অম্লমান বা পিএইচ ৬.০-৬.৫ এই গোত্রের ফল চাষের জন্য উত্তম।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: ১। কোদাল, ২। মেজারিং টেপ, ৩। জৈব ও রাসায়নিক সার, ৪। সুস্থ ও সবল চারা, ৫।মই, ৬। নিড়ানি, ৭। খুরপি, ৮। বাঁশের খুটি, ৯। রশি, ১০। টুকরি, ১১। ঝাঁঝরি, ১২। জৈব বালাইনাশক, ১৩। খাতা ও কলম

কাজের ধারা:

১। উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ পায় এরূপ জমি নির্বাচন করতে হবে।

২। ৪-৫ টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

৩। গর্ত তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৩/৪ মিটার দূরত্বে ৭৫X৭৫X৭৫ সেমি মাপে গর্ত খুড়তে হবে।

৪। গর্তে সার প্রয়োগ: প্রতি গর্তে ১৫ কেজি পচা গোবর, ৪/৫ কেজি ছাই, ২৫০গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ৫ গ্রাম বরিক এসিড, ৫০০ গ্রাম চুন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গর্তে ভরে দিতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পরে চারা রোপণ করতে হবে।

৫। সার প্রয়োগ: চারার যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময় মত সঠিক পরিমান ও পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে। বয়স ভেদে গাছ প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপ-

গাছের বয়স (বছর)	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া সার (গ্রাম)	টিএসপি সার (গ্রাম)	এমওপি সার (গ্রাম)	জিংক সালফেট (গ্রাম)	বরিক এসিড (গ্রাম)
১-২	১০-১২	২০০-৩০০	১০০-১৫০	১০০-১৫০	১০	৫
৩-৪	১২-১৫	৩০০-৪৫০	১৫০-২০০	১৫০-২০০	১৫	৮
৫-৭	১৫-১৮	৪৫০-৬০০	২০০-৩০০	২০০-২৫০	২০	১০
৮-১০	১৮-২০	৬০০-৭০০	৩০০-৪৫০	২৫০-৩০০	২৫	১২
১০ এর অধিক	২০-২৫	৭৫০	৫০০	৪৫০	৩০	১৫

প্রতি বছর মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (মার্চ) এবং মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে বর্ষার পূর্বে ২ বার ও বর্ষার পরে মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে ১ বার মোট তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে সেচের ব্যাবস্থা না থাকলে বর্ষার আগে ও পরে ২ কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা ভালো।

৬। চারা রোপণের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩-৪ মিটার এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব৩-৪ মিটার দিতে হবে । ।

৭। বর্ষার পরে সার প্রয়োগের পর গাছের গোঁড়া থেকে একটু দূরে বিভিন্ন লতাপাতা বা খড় দ্বারা বৃত্তাকারে মালচ করে দিলে আগাছা দমন সহ শুষ্ক মৌসুমে আর্দ্রতা সংরক্ষিত হয়।

৮। সার দেওয়ার আগে মাটির আস্তর ভেঙ্গে দিয়ে নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

৯। ভালো ফলের জন্য শুষ্ক মৌসুমে বা খরার সময় নিয়মিত সেচ দেওয়া দরকার। বর্ষার সময় গাছের গোঁড়ায় যেন পানি না জমে, সে জন্য দ্রুত নিষ্কাশন ব্যাবস্থা করতে হবে।

১০। মাল্টা গাছের জন্য ডালা ছাঁটাই, ফল পাতলাকরণ ও ব্যাগিং অপরিহার্য।

২০১৪

১১। মাল্টা ফসলে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় এবং রোগের আক্রমণ হতে পারে। এগুলো ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

১২। পরিপক্কতার মাত্রা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

সতর্কতা

১। ছায়াযুক্ত ও নিচু জায়গা নির্বাচন করা যাবে না।

২। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করা উত্তম।

৩। অতিরিক্ত পরিপক্ক করে ফসল সংগ্রহ করা যাবেনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হেমন্ত ও শীতকালীন ফল চাষ

(Cultivation of Late Autumn and Winter Fruits)

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। আমাদের এই লাল সবুজের বাংলাদেশকে ঘিরে প্রতি দু'মাস অন্তর অন্তর এক একটি ঋতু পরিবর্তন হয়! আগমন করে নিজস্ব বহুমুখী বৈচিত্র্যতা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋতু। আমাদের এই রূপবতী বাংলাদেশে বারো মাসে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টি ঋতুর পালা বদল হয় প্রতি বছর। সুস্থ-সবল দেহ নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে হলে ফলের বিকল্প নেই। কারণ শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং আঁশ বা ফাইবারের একটি দারুন উৎস হচ্ছে ফল। আমাদের দেশের জলবায়ুতে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ধরনের ফল জন্মে যেগুলোর স্বাদে, গন্ধে, রঙে, আকারে ও ফলনে নানা বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। সবুজ, হলুদ, কমলা অথবা লাল রং এর ফল আমাদেরকে সুস্থ্য রাখে এবং দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাতে স্বাদ ও গন্ধে ভিন্নতা ও বৈচিত্র আনয়ন করে। হেমন্ত ও শীত মৌসুমে বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের প্রাপ্যতা প্রায় ২২ ভাগ এবং এর মধ্যে বেশিরভাগ ফল ভিটামিন সি সমৃদ্ধ।

এ অধ্যায় শেষে-

- কমলা, আঙ্গুর, নাশপাতি, কামরাঙা ও কুল এর পরিচিতি, ব্যবহার ও পুষ্টিগুণ উল্লেখ করতে পারবে
- উপরোক্ত ফলগুলো চাষের উপযোগী মাটি ও জমি নির্বাচন, পুষ্টিগুণ ও জাত নির্বাচন করতে পারবে
- উপরোক্ত ফলগুলো চাষের উপযোগী জমি প্রস্তুত, গর্ত তৈরি ও গর্তে সঠিকভাবে সার প্রয়োগ করতে পারবে
- উক্ত ফলগুলোর আন্ত:পরিচর্যা, ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে

২.১ কমলালেবু চাষ (Cultivation of Mandarin)

লেবুজাতীয় ফলের মধ্যে বাংলাদেশে কমলা সবচেয়ে জনপ্রিয় ফল। এতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। নাস্তার টেবিলে ফল হিসেবে কমলার বিকল্প নেই। বাজার থেকে কমলা কেনার পাশাপাশি সুযোগ-সুবিধা থাকলে উৎপাদনও করা যেতে পারে। দেশি ফল না হলেও এখন দেশি ফলের মতোই দেশের বিভিন্ন স্থানে কমলার চাষ হচ্ছে। সিলেট, মৌলভীবাজার, পঞ্চগড়, বরেন্দ্র অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম এর বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় কমলার চাষ হচ্ছে। ইদানিং বিভিন্ন এলাকায় সখ করে পারিবারিকভাবে কমলার আবাদ শুরু হয়েছে। দেশে ৭৮০ হেক্টর জমিতে কমলার আবাদ হয় এবং উৎপাদন ৩,৭৪০ মেট্রিক টন (বিবিএস ২০২১)। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন প্রায় ৪.৮ মেট্রিক টন।

২.১.১ কমলার পরিচিতি ও জাত নির্বাচন

কমলার পরিচিতি ও ব্যবহার: লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে কমলা একটি অতি পরিচিত ও ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ ফল। কমলার আদি নিবাস দক্ষিণ-পূর্ব চীনে। কমলা খাদ্যমানের দিক থেকে অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ। প্রখর সূর্যকিরণ ও উচ্চ তাপমাত্রায় কমলা গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ২৫-৩০° সে. তাপমাত্রা এবং আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান উপযোগী। ফল হিসেবে, জুস করে কিংবা অনেক রান্নাতেও কমলা ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও এটি আইসক্রিম, স্কোয়াশ, জ্যাম জেলি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়।

বৈজ্ঞানিক নাম: *Citrus reticulata*

পুষ্টিগুণ

কমলা লেবু বা ম্যান্ডারিন কমলা ছোট সাইট্রাস জাতীয় গাছের রসালো ফল। কমলা পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম কমলায় সাধারণত ৪৩ কি. ক্যালরি খাদ্যশক্তি, ৮৯.৪ গ্রাম জলীয় অংশ, ০.৩ গ্রাম হজমযোগ্য আঁশ, ০.৭ গ্রাম আমিষ, ০.১ গ্রাম স্নেহ, ৯.৭ গ্রাম শর্করা, ২২ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ০.১ গ্রাম ০.৩ গ্রাম লৌহ, ০.০৪ মি.গ্রাম ভিটামিন বি$_১$, ০.০১ ভিটামিন বি$_২$, ৪০ মি. গ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে।

জাত নির্বাচন

বারি কমলা-১: এ জাতটি নিয়মিত আগাম ফল প্রদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩০০-৪০০টি। ফল বড়, ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম ও প্রায় গোলাকৃতি। পাকার ফল হলদে রং ধারণ করে। ফলের খোসা ঢিলা, রসালো ও মিষ্টি (টিএসএস ১০.২% এবং এসিড ১.১৯%)।

২০২৪

বারি কমলা-২: গাছ নিয়মিত ফলধারী, ফল ছোট, গড় ওজন ৩০-৪০ গ্রাম, খুব রসাল, পাকা কমলার রং উজ্জ্বল হলুদ। নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসে কমলা পাকে।

বারি কমলা-৩: উচ্চ ফলনশীল ও গাছে নিয়মিত ফল ধরে। পাকা কমলার খোসা উজ্জ্বল কমলা, ফল মাঝারি আকারের, গড় ওজন ১৬৮ গ্রাম। ফল ঝরে কম। মাকড় প্রতিরোধী। নভেম্বর-ডিসেম্বরে ফল পাকে।

এছাড়া সিলেট অঞ্চলে খাসিয়া ও নাগপুরী জাত চাষ হয়ে থাকে।

২.১.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

মাটি ও জমি নির্বাচন

যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় এমন আর্দ্র ও উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে কমলা ভাল জন্মে। উচু, উর্বর, সুনিষ্কাশিত এবং মৃদু অম্লভাবাপন্ন দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি কমলা চাষের জন্য উপযোগী। এটেল মাটির পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা কম হওয়ায় কমলা চাষের অনুপযোগী। কমলা চাষের জন্য মাটির আদর্শ পিএইচ (pH) ৫.৫-৬.০। সমতল ভূমির চেয়ে পাহাড়ের ঢালে কমলা ভাল জন্মে। পাহাড়ের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ ঢালে কমলা তুলনামূলকভাবে ভাল হয়। সমতল ভূমিতে বর্ষাকালে পানি জমে না এমন উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে।

বাগানের লে-আউট তৈরি

বর্গাকার, ষড়ভূজাকার ও কন্টুর পদ্ধতিতে সঠিক রোপণ (৩-৪ মি.x ৩-৪ মি.) দূরত্বে লে-আউট তৈরি করে কলমের চারা রোপণ করলে বাগান দেখতে সুন্দর হয় এবং প্রতিটি চারা সমানভাবে আলো-বাতাস পায় ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। কমলা চাষের নির্বাচিত জমি পাহাড়ি হলে সেখানে ২৫-৩০ মিটার দূরত্বে ছায়া বৃক্ষ রাখা যেতে পারে। তবে বড় গাছ কাটলে শেকড়সহ তুলে ফেলতে হবে। তারপর পাহাড়ের ঢালু অনুসারে নকশা তৈরি করে নিতে হবে।

জমি প্রস্তুত, গর্ত বা পিট তৈরি ও গর্তে সার প্রয়াগ

জমি তৈরির পূর্বে জমি হতে আগাছা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গাছপালা কেটে জমিতে রেখেই সেগুলো রোদে শুকাতে হবে। তারপর তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে এবং কোদাল দিয়ে কুপিয়ে সেসব ছাই মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এতে আগাছা পরিষ্কার, জীবাণু ও পোকামাকড় ধ্বংস এবং চাষের কাজ হয়ে যাবে। সমতল ভূমিতে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে কোদালের সাহায্যে জমি তৈরি করতে হবে। পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে সিড়ি বা ধাপ তৈরি করে কমলার চারা লাগাতে হবে। ২-২.৫ মিটার চওড়া করে ধাপ জমি তৈরি করতে হবে। সিড়ি তৈরি করা সম্ভব না হলে পাহাড়ের ঢালে নির্দিষ্ট দূরত্বে গোলাকার বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারের বেড তৈরি করে গাছ লাগানো যেতে পারে। পাহাড়ের ধাপে ৩ মিটার পর পর এবং অল্প ঢাল বা সমতল ভূমিতে চাষের ক্ষেত্রে জমি তৈরির পর ৩-৪ মি.x ৩-৪ মি. দূরত্বে ৬০সে.মি.x৬০ সে.মি.x৬০ সে.মি. সেমি আকারে গর্ত বর্ষার আগে তৈরি করতে হবে। গর্ত খনন করার সময় উপরের দুই তৃতীয়াংশ মাটি একদিকে এবং নিচের এক তৃতীয়াংশ মাটি অন্যদিকে রাখতে হবে। গর্তের মাটি তুলে পাশে রেখে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। নিচের মাটির সাথে প্রতি গর্তে চারা রোপণের ১০-১৫ দিন আগে পচা গোবর ১৫ কেজি, ৩-৫ কেজি ছাই, ১ কেজি খৈল, টিএসপি সার ৫০০ গ্রাম, এমওপি সার ২৫০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম চুন ও ১ চামচ ব্লিচিং পাউডার/ফিনিশ পাউডার প্রয়োগ করতে হয় এবং উক্ত সার কোদাল

দিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্তের নিচে ভরাট করতে হবে। নিচের বাকি এক তৃতীয়াংশ মাটি গর্তের উপরে ভরাট করতে হবে। গর্তে মাটি ভরাট করে পানি দিয়ে মাটি ভজিয়ে দিতে হবে।

২.১.৩ চারা সংগ্রহ ও রোপণ

চারা সংগ্রহ

বীজ থেকে সরাসরি চারা তৈরি করা যায়। আবার চোখ কলম ও ক্লেফট গ্রাফটিং এর মাধ্যমেও কলম তৈরি করা যায়। তবে বানিজ্যিকভাবে ক্লেফট গ্রাফটিং এর মাধ্যমে কলম তৈরি করা হয়। কমলার প্রকৃত মাতৃগাছের ১-১.৫ বছর বয়স্ক চারা/কলম সংগ্রহের জন্যে জাত উদ্ভাবনকারী সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা ভাল। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার সেন্টার এবং বিএডিসির উদ্যান কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নার্সারী হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

চারা রোপণ

প্রধানত মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র (মে থেকে আগস্ট) মাসের মধ্যে কমলার চারা রোপণ করতে হবে। চারা মাটির বলসহ গর্তে লাগাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চারাটি গর্তের মাঝে থাকে। চারা রোপণের সময় কান্ডের মূল ডাল রেখে অন্য ডাল ছেঁটে দিতে হবে।

২.১.৪ আন্ত:পরিচর্যা

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

রোপণের পরপরই চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে। চারাটি যাতে হেলে না পড়ে সেজন্য শক্ত খুঁটির সাথে চারা বেঁধে দিতে হবে এবং খাঁচা দিয়ে চারাকে গবাদি পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। মাটি আলগা করা এবং প্রয়োজনে গোড়ায় মাটি দিতে হবে। রোগে আক্রান্ত বা মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছা কমলা গাছের অন্যতম শত্রু এবং বিভিন্নভাবে গাছের ক্ষতি করে থাকে। গাছের গোড়া ও নালার আগাছা সব সময় পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। গাছের উপরে পরগাছা ও লতাজাতীয় আগাছা থাকলে তা দূর করতে হবে।

অঙ্গ ছাঁটাই

চারা অবস্থায় কমলা গাছের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। গোড়া থেকে অতিরিক্ত জন্মানো শাখা কেটে ফেলতে হবে। নিচের দিকে ছোট ছোট শাখা ছেটে ভূমি থেকে অন্তত ৪৫ সেমি ওপর থেকে কান্ডের উৎপাদনশীল শাখা বাড়তে দেওয়া যেতে পারে। মরা ও রোগাক্রান্ত ডাল মাঝে মাঝে ছেটে দিতে হবে। গাছের গঠন ছোট থেকেই সুন্দর ও শক্ত করে তুলতে হবে।

সেচ ও নিকাশ

চারা গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে পানি দিতে হবে। শুকনা মৌসুমে বিশেষ করে ফুল ও ফল ধরার সময়ে মাসে ১ বার সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ফুল ফল ধরার সময় সেচ দিলে ফুল ফল ঝরা কমে আসে ও

ফলের আকার বড় হয়। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রেখে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

মালচিং

আগাছা পরিষ্কার করার পর এবং সার প্রয়োগের পর আগাছা বা লতাপাতা/খড়কুটো দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হবে। এতে গাছের গোড়ার রস সংরক্ষণে সহায়ক হবে এবং পচে জৈব সার হিসেবে গাছের কাজে লাগবে।

সার ব্যবস্থাপনা

চারা রোপণের বছর বর্ষার পরে গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম করে এমওপি ও টিএসপি সার এবং ১০০ গ্রাম ইউরিয়া সার চারার গোড়া থেকে ১৫ সে.মি. দূরে চারিদিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে হালকা পানি সেচ দিতে হবে।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ হবে-

গাছের বয়স (বছর)	পঁচা গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২	১৫	৮০-১২০	৮০-১২০	৮০-১২০
২-৩	১৫	৩০০-৩৫০	২০০-২৫০	২০০-২৫০
৪-৫	২০	৩৫০-৫০০	৩০০-৩৫০	৩০০-৪০০
৬-৭	৩০	৫৫০-৬৫০	৪০০-৫০০	৪৫০-৫০০
৮-৯	৪০	৭০০-৮০০	৫৫০-৮৫০	৫৫০-৭০০
১০ এর উর্দ্ধে	৪০	১০০০-১৫০০	৮৫০-১৪০০	৭৫০-১০০০

উপরোক্ত সার প্রতি বছর ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। বর্ষার আগে মধ্য মাঘ থেকে মধ্য চৈত্র মাসে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) একবার, বর্ষার আগে মধ্য চৈত্র থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল থেকে মে) এবং বর্ষার শেষে মধ্য কার্তিক থেকে মধ্য পৌষ মাসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) এই ৩ কিস্তিতে সার দিতে হয়। সার দেওয়ার সময় অবশ্যই হালকা পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে পাহাড়ের ঢালে মাটি না কুপিয়ে চোকা মাথা খুঁটির সাহায্যে ১০-২০টি গর্ত করে সার প্রয়োগ করে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। কমলার জন্য এসব সার ছাড়াও ম্যাগনেসিয়াম, জিংক ও কপারের বিশেষ দরকার হয়। জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট, ৪০ গ্রাম তুঁতে ও ৪০ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম সালফেট মিশিয়ে পাতা ভিজিয়ে স্প্রে করলে গাছ সুস্থ ও সতেজ থাকে, ফলন বাড়ে এবং ফলের স্বাদ ভাল হয়।

সাথী ফসল

চারা রোপণের পর ৩-৪ বছর পর্যন্ত কমলা বাগানে ফাঁকা জায়গায় শিম জাতীয় ফসল যেমন-মটরশুটি, ডাল ফসল, বরবটি, বাদাম, সানহেম্প ইত্যাদি রোপণ করে বাড়তি আয় করা সম্ভব।

পোকামাকড় ও রোগ-বালাই

পাতা ছিদ্রকারী পোকা: সাদা পোকা কচি পাতার নিম্নতলে আঁকা-বাঁকা দাগের সৃষ্টি করে। এর আক্রমণে পাতা কুঁকড়ে যায়, ফলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিকার: ১০ মিলি মেটাসিস্টক্স ১০ লিটার পানিতে অথবা ডায়াজিনন ৬০ ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪ চা চামচ মিশিয়ে স্প্রে করে গাছের পাতা ভিজিয়ে দিতে হবে।

বাকল ছিদ্রকারী পোকা: পোকা গাছের বাকলে ঢুকে খেতে থাকে এবং আক্রান্ত বাকল শুকিয়ে ডাল বা কান্ড মারা যায়।

কান্ড ছিদ্রকারী পোকা: পোকা গাছের কান্ড বা ডাল ছিদ্র করে ভেতরে খেয়ে গাছ দুর্বল করে ফেলে। আক্রমণ বেশি হলে ডাল বা কান্ড শুকিয়ে মারা যায়।

প্রতিকার: রিপকর্ড ১০ ইসি কীটনাশক ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি বা ২ চা চামচ মিশিয়ে স্প্রে করে পোকা দমন করা যায়।

কমলা গান্ধী: ফলের গায়ে ছিদ্র করে রস চুষে খায়। মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-কার্তিক মাসে যখন ফল পুরো রসালো হয় তখন এ পোকার উপদ্রব শুরু হয়। এতে ছিদ্রস্থান কয়েকদিন পর হলদে হয়ে ফল ঝরে যায়।

প্রতিকার: ম্যালাথিয়ন ০.০৪% অথবা সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ১০ লিটার পানিতে ৫ চা চামচ মিশিয়ে স্প্রে করলে এ পোকা দমন হয়।

গ্রীনিং রোগ: গ্রীনিং রোগাক্রান্ত গাছের পাতা হলদে রং ধারণ করে। শিরা দুর্বল, পাতা কিছুটা কোঁকড়ানো, পাতা ছোট হয় এবং সংখ্যা কমে আসে। সাইলিড নামক পোকা দিয়ে এ রোগ সংক্রমিত হয়। রোগাক্রান্ত গাছের ডাল দিয়ে কলম করলে নতুন গাছের এ রোগ দেখা দেয়।

প্রতিকার: নগস ১০০ ইসি ১০ লিটার পানিতে ৪ চা চামচ মিশিয়ে স্প্রে করলে সাইলিড পোকা নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং এ রোগ কমে আসে।

ক্যাংকার রোগ: এ রোগে ফল ও পাতা আক্রান্ত হয়।

প্রতিকার: এ রোগ হলে ফল, পাতা কেটে ফেলতে হবে এবং মাঝে মাঝে বর্দোমিকচার ছিটিয়ে রোগ দমন করতে হবে।

২.১.৫ ফল সংগ্রহ

বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে রোপণ করলে রোপণের ৩-৫ বছর পর গাছে ফুল আসে। কলমের গাছে ১ বছর পরই ফুল আসে। তবে প্রথম বছরের ফুল থেকে কোন ফল হতে দেয়া উচিত নয়। ফুল ভেঙ্গে দেয়া উচিত। কমলা গাছে সাধারণত মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ) মাসে ফুল আসে এবং মধ্য-কার্তিক থেকে মধ্য-পৌষ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর) মাসে ফল পাকে। ফলের রং কিছুটা হলদে থেকে কমলা বর্ণ হলে তা সংগ্রহ করা যায়। ফল ভালভাবে পাকার পর অর্থাৎ কমলা বর্ণ ধারণ করলে সংগ্রহ করতে হবে। এতে ফলের মিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। গাছ হতে ফল সংগ্রহ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ফলগুলোতে যাতে আঘাত না লাগে। গাছ হতে ফল সংগ্রহের জন্য হারভেস্টর ব্যবহার করা দরকার।

ফলন

একটি পূর্ণ বয়স্ক কমলা গাছ হতে প্রতি বছর গড়ে ২০০-৩০০টি ফল পাওয়া যায়। তবে কোন কোন বয়স্ক গাছ বছরে ৫০০-৬০০টি ফল পাওয়া যায়।

২.১.৬ ফল সংরক্ষণ

তাজা কমলার ফল হিমাগারে সংরক্ষণ করলে ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও ৮০-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ২ মাস পর্যন্ত এবং ৫.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। তাজা ফল সংগ্রহের পর ১৩ শতাংশ তরল মোমের আবরণ দিয়ে সাধারণ তাপমাত্রায়ও ২৫ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।

২.২ আঙ্গুর চাষ (Cultivation of Grape)

দেশের মাটিতে আঙ্গুর চাষ সত্যিই অভাবনীয়। সবুজ পাতার নিচে বাঁশের মাচায় থোকায় থোকায় ঝুঁলছে আঙ্গুর ফল, যা দেখে যে কোন মানুষের চোখ জুড়িয়ে যাবে। আর এ দৃশ্য চোখে পড়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে। আঙ্গুর বিদেশী ফল হলেও বাংলাদেশের মানুষের নিকট আঙ্গুর কোন নতুন ফল নয়, বরং এটি এদেশের সবার কাছেই সুপরিচিত ও সমাদৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন ফলের মধ্যে আঙ্গুরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল। পাকিস্তান ও ভারতে আঙ্গুর চাষে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেছে। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত আঙ্গুরের দাম অত্যন্ত বেশি যে কারণে অনেকের পক্ষেই তা কিনে খাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশেও বেশ কিছু জাতের আঙ্গুর চাষ শুরু হয়েছে এবং দিন দিন আমাদের দেশে আঙ্গুরের চাষ বাড়ছে। আঙ্গুর এক ধরনের মিষ্টি জাতীয় খুব সুস্বাদু ও অত্যন্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ একটি ফল। এর গাছ লতানো হয়ে থাকে। এক সাথে থোকায় থোকায় গাছে আঙ্গুর ধরে । আঙ্গুর সাদা , কালো, লাল ইত্যাদি রঙের হয়ে থাকে। পাকা আঙ্গুর টসটসে , রসে ভরপুর হয়ে থাকে।

২.২.১ আঙ্গুরের পরিচিতি ও জাত নির্বাচন

আঙ্গুরের পরিচিতি ও ব্যবহার: আঙুর একটি অতীব পরিচিত ফল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটা বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়ে থাকে। এটা একটা বহুবর্ষজীবি বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ যা সুস্বাদু রসালো ফল দিয়ে থাকে। আমাদের দেশে যে আঙ্গুরের জাতটি ভাল হয়ে থাকে তাতে বীজ থাকে। ফলন আসতে সময় লাগে প্রায় দু'বছর। মাটিভেদে এর স্বাদ কোন এলাকায় খুব মিষ্টি আবার কোন এলাকায় টক হয়ে থাকে। এটি দিয়ে জেলী, জ্যাম ও স্কোয়াশ তৈরি করা হয়, আঙ্গুরের রস দিয়ে মদ ও বানানো হয়ে থাকে। এটি শুকালে কিসমিস তৈরি হয়। এতে যথেষ্ট পরিমানে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ লবন রয়েছে। বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৭১% মদ বা ওয়াইন বানাতে, ২৭% তাজা ফল হিসেবে এবং শুধু ২% শুকনো ফল হিসেবে ব্যবহার হয়।

বৈজ্ঞানিক নাম: *Vitis vinifera*

পুষ্টিগুণ

আঙ্গুর পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম আঙ্গুরে সাধারণত ৬৯ কি. ক্যালরি খাদ্যশক্তি, ০.৭২ গ্রাম আমিষ, ০.৬ গ্রাম স্নেহ, ১৮.১০ গ্রাম শর্করা, ১০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ০.৩৬ মি.গ্রা. লৌহ, ১৯১মি.গ্রা. লৌহ, ১৪.৬০ মি.গ্রা. ভিটামিন কে, ৩.৫২ মি. গ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে। এটি রক্তচাপ ও কোলেস্টরল নিয়ন্ত্রণ, ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

জাত নির্বাচন

বাংলাদেশে অনুমোদিত কোন জাত নেই। তবে আমাদের দেশে জাককাউ, ব্ল্যাকরুবি ও ব্ল্যাক পার্ল জাতের আঙ্গুর চাষ করা হয়ে থাকে। উক্ত জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো-

জাককাউ: এ জাতটি বছরে ২ বার ফলন দেয়। প্রথমবার মার্চ-এপ্রিলে ফুল আসে এবং জুন-জুলাইতে ফল পাকে, দ্বিতীয়বার ফুল আসে জুলাই-আগষ্টে এবং ফল পাকে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। ফুল হতে ফল পাকার জন্য মোট ১২০ দিন সময় লাগে। প্রথমদিকে আঙ্গুরের রং গাঢ় সবুজ থাকে, তবে পাকার আগে বাদামী রং ধারণ করে। এ আঙ্গুরে বীজ থাকে, ছাল কিছুটা শক্ত, তবে বেশ রসালো এবং চিনি বা ফ্রুক্টোজের পরিমান শতকরা ১৮-২০ ভাগ।

ব্ল্যাক রুবি: এ জাতের গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে এবং কচি অবস্থায় পাতা হালকা লাল রঙের হয়। এ জাতের আঙ্গুরের রঙ প্রথমে সবুজ হলেও পরে ফুল আসার পর ৮০-৯০ দিন পর চামড়ার রঙ কালো হতে শুরু করে এবং পাকলে গাঢ় কালো রঙ হয়ে যায়। জাককাউয়ের মতো এরা বছরে ২ বার ফল দেয়।

ব্ল্যাক পার্ল: এটি একটি দ্রুত বর্ধনশীল জাত। লতা হালকা খয়েরি রঙের এবং জাককাউয়ের মত বছরে দুইবার ফলন দেয়। ফুল আসার প্রায় ৮০-৯০ দিন পর থেকে আঙ্গুরের সবুজ রঙ ধীরে ধীরে মেরুন রঙে পরিবর্তিত হয় এবং পাকার পূর্বে সম্পূর্ণ গাঢ় কালো-লাল রঙে রুপান্তরিত হয়। এটিও বীজযুক্ত এবং চিনি বা ফ্রুক্টোজের পরিমান শতকরা ১৭-১৮ ভাগ।

২.২.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

মাটি ও জমি নির্বাচন

দোআঁশ যুক্ত মাটি, লাল মাটি, জৈব সার সমৃদ্ধ কাঁকর জাতীয় মাটি এবং পাহাড়ের পাললিক মাটিতে আঙ্গুর চাষ ভালো হয়ে থাকে। আঙ্গুর চাষে জমি উচু হতে হবে । জমিতে যেন পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। জমিতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো থাকতে হবে। আমাদের দেশে যে অঞ্চলের মাটির পিএইচ ৬.৫ থেকে ৭.০ এর মধ্যে আছে সেসব অঞ্চলে আঙ্গুর চাষ ভালো হবে। যে অঞ্চলের মাটির পিএইচ ৫.৫০ এর নিচে সেসব অঞ্চলে আঙ্গুর চাষ করতে হলে মাটির সাথে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

বাগানের লে-আউট তৈরি

বর্গাকার ও আয়তাকার পদ্ধতিতে সঠিক রোপণ দূরত্বে লে-আউট তৈরি করে কলমের চারা রোপণ করলে বাগান দেখতে সুন্দর হয় এবং প্রতিটি চারা সমানভাবে আলো-বাতাস পায় ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।

জমি প্রস্তুত, গর্ত বা পিট তৈরি ও গর্তে সার প্রয়াগ

জমি তৈরির পূর্বে জমি হতে আগাছা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গাছপালা কেটে জমিতে রেখেই সেগুলো রোদে শুকাতে হবে। তারপর তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে এবং কোদাল দিয়ে কুপিয়ে সেসব ছাই মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এতে আগাছা পরিস্কার, জীবাণু ও পোকামাকড় ধ্বংস এবং চাষের কাজ হয়ে যাবে। আঙ্গুর চাষে জমি ভালো ভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। মাটি ঝুরঝুরা করে নিতে হবে। তারপর মাটিতে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের আকার হবে ৭০×৭০×৭০ সেমি। গর্ত তৈরি করে তাতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গোবর সার ৪০ কেজি, পটাশ সার ৪০০ গ্রাম, ফসফেট ৫০০ গ্রাম, ইউরিয়া ১০০ গ্রাম গর্তের মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং তারপর ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। সার গুলো মাটির সাথে যেন ভালো ভাবে মিশে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে জল সেচ দিতে হবে।

২.২.৩ চারা সংগ্রহ ও রোপণ

চারা সংগ্রহ

বীজ থেকে সরাসরি চারা তৈরি করা যায়। আবার কাটিং, বাডিং ও গুটি কলম এর মাধ্যমেও কলম তৈরি করা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার সেন্টার এবং বিএডিসির উদ্যান কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নার্সারী হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

চারা রোপণ

যেখানে প্রচুর সূর্যের আলো পড়ে এমন যায়গায় আঙুর চারা লাগাতে হবে। মার্চ-এপ্রিল মাসে আঙুর চারা ৪×২ সে.মি. গোড়ার মাটির বলসহ গর্তে রোপন করতে হবে। চারা রোপন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে চারার গোড়া যেন সোজা থাকে। শাখা-কলমের বেলায় প্রায় এক ফুট দীর্ঘ শাখা-খন্ডের এক-তৃতীয়াংশকে মাটির নিচে কাত করে পুঁতলে ভালো হয়।

২.২.৪ আন্ত: পরিচর্যা

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

চারা লাগানোর পর একটি কাঠি গেড়ে গাছকে বেঁধে দিতে হবে এবং হালকা পানি সেচ দিতে হবে। খাঁচা দিয়ে চারাকে গবাদি পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। মাটি আলগা করা এবং প্রয়োজনে গোড়ায় মাটি দিতে হবে। রোগে আক্রান্ত বা মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছা আঙ্গুর গাছের বিভিন্নভাবে গাছের ক্ষতি করে থাকে। গাছের গোড়া ও নালার আগাছা সব সময় পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন।

অঙ্গ ছাঁটাই

গাছের কান্ড ছাঁটাই: গাছ বেড়ে ওঠার জন্য গাছের গোড়ায় শক্ত কাঠি দিতে হবে এবং মাচার ব্যবস্থা করতে হবে- সে মাচাতে আঙ্গুরের শাখা-প্রশাখা ছড়াবে। গাছ রোপণের পর মাচায় ওঠা পর্যন্ত প্রধান কাণ্ড ছাড়া অন্য সকল পার্শ্বের শাখা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। রোপণের পরবর্তী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মাচায় ছড়িয়ে থাকা আঙ্গুর গাছের কান্ড ছেঁটে দিতে হবে। কান্ড ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে আঙ্গুর গাছের ফলন বৃদ্ধি হয় এবং ফুল ঝরে পড়া কমে যায়। ছাঁটাইয়ের ৭ দিন আগে এবং পরে গোড়ায় হালকা সেচ দিতে হয়।

প্রথম ছাঁটাই: মাচায় কান্ড ওঠার ৩৫/৪৫ সে.মি. পর প্রধান কান্ডের শীর্ষদেশ কেটে দিতে হবে, যাতে ঐ কান্ডের দুই দিক থেকে দু'টি করে চারটি শাখা গজায়।

দ্বিতীয় ছাঁটাই: গজানো চারটির শাখা বড় হয়ে ১৫-২০ দিনের মাথায় ৪৫/৬০ সে.মি. লম্বা হবে, তখন ৪ টি শীর্ষদেশ কেটে দিতে হবে, যেখান থেকে আরও পূর্বের ন্যায় দু'টি করে ১৬টি প্রশাখা গজাবে।

তৃতীয় ছাঁটাই: এই ১৬টি প্রশাখা ১৫/২০ দিনের মাথায় ৪৫/৬০ সে.মি. লম্বা হবে, তখন আবার এদের শীর্ষদেশ কেটে দিতে হবে যাতে প্রতিটি প্রশাখার দু'দিকে দু'টি করে ৪ টি নতুন শাখা এবং এমনিভাবে ১৬ টি শাখা থেকে সর্বমোট ৬৪টি শাখা গজাবে। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই যে ৬৪ টি শাখা গজাবে এমন কোন কথা নেই। এই শাখার গিরার মধ্যেই প্রথমে ফুল এবং পরে এই ফুল মটর দানার মত আকার ধারণ করে আঙ্গুর ফলে রূপান্তরিত হবে। প্রথম বছর ফল পাবার পর শাখাগুলোকে ১৫/২০ সে.মি. লম্বা রেখে ফেব্রুয়ারী মাসে ছেঁটে দিতে হবে। ফলে বসন্তের প্রাক্কালে নতুন নতুন শাখা গজাবে এবং ফুল ধরবে। এই পদ্ধতি ৩/৪ বছর পর্যন্ত চলবে এবং ফলের স্থিতি লাভ করবে।

আঙ্গুর গাছের বিভিন্ন পরিচর্যার মধ্যে একটি হলো ডাল ছাঁটাই। প্রতিবার ফুল ধরার পর ডাল বা শাখাটি পুরনো হয়ে যায় এবং ঐ ডাল বা শাখায় আর ফুল-ফল ধরে না। এসব পুরনো ডাল বা শাখা গাছে থাকলে নতুন শাখা-প্রশাখা গজায় না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রতি একরে ৪৩৬টি আঙ্গুর গাছে লাগানো যায়।

সেচ ও নিকাশ

খরা মৌসুমে প্রয়োজনীয় পানি সেচ এবং বর্ষার সময়ে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২০১৪

মালচিং

আগাছা পরিষ্কার করার পর এবং সার প্রয়োগের পর আগাছা বা লতাপাতা/খড়কুটো দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হবে। এতে গাছের গোড়ার রস সংরক্ষণে সহায়ক হবে এবং পচে জৈব সার হিসেবে গাছের কাজে লাগবে।

সার ব্যবস্থাপনা

ভালো ফলন পেতে হলে জমিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপন করার এক মাস পর যদি গাছের বৃদ্ধি না হয় তাহলে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে এবং তাতে ৫ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। ১-৩ বছর বয়সী গাছে প্রতি বছর ১০ কেজি গোবর, পটাশ সার ৪০০ গ্রাম, ফসফেট ৫০০ গ্রাম, ইউরিয়া ১০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। পটাশ সার ব্যবহার করলে আঙ্গুর মিষ্টি হয়ে থাকে এবং রোগ বালাইয়ের আক্রমন কম হয়ে থাকে।

বিশেষ পরিচর্যা

প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে তিনটি পরিচর্যা নিয়মিতভাবে করতে হবে:

(ক) প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গাছের গোড়ায় মাটি হালকাভাবে কুপিয়ে আলগা করে তাতে অনুমোদিত সার প্রয়োগ করে শুধুমাত্র একবার বেশি করে পানি দিতে হবে।

(খ) জানুয়ারী মাসের ৪র্থ সপ্তাহে ঘুমন্ত গাছের শাখা-প্রশাখা ছাঁটাই করে দিতে হবে। ছাঁটাইকৃত ডালগুলো কেটে পরে মাটিতে পুতে পানি দিলে পুনরায় নতুন গাছ হবে।

(গ) ফেব্রুয়ারী মাসের ১ম সপ্তাহে সামান্য গরম আরম্ভ হবার সাথে সাথে গাছের গোড়ায় পানি সেচ দিতে হবে, যে পর্যন্ত না বৃষ্টি হয়। পানি দেবার ১০ দিনের মধ্যে গাছে নতুন শাখা-প্রশাখা গজাবে এবং তাতে ফুল দেখা দিবে। যা পরবর্তীতে আঙ্গুরে রূপান্তরিত হবে।

পোকামাকড় ও রোগ-বালাই

গাছে রোগ আক্রমন করলে প্রয়োজনীয় বালাই নাশক স্প্রে করতে হবে।

২.২.৫ ফল সংগ্রহ

আঙ্গুরের থোকায় হাত লাগানো উচিত নয়, এতে চামড়ার উপরের সাদা পাউডার হাতের ছোঁয়ায় উঠে যায় এবং পোকার আক্রমণ সহজতর হয়। থোকায় আঙ্গুর যখন মুগ ডালের আকারে থাকে তখন ছোট অবস্থায় কিছু আঙ্গুর বাছাই করে ফেলে দেয়া ভাল। যাতে আঙ্গুরের সাইজ সুন্দর থাকে। আঙ্গুর পাকার সময় বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকায় মাচার উপরে পলিথিন সীট দিয়ে আবৃত করে দিতে হবে যাতে গাছে বৃষ্টির পানি না লাগে। পানি লাগলে পাকা আঙ্গুর ফেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বছরে দুবার ফুল আসে। মার্চ ও জুলাই মাসে তা আঙ্গুরে রূপান্তরিত হয়।

আঙ্গুর ফল পরিপক্ক হলেই গাছ থেকে পাড়তে হয়। ফুল আসার ৭০-৮০ দিনের মধ্যে সবুজ অবস্থায় আঙ্গুর স্পঞ্জের ন্যায় নরম হবে। এটা আঙ্গুরের পরিপক্কতা বুঝায়। পরবর্তীকালে ৪০ দিন সময় নিবে আঙ্গুর মিষ্টির পর্যায়ে যেতে। ফল পাকার আগে পাড়া যাবে না তাহলে ফল আর পাকে না । অক্টোবর মাস থেকে নভেম্বর মাসে যদি গাছ ছাটাই করা হয় তাহলে মার্চ মাস বা এপ্রিল মাসে ফল আসে। বৃষ্টির কারনে বা আকাশ মেঘলা

থাকার কারণে যদি ফল সংগ্রহ করতে দেরি হয় তাহলে ফলের গুনগত মান কমে যায়। ফল টক হয়ে যেতে পারে। ফল যদি ঠিক মত বড় না হয় আর মিষ্টি না হয় তাহলে তাতে ৫০ মিলি ইথারেল ও ১০০ গ্রাম জিবরেলিক এসিড একত্রে নিয়ে এক লিটার জলের সাথে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।

ফলন: উপযুক্ত যত্ন নিতে পারলে জাত ভেদে প্রতি একরে ৪০০-৪৫০ টি চারা লাগানো যায় এবং জাতভেদে ভিন্নতায় গড়ে প্রতি গাছে প্রতিবছর ৪ কেজি হিসাবে এক একরে মোট ১৭৪৪ কেজি আঙ্গুর উৎপাদন করা সম্ভব।

২.২.৬ ফল সংরক্ষণ

ফল সংগ্রহ করার পর তা ছয় ঘন্টা ৪.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রেখে দিতে হবে।

২.৩ নাশপাতি চাষ (Cultivation of Pear)

নাশপাতি একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল। এটি বিদেশী ফল হলেও আমাদের দেশে কম বেশি সকলেই ফলটির সাথে পরিচিত। শীতকালে অন্যান্য দেশীয় ফলের অনুপস্থিতির কারণে বাংলাদেশে এ ফলটি বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমানে আমদানী করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রজাতির নাশপাতি চাষ করা হয়। **বাংলাদেশে চাষযোগ্য বিদেশী ফলের মধ্যে নাশপাতি অন্যতম।** বর্তমানে বাংলাদেশে পূর্ব এশিয়ার প্রজাতিটি চাষ হচ্ছে এবং এটি বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ুতে জন্মানোর জন্য উপযোগী। আমদানীকৃত বিদেশী নাশপাতিগুলো কখনও স্বাদে মিষ্টি, কখনও স্বাদে কিছুটা পানসে প্রকৃতির হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে চাষকৃত বাদামী রঙের এ ফলটি আমদানীকৃত নাশপাতির চেয়ে অনেক সুস্বাদু। জাতটি চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরেন্দ্র অঞ্চলে চাষের উপযোগী।

২.৩.১ নাশপাতির পরিচিতি ও জাত নির্বাচন

নাশপাতির পরিচিতি ও ব্যবহার

বহুবর্ষজীবী ও মাঝারি ধরণের গাছ, নাশপাতি গাছ খাড়া ও অল্প ঝোপালো। প্রতি বছর ফল ধরে, শীতে পাতা ঝরে ও গ্রীষ্মে এক সঙ্গে পাতা ও ফুল আসে। ফুলের রং সাদা, ডালের যে কোন প্রান্তে গুচ্ছবদ্ধভাবে ফুল

ফোটে। ফল দেখতে অনেকটা পেয়ারার মত। এশিয়ান নাশপাতির ২০ রকম আবাদি জাত বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশে জন্মানো নাশপাতির এ গাছটি পূর্ব এশিয়ান একটি প্রজাতি। এ প্রজাতিটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রায় জন্মাতে ও ফলন দিতে পারে। ফল হিসেবে প্রধানত ব্যবহার হয়। মিশ্র সালাদ হিসেবে জনপ্রিয়তা আছে। শরীরে মেদ, চর্বি কমাতে সাহায্য করে। নাশপাতি সাধারণভাবে হার্টের জন্য খুবই উপকারী। এটি এই কারণে যে নাশপাতিতে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম রয়েছে, যার অর্থ এটিতে ক্ষারীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা হৃদয়ের কাজে উপকারী প্রভাব ফেলে। আপেলের মতো নাশপাতি ফুসফুসের জন্যও ভালো।

বৈজ্ঞানিক নাম: *Pyrus pyrifolia*

পুষ্টিগুণ

নাশপাতি পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম নাশপাতি সাধারণত ৯.৩৯ কি. ক্যালরি খাদ্যশক্তি, ৩.১ গ্রাম হজমযোগ্য আঁশ, ০.৩৬ গ্রাম আমিষ, ০.১৪ গ্রাম স্নেহ, ১৫.২৩ গ্রাম শর্করা, ৯ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ০.১৮ মি.গ্রাম লৌহ, .০১২ মি.গ্রাম ভিটামিন বি$_{১}$, ০.০২৬ মি.গ্রাম ভিটামিন বি$_{২}$, ৪.৩ মি. গ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে।

জাত নির্বাচন

বাংলাদেশে এশিয়ান প্রজাতির বারি নাশপাতি-১ নামে একটি জাত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে। এ জাতের ফল বাদামী রঙের, ফলের গড় ওজন ১৩৫ গ্রাম, ফলের উপরিভাগের ত্বক সামান্য খসখসে, শাঁস সাদাটে, খেতে কচকচে ও সুস্বাদু এবং ব্রিক্সমান ১০%।

২.৩.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

জলবায়ু ও মাটি

নাশপাতি মূলত শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল হলেও নতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় এর সফল উৎপাদন হচ্ছে। বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকার আবহাওয়া নাশপাতি চাষের অনুকূলে। বাংলাদেশে আবাদকৃত এ প্রজাতিটির জন্য উর্বর, সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ মাটি উত্তম। নাশপাতি চাষের জন্য সূর্যালোক প্রয়োজন। শুষ্ক, গরম বায়ু নাশপাতির জন্য ক্ষতিকর। মাটির পিএইচ মান ৫.৫-৭.৫ উত্তম। তবে এর চেয়ে কম-বেশি হলেও নাশপাতি জন্মাতে ও ফলন দিতে পারে। গাছ লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে না।

বাগানের লে-আউট তৈরি

বর্গাকার পদ্ধতিতে ৫ মিটার x ৫ মিটার রোপণ দূরত্বে লে-আউট তৈরি করে কলমের চারা রোপণ করলে বাগান দেখতে সুন্দর হয় এবং প্রতিটি চারা সমানভাবে আলো-বাতাস পায় ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।

গর্ত তৈরি ও সার প্রয়োগ

মধ্য জুলাই থেকে মধ্য আগস্ট মাসে (শ্রাবণ) চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের মাসখানেক আগে চারিদিকে ৬০ সে.মি. X ৬০ সে.মি. X ৬০ সে.মি. আকারের গর্ত তৈরি করে নিতে হয়। গর্ত খনন করার

সময় উপরের দুই তৃতীয়াংশ মাটি একদিকে এবং নিচের এক তৃতীয়াংশ মাটি অন্যদিকে রাখতে হবে। নিচের মাটির সাথে প্রতি গর্তে চারা রোপণের ১০-১৫ দিন আগে পচা গোবর ১০ কেজি, ১ কেজি খৈল, টিএসপি সার ২০০ গ্রাম, এমওপি সার ২০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হয় এবং উক্ত সার মিশ্রিত মাটি গর্তের নিচে ভরতে হবে। নিচের বাকি এক তৃতীয়াংশ মাটি গর্তের উপরে ভরাট করতে হবে। গর্তে মাটি ভরাট করে পানি দিয়ে মাটি ভজিয়ে দিতে হবে।

২.৩.৩ চারা সংগ্রহ ও রোপণ

চারা সংগ্রহ

নাশপাতির প্রকৃত মাতৃগাছের কলম সংগ্রহের জন্যে জাত উদ্ভাবনকারী সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা ভাল। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার সেন্টার এবং বিএডিসির উদ্যান কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নার্সারী হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। অথবা নিজে কুড়ি সংযোজনের মাধ্যমে **চারা তৈরি করা যায়।** তবে গুটিকলমের বিস্তার পদ্ধতিতে ও চাষাবাদ করা যায়। সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে কলম বাঁধা হয়। কলম তৈরির জন্য লেবু, লিচু ইত্যাদির মত উপাদান ব্যবহার করা যায়। জুলাই-আগষ্টে কলম কাটার উপযোগী সময়।

চারা রোপণ

চারা থেকে পলিব্যাগ সাবধানে অপসারণ করতে হবে যাতে চারার গোড়ার মাটির চাকা ভেঙ্গে না যায়। গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে নির্বাচিত বা সংগ্রহকৃত সবল সতেজ রোগমুক্ত চারা কলমটি গোড়ার মাটির চাকাসহ সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে বসিয়ে দিতে হবে। বীজতলায় চারাটির যতটুকু অংশ মাটির নিচে ছিল রোপণের সময় ঠিক ততটুকু অংশ মাটির নিচে রাখতে হবে। চারার চারপাশের মাটি ভালভাবে চেপে ঠেসে দিতে হবে যাতে কোন ফাঁকা জায়গা না থাকে।

২.৩.৪ আন্ত: পরিচর্যা

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

রোপণের পরপরই চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে। চারাটি যাতে হেলে না পড়ে সেজন্য শক্ত খুঁটির সাথে চারা বেঁধে দিতে হবে এবং খাঁচা দিয়ে চারাকে গবাদি পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। মাটি আলগা করা এবং প্রয়োজনে গোড়ায় মাটি দিতে হবে। রোগে আক্রান্ত বা মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছা নাশপাতি গাছের অন্যতম শত্রু এবং বিভিন্নভাবে গাছের ক্ষতি করে থাকে। গাছের গোড়া ও নালার আগাছা সব সময় পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন।

ডালপালা ছাঁটাইকরণ

গাছের আকার ছোট রাখার জন্য গাছের উচ্চতা ৪০-৫০ সে.মি. হলে ভেঙ্গে বা ছোট করে দিতে হবে। পরের বছর পার্শ্ব শাখা ২০-২৫ সেমি রেখে কেটে দিতে হবে। গাছের গোড়ার দিকে জল/শোষক শাখা বের হলে কেটে ফেলতে হবে। গাছ বড় হলে ডালগুলো ভূমির দিকে বাঁকা করে দিলে বেশি ফলন পাওয়া যায়। মাঝে

মাঝে গাছের ডালপালা ছাঁটাই করে নতুন শাখা প্রশাখা বের হবার সুযোগ করে দিলে ফলন বৃদ্ধি পায়। শীতকালে ফল সংগ্রহের পর ডালপালা ছাঁটাই করতে হয়। নাশপাতির খাড়া ঢালে নতুন শাখা-প্রশাখা কম হয়। এজন্য খাড়া ডালগুলো ওজন বা টানার সাহায্যে ভূমির দিকে বাঁকা বা নুয়ে দিলে প্রচুর সংখ্যক নতুন শাখা গজায়। এতে অধিক পরিমানে ফুল ও ফল উৎপাদিত হয় এবং ফলন ও ফলের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়।

সেচ ও নিকাশ

নাশপাতির চারা রোপন হয়ে গেলে জলঝরির মাধ্যমে ঝরণা দিয়ে বেশ কিছুদিন সেচ দিতে হবে। সবসময় খরা মৌসুমে সেচ দেওয়া ভালো। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক, তাই জন্য এই নির্দিষ্ট সময়ে সেচ গাছের পক্ষে উপকারী। বর্ষাকালে যাতে গাছের গোড়ায় জল জমতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা উচিত।

মালচিং

আগাছা পরিষ্কার করার পর এবং সার প্রয়োগের পর আগাছা বা লতাপাতা/খড়কুটো দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হবে। এতে গাছের গোড়ার রস সংরক্ষণে সহায়ক হবে এবং পচে জৈব সার হিসেবে গাছের কাজে লাগবে।

সার ব্যবস্থাপনা

নাশপাতি গাছে নাইট্রোজেন সারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তাই গাছ লাগানোর ৩০ থেকে ৪০ দিন পর গাছ প্রতি ১০০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ হবে-

গাছের বয়স (বছর)	পঁচা গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২	১০	২০০	২৫০	২০০
৩-৫	১৫	৪০০	৪০০	৪০০
৬-৯	২০	৫০০	৫০০	৫০০
১০ এবং এর উর্দ্ধে	৩০	৭৫০	৭৫০	৭৫০

উপরোক্ত সার বছরে ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। বর্ষার আগে মধ্য চৈত্র থেকে মধ্য জৈষ্ঠ্য মাসে (এপ্রিল-মে) একবার এবং বর্ষার শেষে মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক মাসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) দ্বিতীয়বার সার দিতে হয়। সার দেওয়ার সময় অবশ্যই হালকা পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

নাশপাতি গাছে তেমন কোন মারাত্মক পোকামাকড় ও রোগবালাই নেই। নাশপাতিতে কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা ও উঁই পোকার আক্রমণ বেশি। কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকাগুলোর শুটকীট কাণ্ড ছিদ্র করে। ফলে আক্রান্ত ডাল শুকিয়ে মরে যায়। নাশপাতিতে পোকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক পানির সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ থেকে নাশপাতি রক্ষা পায়। এছাড়া কাঠবিড়ালী এবং কোনো

কোনো প্রজাতির পাখি নাশপাতি খেয়ে থাকে। এগুলো থেকে নাশপাতির বাগান করার জন্য টিনের সঙ্গে লাঠি বেঁধে দড়ি দ্বারা টেনে উচ্চশব্দ তৈরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রোদ, পোকামাকড় ও কাঠবিড়ালি থেকে নাশপাতি রক্ষা করতে ব্যবহার করা হবে ব্যাগিং প্রযুক্তি। প্রতিটি গাছে সাদা সাদা ব্যাগে নাশপাতি মোড়ায়ে ব্যাগিং করতে হবে। নাশপাতির বিভিন্ন রোগের মধ্যে কান্ডের কালো ছত্রাক বা ফাঙ্গাস রোগই প্রধান। যে কোন বয়সের ডালে এ রোগ হতে পারে। প্রতিকারের জন্য আক্রান্ত শাখা ছেটে দিতে হবে এবং ক্ষতস্থানে বোর্দোপেষ্ট লাগাতে হবে। এছাড়া পুরানো কান্ডে কালো ব্যান্ড হয়, যা পার্বত্য এলাকার নাশপাতির একটি প্রধান রোগ।

২.৩.৫ ফল সংগ্রহ

মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছে ফুল আসে। জুলাই মাসের শেষ পক্ষে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের শুরুতে যখন ফলের ত্বক সবুজ অবস্থা থেকে হালকা হলুদ রং ধারণ করতে শুরু করে (২৫-৫০%) তখন ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল অতি সাবধানে সংগ্রহ করা প্রয়োজন যাতে মাটিতে না পড়ে। কারণ আঘাতপ্রাপ্ত ফল সংরক্ষণ করা যায় না।

ফলন: কলমের চারা লাগানোর ৩-৪ বছরের মধ্যে গাছে ফল ধারণ শুরু হয়। ফল আলাদাভাবে এবং থোকায় থোকায় আসে। ৬-৭ বছর বয়সী গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৬০-৭০টি। ১০ বছর বয়সী নাশপাতি গাছের বাৎসরিক ফলন প্রায় ১০ কেজি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ফলনও বাড়তে থাকে। গাছের বয়স ও আকারভেদে নাশপাতির ফলনে তারতম্য ঘটে। একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে ২০ - ৪০ কেজি পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। বয়স্ক গাছে বার্ষিক গড়ে ২০০ থেকে ৩০০ টির মত ফল ধরে। গড় ফলন ৬-৭ টন/হেক্টর।

২.৩.৬ ফল সংরক্ষণ

ফল সংগ্রহের পর সংরক্ষণের জন্য ভালভাবে বাছাই করা দরকার যাতে কোনরুপ ত্রুটিযুক্ত ফল না থাকে। তারপর কাগজ বা কাঠের বাক্স করে বাজারজাত করা উত্তম। এভাবে ১০-১২ দিন পর্যন্ত ফল সংরক্ষণ করা যায়। ফল বেশি পাকলে ফল সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যায়।

২.৪ কামরাঙা চাষ (Carambola)

কামরাঙার পাতার রঙে ফলের রঙ হয় বলে ফলগুলোকে গাছ থেকে পৃথক করে ফেলা কঠিন। এক দৃষ্টিতে তাকালে একটুখানি বেগ পেতে হয়। কামরাঙা একটি অপ্রধান ফল হলেও অম্লমধুর স্বাদযুক্ত এবং ভিটামিন ‘এ’ ও ‘সি’ সমৃদ্ধ এ ফলটি দেশের সর্বত্রই সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ফল। দেশের সর্বত্র বাড়ির আঙ্গিনায় দু‘একটা গাছ দেখা যায়। গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, ঢাকা, সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বেশ জন্মে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া এর উৎপত্তি স্থান। কামরাঙ্গা একটি রপ্তানিযোগ্য ফল হওয়ায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে। দেশে ১৭০০ হেক্টর জমিতে নাশপাতির আবাদ হয় এবং উৎপাদন ১৪৩১০ মেট্রিক টন (বিবিএস ২০২১)। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন প্রায় ৮.৪ মেট্রিক টন।

২.৪.১ কামরাঙার পরিচিতি ও জাত নির্বাচন

কামরাঙার পরিচিতি ও ব্যবহার

এটি স্টার ফল (**Starfruit**) নামেও পরিচিত। *কামরাঙা* একটি চিরসবুজ ছোট মাঝারি আকৃতির গাছের টকমিষ্টি ফল। কামরাঙা, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা অঞ্চলের একধরনের স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদের ফল। এই ফল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-প্রশান্ত এবং পূর্ব-এশিয়া অংশে জনপ্রিয়। কামরাঙা গাছ দেখতে সুন্দর। টক-মিষ্টি দু‘জাতের কামরাঙা দেখা যায়। কামরাঙা হতে জেলি, জ্যাম, মোরব্বা, চাটনি, আচার ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায়। তাছাড়া মরিচ লবন দিয়ে ভর্তা বানিয়ে গরমের দিনে মজা করে খাওয়া হয়।

বৈজ্ঞানিক নাম: *Averrhoa carambola*

পুষ্টিগুণ

কামরাঙা পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম কামরাঙায় ৮৮.৬ গ্রাম জলীয় অংশ, ৫০ কি. ক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১.০ গ্রাম হজমযোগ্য আঁশ, ০.৫ গ্রাম আমিষ, ১.০ গ্রাম স্নেহ, ৯.৫ গ্রাম শর্করা, ১১ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ১.২ মি.গ্রাম লৌহ, ০.১ মি. গ্রাম ক্যারোটিন, ০.১২ মি.গ্রাম ভিটামিন বি$_{১}$, ০.০৪ মি.গ্রাম ভিটামিন বি$_{২}$, ৬১ মি.গ্রা. ভিটামিন সি রয়েছে।

২০২৪

জাত নির্বাচন

বারি কামরঙা-১,২ ও বাউ কামরঙা-১,২,৩

বারি কামরাঙ্গা-১: উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম খাড়া ও ঝোপালো। বছরে তিনবার ফল দেয় (জুলাই-আগস্ট, নভেম্বর-ডিসেম্বর এবং ফেব্রুয়ারি)। ফল মাঝারী (গড় ওজন ৯৭ গ্রাম), লম্বাটে, রং হালকা হলুদ, শাঁস সাদা, রসালো, কচকচে মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৭.৫%) এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৯%। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৫ টন। সমগ্র দেশে চাষোপযোগী এবং জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

চিত্র: বারি কামরাঙা-১

চিত্র: বারি কামরাঙা-২

বারি কামরাঙ্গা-২

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম খাড়া ও মধ্যম ঝোপালো। বছরে তিনবার ফল দেয় (জানুয়ারি, জুলাই, এবং অক্টোবর)। ফল মাঝারী (গড় ওজন ১০০ গ্রাম), ডিম্বাকৃতির ও রং হালকা হলুদ। শাঁস সাদা, রসালো, কচকচে ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৮.০%)। এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৯%। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫৩ টন। সমগ্র দেশে চাষোপযোগী এবং জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

২.৪.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

মাটি ও জমি নির্বাচন

উঁচু ও মাঝারি উঁচু সুনিষ্কাশিত গভীর দো-আঁশ মাটি কামরাঙা চাষের জন্য উত্তম। তবে যে কোন মাটিতেই এটি জন্মে। পাহাড়ী এলাকাতেও ভাল ফলে। এর জন্য আর্দ্র পরিবেশ প্রয়োজন। এদের কিছুটা ঠান্ডা সহ্য করার ক্ষমতা আছে। উন্মুক্ত বা আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে কামরাঙ্গা চাষ করা যায়।

বাগানের লে-আউট তৈরি

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তাকার এবং পাহাড়ী ভূমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে ৬-৭ মি রোপণ দূরত্বে লে-আউট তৈরি করে কলমের চারা রোপণ করলে বাগান দেখতে সুন্দর হয় এবং প্রতিটি চারা সমানভাবে আলো-বাতাস পায় ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।

জমি প্রস্তুত, গর্ত বা পিট তৈরি ও গর্তে সার প্রয়াগ

জমি তৈরির পূর্বে জমি হতে আগাছা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গাছপালা কেটে জমিতে রেখেই সেগুলো রোদে শুকাতে হবে। তারপর তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে এবং কোদাল দিয়ে কুপিয়ে সেসব ছাই মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এতে আগাছা পরিষ্কার, জীবাণু ও পোকামাকড় ধ্বংস এবং চাষের কাজ হয়ে যাবে। কামরাঙা চাষে জমি ভালো ভাবে চাষ ও মই দিয়ে সমতল করে নিতে হবে। মাটি ঝুরঝুরা করে নিতে হবে। রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৬-৭ × ৬-৭ মিটার দূরত্বে ৭৫×৭৫×৭৫ সেমি আকারের গর্ত করতে হবে। মাটিতে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের আকার হবে গর্ত তৈরি করে তাতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গোবর সার ১৫-২০ কেজি, পটাশ সার ২৫০ গ্রাম, ফসফেট ২৫০ গ্রাম, ইউরিয়া ১০০ গ্রাম গর্তের মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে । সার গুলো মাটির সাথে যেন ভালো ভাবে মিশে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে পানি সেচ দিতে হবে।

২.৪.৩ চারা সংগ্রহ ও রোপণ

চারা সংগ্রহ

কামরাঙার প্রকৃত মাতৃগাছের কলম সংগ্রহের জন্যে জাত উদ্ভাবনকারী সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা ভাল। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার সেন্টার এবং বিএডিসির উদ্যান কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নার্সারী হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বীজ বা এক বছর বয়স্ক ক্ল্যাফট গ্রাফটিং বা ভিনিয়ার কলমের চারা জমিতে রোপণের জন্য সংগ্রহ করতে হবে। বীজের গাছে মাতৃ গাছের গুণাগুণ পুরোপুরি বজায় থাকে না। বীজের গাছে ফল দিতে ৩-৪ বছর সময় লাগে। অঙ্গজ পদ্ধতিতে তৈরি কলমের গাছে মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং লাগানোর পরবর্তী বছর থেকেই ফল দিতে শুরু করে।

বীজ বপন/চারা রোপণ

চারা বা কলম রোপণের উপযুক্ত সময় মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুন-সেপ্টেম্বর) মাস। তবে সেচ সুবিধা থাকলে আশ্বিন- কার্তিক (অক্টোবর) মাস পর্যন্ত চারা/কলম রোপণ করা যেতে পারে। বপনের আগে বীজ সাবান দিয়ে ধুয়ে নিলে অংকুরোদগম ভাল হয়। চারা থেকে পলিব্যাগ সাবধানে অপসারণ করতে হবে যাতে চারার গোড়ার মাটির চাকা ভেঙ্গে না যায়। গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে নির্বাচিত বা সংগ্রহকৃত এক বছর বয়সের সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা কলমটি গোড়ার মাটির চাকাসহ সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে বসিয়ে গোড়ার মাটি একটু উঁচু করে দিতে হবে। বীজতলায় চারাটি যতটুকু অংশ মাটির নিচে ছিল রোপণের সময় ঠিক ততটুকু অংশ মাটির নিচে রাখতে হবে। চারার চারপাশের মাটি ভালভাবে চেপে ঠেসে দিতে হবে যাতে কোন ফাঁকা জায়গা না থাকে। গর্তের মাঝখানে চারা বসিয়ে চারা লাগানোর পর একটা শক্ত কাঠির সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। তারপর সেচ দিতে হবে।

২.৪.৪ আন্ত: পরিচর্যা

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

রোপণের পরপরই চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে। চারাটি যাতে হেলে না পড়ে সেজন্য শক্ত খুঁটির সাথে চারা বেঁধে দিতে হবে এবং খাঁচা দিয়ে চারাকে গবাদি পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। মাটি আলগা করা এবং প্রয়োজনে গোড়ায় মাটি দিতে হবে। রোগে আক্রান্ত বা মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছা কামরাঙা গাছের অন্যতম শত্রু এবং বিভিন্নভাবে গাছের ক্ষতি করে থাকে। গাছের গোড়া ও নালার আগাছা সব সময় পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন।

ডালপালা ছাঁটাইকরণ

ফল সংগ্রহের পর কামরাঙার গাছে নিয়মিত ডাল ছাঁটাইয়ের দরকার হয় না। রোপপণকৃত চারা/কলমকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য এর গোড়ার দিকের ডাল ছাঁটাই করতে হবে। প্রধান কান্ডটিতে মাটি থেকে কমপক্ষে ১ মিটারের মধ্যে কোন ডাল রাখা চলবে না। এ ছাড়া শীতকালীন ফল সংগ্রহের পর মচকানো, মরা, রোগাক্রান্ত, পোকাক্রান্ত ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে।

সেচ ও নিকাশ

কামরাঙার চারা রোপন হয়ে গেলে জল ঝাঝরির মাধ্যমে ঝরণা দিয়ে বেশ কিছুদিন সেচ দিতে হবে। সবসময় খরা মৌসুমে সেচ দেওয়া ভালো। ফল ধরার পর প্রতি ১৫ দিন পরপর ২-৩ বার সেচ দিলে ফল ঝরার মাত্রা কমে যাবে এবং ফলন বৃদ্ধি পাবে। বর্ষাকালে যাতে গাছের গোড়ায় জল জমতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা উচিত।

মালচিং

আগাছা পরিষ্কার করার পর এবং সার প্রয়োগের পর আগাছা বা লতাপাতা/খড়কুটো দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হবে। এতে গাছের গোড়ার রস সংরক্ষণে সহায়ক হবে এবং পচে জৈব সার হিসেবে গাছের কাজে লাগবে।

সার ব্যবস্থাপনা

কামরাঙা গাছে নাইট্রোজেন সারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তাই গাছ লাগানোর ৩০ থেকে ৪০ দিন পর গাছ প্রতি ১০০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ হবে-

সারের নাম	গাছের বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমান			
	১-৩ বছর	৪-৬ বছর	৭ - ১০ বছর	১০ বছরের উর্ধ্বে
জৈব সার (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-৩০	৩০-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০-৪০০	৪০০-৬০০	৬০০-৮০০	৮০০-১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০-৩০০	৩০০-৪০০	৪০০-৫০০	৫০০-৬০০
এমওপি (গ্রাম)	২৫০-৩০০	৩০০-৪০০	৪০০-৪৫০	৪৫০-৫০০

২০১৪

উল্লেখিত সার ২ কিস্তিতে প্রথমবার বর্ষার আগে ও দ্বিতীয়বার বর্ষার শেষের দিকে প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর প্রয়োজনে পানি সেচ দিতে হবে।

পোকামাকড় দমন

১। বাকল ও ডাল ছিদ্রকারী পোকা

কামরাঙ্গার ক্ষতিকর পোকাসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। এ পোকা গাছের বাকল ও ডাল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে। তাছাড়া কখনও কখনও এরা প্রশাখার কর্তিত অংশ দিয়েও ডালের ভিতর প্রবেশ করে। এ পোকার কীড়া রাতের বেলায় গাছের বাকল খেয়ে গাছের খাদ্য চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়। আক্রমণ বেশি হলে পুরো গাছটাই এক সময় শুকিয়ে মারা যায়। গাছে এ পোকার উপস্থিতি খুব সহজেই ডালের গায়ে ঝুলে থাকা কাঠের গুঁড়া-মিশ্রিত মলের ছোট ছোট দানা দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব। দিনের বেলায় কীড়া গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং রাতের বেলা সচল হয়।

প্রতিকার

ক) ডালের গায়ে ঝুলে থাকা কাঠের গুঁড়া মিশ্রিত মল পরিষ্কার করতে হবে ও কান্ডের ভিতরের পোকা বের করে মেরে ফেলতে হবে।

খ) ডালের গর্তের মধ্যে কেরোসিন বা পেট্রোল অথবা ন্যাপথোলিন প্রবেশ করিয়ে কাদা মাটি দ্বারা ছিদ্রের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে।

গ) মার্শাল-২০ ইসি অথবা রগর/রকসিয়ন-৪০ ইসি জাতীয় কীটনাশক ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছে এক সপ্তাহ পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে। পোকায় খাওয়া বাকল চেঁছে কপার জাতীয় ছত্রাকনাশকের প্রলেপ দিতে হবে।

২। ফল ছিদ্রকারী পোকা

টক জাতের কামরাঙ্গায় এ পোকার আক্রমণ কম হলেও বারি কামরাঙ্গা-১, বারি কামরাঙ্গা-২ ও অন্যান্য মিষ্টি জাতে মাঝে মাঝে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এ পোকা ফলের গায়ে ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে উৎপন্ন শুককীট ফলের শাঁস খেয়ে ভিতরে ঢুকে। এতে ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

প্রতিকার

ক) আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে কীড়াসহ মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে।

খ) বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

গ) আলোক ফাঁদ ব্যবহার করেও এদের দমন করা যায়। ফল ধরার পর সুমিথিয়ন/লেবাসিড ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

২০১৪

গ) অনিষ্টকারী মেরুদন্ড প্রাণি

টিয়া পাখি কামরাঙ্গার প্রধান শত্রু। এরা যতটুকু ফল খায় তার চেয়ে অনেক বেশি নষ্ট করে। ফল সামান্য বড় হওয়ার পর থেকেই টিয়া পাখির আক্রমণ শুরু হয়।

প্রতিকার

গাছকে জাল দ্বারা ঢেকে অথবা টিন পিটিয়ে শব্দ সৃষ্টির মাধ্যমে টিয়া পাখির আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করতে হবে।

রোগবালাই দমন

এ্যানথ্রাকনোজ রোগ

এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। পাতা, ফুল ও ফলে এ রোগ হতে পারে। প্রথমে ছোট ছোট বাদামী রঙের দাগের মাধ্যমে এ রোগের শুরু হয় এবং আস্তে আস্তে এ দাগগুলো বড় হয়ে কালো বর্ণ ধারণ করে এবং আক্রান্ত স্থান পচে যায়।

আক্রান্ত পাতা, ফুল ও ফল ঝরে যেতে পারে।

প্রতিকার

আক্রান্ত পাতা, ফুল ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দিলে অটোস্টিন অথবা নোইন ৫ ডবলিউপি প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বোঁটা পচা রোগ

এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। পরিষ্কার শুষ্ক দিনে ফল সংগ্রহ করতে হবে। সামান্য বোঁটাসহ ফল সংগ্রহ করতে হবে।মাঝে মাঝে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

২.৩.৫ ফল সংগ্রহ

মার্চ-এপ্রিল মাসে কামরাঙা গাছে ফুল আসে এবং নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী সময়ে ফল পাকে। কোন কোন গাছ বছরে একাধিকবার ফল দিয়ে থাকে। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের শুরুতে যখন ফলের ত্বক সবুজ অবস্থা থেকে হালকা উজ্জ্বল হলুদ রং ধারণ করতে শুরু করে (২৫-৫০%) তখন ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল অতি সাবধানে সংগ্রহ করা প্রয়োজন যাতে মাটিতে না পড়ে। কারণ আঘাতপ্রাপ্ত ফল সংরক্ষণ করা যায় না। গাছে ঝাকি দিয়ে ফল আহরণ করা যাবে না। হাত দিয়ে বা জাল লাগানো কোটার সাহায্যে খুব সাবধানে ফল সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত ফল সরাসরি রোদে না রেখে ছায়ায় রাখতে হবে। বৃষ্টির পরপরই ফল সংগ্রহ করা ঠিক নয়।

ফলন: প্রতি গাছে বছরে ফলন ৫০-১০০ কেজি।

২.৩.৬ ফল সংরক্ষণ

পাকা ফল সাধারণ তাপমাত্রায় ২-৩ দিন সংরক্ষণ করা যায়। পাকা ফল না ধুয়ে প্লাস্টিক ব্যাগে ১ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। পানিতে ধুয়ে পাকা ফল পাতলা টুকরা (Slice) করে ফ্রিজে ১ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

২.৫ কুল বা বরই চাষ (Cultivation of Jujube)

কুল বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ফল। আকারে ছোট হলেও অম্লমধুর, মিষ্টি স্বাদের জন্য প্রায় সব বয়সের মানুষই কুল পছন্দ করে। কুল খাদ্য হিসাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিভিন্ন খনিজদ্রব্য এবং ভিটামিন এ ও ভিটামিন সি এর একটি ভাল উৎস হচ্ছে কুল। কুল সাধারণত পাকা ও টাটকা অবস্থায় খাওয়া হয়। বাংলাদেশের আনাছে কানাচে অনেক রকমের ও স্বাদের কুল চোখে পড়ে। তবে রাজশাহী, নওগাঁ, কুমিল্লা, সাতক্ষীরা, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ঢাকা, গাজীপুর, নাটোর, ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলায় উৎকৃষ্ট জাতের কুল বেশি পরিমানে চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রায় ১৫৬৫০ হেক্টর জমিতে কুল আবাদ হয় এবং মোট উৎপাদন প্রায় ১,০৭,৯৬০ মেট্রিক টন । হেক্টরপ্রতি ফলন প্রায় ৬.৯ মেট্রিক টন। আমাদের দেশে বাজারে জানুয়ারী থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কুল পাওয়া যায়।

২.৫.১ কুলের পরিচিতি ও জাত নির্বাচন

কুলের পরিচিতি ও ব্যবহার

কুল বা বরই দক্ষিণ এশিয়ায় বহুল প্রচলিত কন্টকাপূর্ণ গাছের ফল। ভারতের উত্তরাঞ্চল, চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও মালয়েশিয়ার মধ্যবর্তী এলাকা কুলের আদি জন্মস্থান। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার শুষ্ক এলাকায় কুলের চাষ হয়। কুল থেকে আচার, চাটনি ও অন্যান্য মুখরোচক খাবার তৈরি করা যায়। কুল শুকিয়েও পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য ঘরে রেখে দেয়া যায়। তাছাড়া আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে কুলের বহুবিধ ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। কুল গাছে *Tachardia laccad* নামক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকা লালন করে গালা (Lac) তৈরি করা যায়।

২০১৪

বৈজ্ঞানিক নাম: *Zizyphus mauritiana*

পুষ্টিগুণ

কুল পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম কুলে সাধারণত ১০৪ কি. ক্যালরি খাদ্যশক্তি, ৭৩.২ গ্রাম পানি, ২.৯ গ্রাম আমিষ, ০.১ গ্রাম স্নেহ, ২৩.৮ গ্রাম শর্করা, ১১ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ১ গ্রাম মোট খনিজ পদার্থ, ০.০২ মি.গ্রাম ভিটামিন বি$_{১}$, ০.০৫ ভিটামিন বি$_{২}$, ৫১ মি. গ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে। এটি রক্ত শোধন, রক্ত পরিস্কার এবং হজমিকারক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া পেটে বায়ু, অরুচি ও প্রদর রোগে ফুল থেকে তৈরি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কুলের জাত ও পরিপক্কতার বিচারে এর খাদ্যমানের কিছুটা তারতম্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

জাত নির্বাচন

বারি কুল-১: এটি নারিকেলী জাত নামে পরিচিত। দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত রাজশাহী ও খুলনা এলাকায় চাষাবাদের জন্য এটি একটি উপযুক্ত জাত। ফল আকারে বড়, ওজন গড়ে ২৩ গ্রাম ও লম্বা।

বারি কুল-২: জাতটি উত্তারাঞ্চলে চাষাবাদের জন্য ভাল হলেও দেশের অন্যত্রও চাষ করা যায়। ফল আকারে বড় ও ডিম্বাকৃতি।

বারি কুল-৩: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর আবিষ্কার করে। এটি উন্নত জাত। দেখতে ফল বড়, গোলাকার, হলুদাভ সবুজ রং হয়, রসালো ও মিষ্টি। সারাদেশে চাষাবাদের উপযোগী। ব্রিক্স মান ১৪%। শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮৮ – ১০০, হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২২-২৫।

আপেল কুল: আপেল কুল বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মোফাজ্জল হোসেন কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং জাতীয় বীজ বোর্ড থেকে অনুমোদিত। আপেল এর মতো রঙ হওয়ার জন্যে কুলটির নাম দেওয়া হয়েছে আপেল কুল। মিষ্টি স্বাদের জন্য অন্য কুলের চেয়ে এটি অনেক ভালো।

বাউকুল-১: ফল আকারে অনেক বড় হয় (গড়ে ৯০ গ্রাম)। মিষ্টতার পরিমানও অনেক বেশি। আগাম পরিপক্ক হয়। সারা দেশেই চাষ করা যায়।

বাউ কুল-২: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর আবিষ্কার করে। এটি উন্নত জাত। দেখতে ফল বড়, ডিম্বাকার, হলুদ রং হয়। সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল। ব্রিক্স মান ২২-২৪%। শতক প্রতি ফলন (কেজি): ৮০ – ১০০, হেক্টর প্রতি ফলন (টন): ২০-২৫।

নারিকেলী কুল: নারিকেলী কুল ফল লম্বাটে ও মাকু আকৃতির, অগ্রভাগ বেশ সুঁচালো, বীজ লম্বাটে ও ছোট, শাঁসের পরিমাণ বেশি। শাঁস বেশ মিষ্টি বা অম্লমধুর ও সুস্বাদু। সাতক্ষীরা, রাজশাহী ও তার আশেপাশের এলাকায় এ কুল বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

কুমিল্লা কুল: কুমিল্লা কুল কুমিল্লা জেলায় কচুয়া, বরুড়া ও চান্দিনা উপজেলা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এ কুল বেশি জন্মে। স্থানীয় ভাষায় একে ডাবা কুলও বলা হয়। এ কুল দেখতে অনেকটা ডাবের মত ডিম্বাকার, মিষ্টি, বেশ আকর্ষণীয়।

২.৪.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

মাটি ও জমি নির্বাচন

সব ধরনের আবহাওয়া বিশেষ করে শুকনো ও গরম আবহাওয়া পছন্দ করে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র যে কোন ধরনের মাটিতেই বিশেষ করে দোআঁশ মাটিতে কুলের চাষ ভাল হয়। কুলগাছ লবাণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা উভয়ই সহ্য করতে পারে।

বাগানের লে-আউট তৈরি

বর্গাকার বা কুইন্সকান্স পদ্ধতিতে ৪-৬ মিটার X ৪-৬ মিটার রোপণ দূরত্বে লে-আউট তৈরি করে চারা/কলম রোপণ করলে বাগান দেখতে সুন্দর হয় এবং প্রতিটি চারা সমানভাবে আলো-বাতাস পায় ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। তবে বাউকুল-১ বা থাই কুলের জন্য ৩ মি. X ৩ মি. অথবা ৩ মি. X ২ মি. এবং আপেল কুলের ক্ষেত্রে ৪ মি. X ৪মি.দুরত্বে রোপণ করা হয়।

জমি প্রস্তুত, গর্ত বা পিট তৈরি ও গর্তে সার প্রয়াগ

গর্ত তৈরি ও সার প্রয়োগ

জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে (মধ্য আষাঢ়-মধ্য ভাদ্র) কুলের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের মাসখানেক আগে চারিদিকে ৬০-৮০ সে.মি. X ৬০-৮০ সে.মি. X ৬০-৮০ সে.মি. আকারের গর্ত তৈরি করে নিতে হয়। গর্ত খনন করার সময় উপরের দুই তৃতীয়াংশ মাটি একদিকে এবং নিচের এক তৃতীয়াংশ মাটি অন্যদিকে রাখতে হবে। নিচের মাটির সাথে প্রতি গর্তে চারা রোপণের ১০-১২ দিন আগে পচা গোবর ২৫ কেজি, টিএসপি সার ২৫০ গ্রাম, এমওপি সার ২৫৫ গ্রাম এবং ইউরিয়া সার ২৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হয় এবং উক্ত সার মিশ্রিত মাটি গর্তের নিচে ভরতে হবে। নিচের বাকি এক তৃতীয়াংশ মাটি গর্তের উপরে ভরাট করতে হবে। গর্তে মাটি ভরাট করে পানি দিয়ে মাটি ভজিয়ে দিতে হবে।

২.৫.৩ চারা সংগ্রহ ও রোপণ

চারা সংগ্রহ

কুলের প্রকৃত মাতৃগাছের কলম সংগ্রহের জন্যে জাত উদ্ভাবনকারী সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা ভাল। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার সেন্টার এবং বিএডিসির উদ্যান কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নার্সারী হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। অথবা নিজে **চারা তৈরি করা যায়।** দু'ভাবে বংশ বিস্তার করা যায়। বীজ থাকে এবং কলম তৈরি করে। কলমের চারা উত্তম কারণ এতে বংশগত গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে। বলয়, তালি অথবা টি-বাডিং এর মাধ্যমে কলমের চারা তৈরি করা যায়।

চারা রোপণ

চারা থেকে পলিব্যাগ সাবধানে অপসারণ করতে হবে যাতে চারার গোড়ার মাটির চাকা ভেঙ্গে না যায়। গর্ত ভর্তি করার ১০-১২ দিন পর গর্তের মাঝখানে নির্বাচিত বা সংগ্রহকৃত সবল সতেজ রোগমুক্ত চারা /কলমটি গোড়ার মাটির চাকাসহ সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে বসিয়ে দিতে হবে। বীজতলায় চারাটি যতটুকু অংশ

মাটির নিচে ছিল রোপণের সময় ঠিক ততটুকু অংশ মাটির নিচে রাখতে হবে। চারার চারপাশের মাটি ভালভাবে চেপে ঠেসে দিতে হবে যাতে কোন ফাঁকা জায়গা না থাকে।

২.৫.৪ আন্ত: পরিচর্যা

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

রোপণের পরপরই চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে। চারাটি যাতে হেলে না পড়ে সেজন্য শক্ত খুঁটির সাথে চারা বেঁধে দিতে হবে এবং খাঁচা দিয়ে চারাকে গবাদি পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। মাটি আলগা করা এবং প্রয়োজনে গোড়ায় মাটি দিতে হবে। রোগে আক্রান্ত বা মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছা কুল গাছের অন্যতম শত্রু এবং বিভিন্নভাবে গাছের ক্ষতি করে থাকে। গাছের গোড়া ও নালার আগাছা সব সময় পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন।

ছাঁটাই

নতুন রোপনকৃত চারার ষ্টক হতে নতুন কুশি বের হলে ভেঙ্গে দিতে হবে। চারা গাছের কাঠামো মজবুত রাখার জন্য প্রথম বছরে গাছের গোড়া থেকে ৭৫ সে.মি উঁচু পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা যাবেনা। কুল গাছের বৃদ্ধি ও পরিমিত ফল ধরনের জন্য ডাল ছাঁটাই একটি জরুরি কাজ। ঠিকমতো ছাঁটাই না হলে বাগান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কলম মাটিতে লাগানোর পর একটি সতেজ ও বাড়ন্ত ডালকে উপরের দিকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনমতো সতেজ ডাল রেখে বাকিগুলো কেটে দিতে হবে। এ কাজে কাচি ব্যবহার করতে হবে ও কাঠি দিয়ে মূল গাছকে খাড়া রাখতে হবে। গাছ কাটতে হবে সমান করে, যাতে মূল গাছের কোন বাকল বা ছাল না উঠে এবং মূল গাছের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে খুব সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হবে। কাটা অংশটি কাঁচা গোবর বা আলকাতরা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এরপর কান্ডটিতে প্রচুর নতুন কুশি জন্ম নিবে। ফলে উপরের ২ ফুট অংশের নতুন গজানো শাখা প্রশাখায় গাছটি ছাতার মতো আকার নিবে এবং এক পর্যায়ে একটি ঝাকড়া গাছ হবে। অত:পর নতুন যে ডালপালা গজাবে সেগুলোও বাছাই করে ভাল ডালগুলো রেখে দুর্বল ডাল কেটে ফেলে দিতে হবে। প্রতি বছর মার্চে গাছ ছাঁটাই করতে হবে। বড় ডাল সাবধানে করাত দিয়ে কাটতে হবে। কুল গাছে সব সময় নতুন গজানো শাখায় মুকুল আসে। এজন্য নিয়মিত ছাঁটাইয়ের ফলে গাছে বেশি পরিমাণ নতুন শাখা-প্রশাখা গজাবে ও সেই সাথে বেশি পরিমাণ ফল ধরবে।

সেচ ও নিকাশ

চারা রোপণের পর প্রয়োজন অনুসারে সেচ দিতে হবে এবং অতিরিক্ত পানি সরিয়ে য়েলতে হবে। শুকনা মৌসুমে বিশেষ করে ফুল ও ফল ধরার সময়ে মাসে ১ বার সেচ দিরে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ফল ধরার পর ১৫ দিন পরপর সেচ দিলে আশানুরুপ ফলন পাওয়া যাবে। ফুল ফল ধরার সময় সেচ দিলে ফুল ফল ঝরা কমে আসে ও ফলের আকার বড় হয়।

মালচিং

আগাছা পরিষ্কার করার পর এবং সার প্রয়োগের পর আগাছা বা লতাপাতা/খড়কুটো দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হবে। এতে গাছের গোড়ার রস সংরক্ষণে সহায়ক হবে এবং পচে জৈব সার হিসেবে গাছের কাজে লাগবে।

সার ব্যবস্থাপনা

চারা রোপণের বছর বর্ষার পরে গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম করে এমওপি ও টিএসপি সার এবং ২০ গ্রাম ইউরিয়া সার চারার গোড়া থেকে ১৫ সে.মি. দূরে চারিদিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে হালকা পানি সেচ দিতে হবে।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ হবে-

গাছের বয়স (বছর)	পঁচা গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২	১০	২৫০	২৫০	২৫০
৩-৪	২০	৫০০	৪০০	৪০০
৫-৬	২৫	৭৫০	৬০০	৬০০
৭-৮	৩০	১০০০	৭৫০	৭৫০
৯ এর উর্দ্ধে	৪০	১২৫০	১০০০	১০০০

উপরোক্ত সার বছরে ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। বর্ষার আগে মধ্য চৈত্র থেকে মধ্য জৈষ্ঠ্য মাসে (এপ্রিল-মে) একবার এবং গাছে ফল ধরার পর মধ্য কার্তিক থেকে মধ্য পৌষ মাসে (নভেম্বর-ডিসেম্বর) দ্বিতীয়বার সার দিতে হয়। সার দেওয়ার সময় অবশ্যই হালকা পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যাঃ

গাছে কুল আসা শুরু করলে এবং ফল মটর দানার মত হলে ভেজিম্যাক্স পাতায় ও ফলের উপর প্রয়োগ করলে ফলন বেড়ে যায়।

সাথী ফসল চাষ

ছায়ায় আদা, হলুদ অথবা মুখী কচু, শাকসবজি এমনকি গমও চাষ করা সম্ভব। চাঁপই নবাবগঞ্জস্থ লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্রের এক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, কুল বাগান লাক্ষার সাথে সাথী ফসল হিসেবে রোপা আমন চাষে হেক্টর প্রতি ৪৯,০০০ টাকা, গমে ৬৪,০০০ টাকা, হলুদে ১,০৮,০০০ টাকা এবং কচুতে ১,২৪,০০০ টাকা নিট মুনাফা করা সম্ভব।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

কুল আমাদের দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌসুমী ফল। কুল চাষে ইতোপুর্বে পোকামাকড়ের আক্রমন তেমন দেখা না গেলেও বর্তমানে কুল চাষ বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন পোকামাকড়ের আক্রমন দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে কিছু পোকা কুলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করছে। ফলে কুলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ফসলটি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। এ সকল পোকা কিভাবে ক্ষতি করে এবং তা দমনে কি কি করণীয় সে বিষয়ে কিছু সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

ক) শুয়াপোকা: শুয়াপোকা কচি পাতা থেকে শুরু করে বয়স্ক পাতা খেয়ে অনেক সময় গাছকে পাতাশুন্য করে ফেলে।

চিত্র: ছবি: শুয়াপোকা

দমন:

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-কট বা রিপকর্ড বা সিমবুশ বা ফেনম ১০ ইসি) ১০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার পুরো গাছে স্প্রে অথবা ডেসিস ১০ লিটার পানিতে ২২.৫ মি.লি. মিশিয়ে প্রয়োগ করলে এ পোকা দমন করা যায়। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

খ) লাক্ষা পোকা: লাক্ষাপোকা প্রথমে কচি বিটপ আক্রান্ত করে। পরবর্তীতে সাদাটে লাল পোকাগুলো দ্বারা শাখা-প্রশাখা আক্রান্ত হয়ে শুকাতে শুরু করে। এতে গাছের ব্যপক ক্ষতি হয় এবং পরবর্তীতে ফলন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।

দমনঃ ডেসিস ১০ লিটার পানিতে ২২.৫ মি.লি. মিশিয়ে প্রয়োগ করলে এ পোকা দমন করা সম্ভব।

গ) ফলের বীজ ছিদ্রকারী/ভক্ষণকারী উইভিল পোকা: গাছের ফুল ফোটার সময় স্ত্রী পোকা ফুলের উপর ডিম পাড়ে। কুলের ভিতর ডিম থেকে কিড়া হয়ে পুর্নাঙ্গ উইভিল পোকার সৃষ্টি হয়। এ পোকা ফলের ভিতরে বীজটি কুরে কুরে খায়। বাহির হতে প্রাথমিক অবস্থায় ফলের গায়ে কোন ছিদ্র দেখা যায় না তবে আক্রান্ত ফলগুলো ছোট, গোলাকার এবং হলুদ হয়ে যায়। ফলের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, ফল ঝরে পড়ে। এ অবস্থায় ফল ভাঙ্গালে ফলের ভিতর কালচে খয়েরী রঙয়ের উইভিল পোকা দেখা যায়।

চিত্র: ফলের বীজ ছিদ্রকারী/ভক্ষণকারী উইভিল পোকা

দমন

১। কুল গাছে অসময়ে আসা ফুল ও কুড়ি নষ্ট করে ফেলতে হবে।

২। গাছ ও মাটিতে পড়ে যাওয়া আক্রান্ত ফলগুলো সংগ্রহ করে লার্ভা বা পিউপা বা পুর্ণ বয়স্ক পোকাসহ ধ্বংস করতে হবে।

৩। গাছে ফুল আসার আগে কিন্তু ফোটার আগে ম্যালাথিয়ন/সুমিথিয়ন ১০ লিটার পানিতে ২২.৫ মি.লি. মিশিয়ে প্রয়োগ করে এ পোকা দমন সম্ভব।

৪। যেহেতু পোকাটি ফলে ডিম পাড়ে এবং লার্ভা ফলের ভিতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেজন্যে আক্রমনের আগেই পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য পরাগায়নের পর ফল ধরা শুরু হলে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

ক) শুটি মোল্ড: শুটিমোল্ড রোগের আক্রমণে পাতা ও কান্ডে কালো স্পট পড়ে। পাতা ঝরে যায় এবং উৎপাদন ব্যহত হয়।

দমন: টিল্ট ২৫০ ইসি ১০ লিটার পানিতে ৫ মি.লি. মিশিয়ে প্রয়োগ করে এ পোকা দমন সম্ভব।

খ) পাউডারী মিলডিউ: এটি ছত্রাকজনিত একটি রোগ। এর আক্রমনে ফলন অনেক কমে যায়। পাতা ও ফলের উপর সাদাটে পাউডার দেখা যায়। আক্রান্ত ফুল ও ফল ঝরে পড়ে এবং উৎপাদন মারাত্মক ভাবে ব্যহত হয়।

অনুকুল পরিবেশ: গাছের পরিত্যক্ত অংশে এবং অন্যান্য পোষক উদ্ভিদে এ রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে। এটি বাতাসের মাধ্যমে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে।

বিস্তার: উষ্ণ ও ভিজা আবহাওয়ায় বিশেষকরে মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

ব্যবস্থাপনা: গাছে ফুল দেখা দেয়ার পর থিওভিট ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম বা টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি.লি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। পরবর্তী ১৫ দিন পর পর দুইবার স্প্রে করতে হবে।

২.৫.৫ ফসল সংগ্রহ

মধ্য পৌষ থেকে মধ্য চৈত্র (জানুয়ারী-মার্চ) মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। ফলের রঙ হাল্কা সবুজ বা হলদে হলে সংগ্রহ করতে হয়।

ফলন: গাছপ্রতি ৩০০-৪০০ কেজি ফল পাওয়া যায়।

২.৫.৬ ফল সংরক্ষণ

অন্যান্য ফলের মত কাঁচা পেড়ে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। অধিক গাছ থাকলে পাইকারী বিক্রির ব্যবস্থা নিতে হবে, ঘরে প্রচুর পাকা ফল জমে গেলে শুকিয়ে আচার, চাটনি বা অন্যভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

পাঠসংক্ষেপ

- হেমন্ত ও শীত মৌসুমে বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের প্রাপ্যতা প্রায় ২২ ভাগ এবং এর মধ্যে বেশিরভাগ ফল ভিটামিন সি সমৃদ্ধ।
- দেশে ৭৮০ হেক্টর জমিতে কমলার আবাদ হয় এবং উৎপাদন ৩,৭৪০ মেট্রিক টন (বিবিএস ২০২১)। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন প্রায় ৪.৮ মেট্রিক টন।
- ২৫-৩০° সে. তাপমাত্রা এবং আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান কমলা চাষের উপযোগী। কমলা চাষের জন্য মাটির আদর্শ পিএইচ (pH) ৫.৫-৬.০।
- চারা রোপণের পর ৩-৪ বছর পর্যন্ত কমলা বাগানে ফাঁকা জায়গায় শিম জাতীয় ফসল যেমন- মটরশুটি, ডাল ফসল, বরবটি, বাদাম, সানহেম্প ইত্যাদি রোপণ করে বাড়তি আয় করা সম্ভব।
- কমলা গাছে সাধারণত মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-চৈত্র (ফ্রেব্রুয়ারি থেকে মার্চ) মাসে ফুল আসে এবং মধ্য-কার্তিক থেকে মধ্য-পৌষ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর) মাসে ফল পাকে।
- তাজা কমলার ফল হিমাগারে সংরক্ষণ করলে ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও ৮০-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ২ মাস পর্যন্ত এবং ৫.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।
- আমাদের দেশে জাককাউ, ব্ল্যাকরুবি ও ব্ল্যাক পার্ল জাতের আঙ্গুর চাষ করা হয়ে থাকে।
- যেখানে প্রচুর সূর্যের আলো পড়ে এমন যায়গায় আঙুর চারা লাগাতে হবে।
- প্রতিবার ফুল ধরার পর ডাল বা শাখাটি পুরনো হয়ে যায় এবং ঐ ডাল বা শাখায় আর ফুল-ফল ধরে না।
- গাছের আকার ছোট রাখার জন্য গাছের উচ্চতা ৪০-৫০ সে.মি. হলে ভেঙ্গে বা ছোট করে দিতে হবে। মাঝে মাঝে গাছের ডালপালা ছাঁটাই করে নতুন শাখা প্রশাখা বের হবার সুযোগ করে দিলে ফলন বৃদ্ধি পায়।
- কামরাঙার বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Averrhoa carambola*
- মার্চ-এপ্রিল মাসে কামরাঙা গাছে ফুল আসে এবং নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী সময়ে ফল পাকে।
- বাংলাদেশে প্রায় ১৫৬৫০ হেক্টর জমিতে কুল আবাদ হয় এবং মোট উৎপাদন প্রায় ১,০৭,৯৬০ মেট্রিক টন । হেক্টরপ্রতি ফলন প্রায় ৬.৯ মেট্রিক টন।
- কুল বা বরই দক্ষিণ এশিয়ায় বহুল প্রচলিত কন্টকাপূর্ণ গাছের ফল। ভারতের উত্তরাঞ্চল, চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও মালয়েশিয়ার মধ্যবর্তী এলাকা কুলের আদি জন্মস্থান।
- জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে (মধ্য আষাঢ়-মধ্য ভাদ্র) কুলের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।
- ফুল ফল ধরার সময় সেচ দিলে ফুল ফল ঝরা কমে আসে ও ফলের আকার বড় হয়।
- উষ্ণ ও ভিজা আবহাওয়ায় বিশেষকরে মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় কুলের পাউডারি মিলডিউ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

এসো নিজে করি

ইতিমধ্যে তোমরা হেমন্ত ও শীত মৌসুমের ফল চাষ সম্পর্কে জেনেছ। নিচের ফল সমূহের একটি করে ক্ষতিকর পোকা রোগের নাম লিখ।

ক্র/নং	গাছের নাম	একটি ক্ষতিকর পোকার নাম	একটি ক্ষতিকর রোগের নাম
১	কমলা		
২	নাশপাতি		
৩	কামরাঙা		
৪	কুল		

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন:

ইতোমধ্যে তুমি কুল গাছে কিভাবে ডাল ছাঁটাই করা হয় সে সম্পর্কে জেনেছে। তুমি তোমার পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন করে সেখানে কৃষকরা কুল গাছের ডাল ছাঁটাই করে এমন একজন কৃষকের সাথে আলাপ করে তিনি কখন কিভাবে কুল গাছের ডাল ছাঁটাই করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করে তোমার পরামর্শ প্রদান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

প্রশ্নবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১। বাংলাদেরশে কোন কোন জেলায় কমলার চাষ হচ্ছে?
২। বাংলাদেরশে বর্তমানে চাষকৃত দুটি কমলার জাতের নাম লিখ।
৩। কি ধরনের মাটিতে আঙ্গুর ভাল হয়?
৪। আঙ্গুর ফল কখন পাকে?
৫। নাশপাতির বৈজ্ঞানিক নাম কি?
৬। ফল বাগানে শূন্যস্থানে কি রকম চারা লাগানো হয়?
৭। কুলের আদি জন্মস্থান কোথায়?
৮। ফল বাগানে ব্যবহার হয় এমন ২টি সেচ পদ্ধতি লিখ।
৯। ২টি কৃত্রিম হরমোনের নাম লিখ।
১০। বালাই দ্বারা প্রতি বছর শতকরা কত ভাগ ফল নষ্ট হয়?
১১। ১টি করে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশকের নাম লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১। কমলার দুটি জাতের বৈশিষ্ট্য লিখ।
২। কমলার রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা বর্ণনা কর।
৩। কমলার গ্রীনিং রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা কর।
৪। কিভাবে কমলা সংরক্ষণ করা হয়?
৫। আঙ্গুরের পুষ্টিগুণ লিখ।
৬। কি ধরনের মোটিতে আঙ্গুর চাষ উত্তম?
৭। আঙ্গুর চাষে বিশেষ পরিচর্যা বর্ণনা কর।
৮। মানবদেহে নাশপাতির উপকারিতা বর্ণনা কর।
৯। বারি নাশপাতি-১ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
১০। কামরাঙা চাষের জন্য কি ধরনের জমি উপযোগী?
১১। আপেল কুল ও বাউ কুল-১ এর ২টি করে বৈশিষ্ট্য লিখ।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। কমলা চাষের আন্ত: পরিচর্যা বর্ণনা কর।
২। কমলার বিভিন্ন পোকা রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা কর।
৩। আঙ্গুর গাছের অঙ্গ ছাঁটাই বর্ণনা কর।
৪। কোন কোন জেলায় নাশপাতি চাষ ভাল হয়? নাশপাতি চাষে গর্ত বা পিট তৈরি ও সার প্রয়োগ বর্ণনা কর।
৫। কুল গাছের বিভিন্ন পোকা ও রোগের লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

জব ২.১: কমলা চাষে পিট বা গর্ত তৈরি ও চারা রোপণের দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- সঠিক সময় ও পদ্ধতিতে উপযুক্ত জমিতে কমলা চাষের জন্য লে-আউট এবং পিট বা গর্ত তৈরি করতে পারবো।
- গর্তে প্রয়োগের জন্য জৈব ও রাসায়নিক সারের মাত্রা নির্ণয় করতে পারবো।
- চারা/কলম সংগ্রহের উপযুক্ত উৎস সম্পর্কে জানতে পারবো।
- গর্তের মাটির সাথে সার সঠিক পরিমান ও পদ্ধতিতে মিশিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ করতে পারবো।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩। যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫। অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসজ্ঞিক তথ্যাবলি

লাভজনকভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মত বা পরিকল্পিত কমলা বাগান স্থাপন করতে হলে জমি ভালোভাবে চাষের পর বাগানে কমলা গাছের কলম লাগানোর জন্য নকশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা রোপণের স্থানে গর্ত করা উচিত। অত:পর খননকৃত গর্তে সার প্রয়োগ করে চারা রোপণের উপযোগী করতে হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি

১। কোদাল, ২। খন্তা ও শাবল, ৩। পচা গোবর ও রাসায়নিক সার, ৪। ঝুড়ি, ৫। মাপযন্ত্র বা ট্যাপ, ৬। ঝরণা, ৭। বাঁশের কাঠি, ৮। দড়ি, ৯। বাঁশের খাচা।

কাজের ধারা

১) উচু, উর্বর, সুনিষ্কাশিত এবং মৃদু অম্লভাবাপন্ন দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি কমলা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে।
তবে পাহাড়ের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ ঢালে কমলা তুলনামূলকভাবে ভাল হয়।

২) জাতভেদে সকল ধরনের কমলার চারা রোপণের জন্য বর্ষার আগে অর্থাৎ বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে গর্ত করা উত্তম।

৩) জমিতে গর্ত করার আগে চারা রোপণের নকশা মোতাবেক ফিতা বা কাঠির সাহায্যে মাপ দিয়ে ৩ মি.X ৩ মি. দূরত্বে বর্গাকার ও কন্টুর পদ্ধতিতে লে-আউট তৈরি করতে হবে। এভাবে কলমের চারা রোপণ করলে বাগান দেখতে সুন্দর হয় এবং প্রতিটি চারা সমানভাবে আলো-বাতাস পায় ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। খুঁটি পুঁতে চারা রোপণের স্থান চিহ্নিত করতে হবে।

৪) জমি তৈরি সম্পন্ন হলে চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্ত চিহ্নিতকরণ খুঁটিকে কেন্দ্র করে চাষের পর জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট স্থানে ৬০সে.মি.X৬০সে.মি.X৬০সে.মি.সেমি আকারের গর্ত বর্ষার আগে তৈরি করতে হবে। মাটি শক্ত ও কাদা মাটিতে বড় আকারের গর্ত খুবই উপযোগী। বেলে দো-আঁশ বা হালকা ধরনের মাটির জন্য গর্তের আকার কিছু ছোট হলেও চলে।

৫) গর্ত খননকালে গর্তের উপরের তিন ভাগের দুই ভাগ মাটি একদিকে এবং নিচের বাকী তিন ভাগের এক ভাগ মাটি অন্যপার্শ্বে রাখতে হবে। গর্তের খননকৃত মাটি ছড়িয়ে রেখে শুকিয়ে নেয়া ভাল। গর্তের ভিতর পাতা পুড়িয়ে রোগ জীবাণু বা পোকার কীড়া নষ্ট করা যায়। কয়েক দিন সূর্যের আলো গর্তে পড়লেও রোগজীবাণু মারা যায়।

৬) এক সপ্তাহ পরে গর্তের উপরের মাটির সাথে পচা গোবর ১৫ কেজি, ৩-৫ কেজি ছাই, ১ কেজি খৈল, টিএসপি সার ৫০০ গ্রাম, এমওপি সার ২৫০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম চুন ও ১ চামচ ব্লিচিং পাউডার/ফিনিশ পাউডার প্রয়োগ করতে হয় এবং উক্ত সার কোদাল দিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্তের নিচে ভরাট করতে হবে। নিচের বাকি এক তৃতীয়াংশ মাটি গর্তের উপরে ভরাট করতে হবে। গর্তে মাটি ভরাট করে পানি দিয়ে মাটি ভজিয়ে দিতে হবে।

৭) সার মেশানো মাটি দিয়ে গর্ত পুরণ করার ১০-১৫ দিন পর গর্তে চারা রোপণের উপযোগী হয়। চারা পট বা পলিথিন ব্যাগ থেকে সাবধানে বের করতে হবে।

৮) এখন চারার গোড়ার বলের পরিমান মাটি গর্ত হতে সরিয়ে রাখতে হবে। এরপর পলিথিন ব্যাগটি চাকু দ্বারা লম্বালম্বিভাবে কেটে দিতে হবে। তবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন মাটির বলটি পলিথিন ব্যাগ কাটার সময় অথবা পট থেকে বের করার সময় ভেঙ্গে না যায়।

৮) এখন চারাটি সোজা করে গর্তে বসাতে হবে। গর্তে বসানোর সময় দেখতে হবে যেন বেশি নিচে বা উপরে লাগানো না হয়। আগে যে পরিমান নিচে পুঁতা ছিল ঠিক তা বজায় রাখতে হবে। গর্তে চারা বসানোর পর গর্ত হতে সরিয়ে নেয়া মাটি দিয়ে বলটি ভালো করে চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের পর তাতে ঝাঝরি দিয়ে পানি দিতে হবে।

৯) চারা লাগানোর পর উত্তর -পশ্চিম কোনা বরাবর গাছের সহায়ক খুঁটি দিয়ে হালকাভাবে বেঁধে দিতে হবে। তা না হলে চারা বাতাসে হেলে গাছের ক্ষতি হবে।

১০) চারা রোপণের পর নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। চারা রোপণের প্রথম কয়েকদিন কেবল পাতায় পানি দিয়ে চারাকে সতেজ রাখতে হবে এবং কয়েকদিন হালকা ছায়া দিতে পারলে ভাল হয়। বাঁশের খাচা দিয়ে চারাটি গরু ছাগলের আক্রমণ হতে রক্ষারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। হালকা মাটিতে গর্ত খননের সময় সাবধানে খনন করতে হবে যেন গর্তের পাড় ভেঙ্গে না যায়।

২। খননকৃত গর্ত ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে যেন রোগজীবাণু মারা যায় এবং বিষাক্ত পদার্থ দূরীভুত হয়।

৩। পরিমিত আকারের গর্ত খনন করা উচিত।

৪। গর্ত ভরাট করার সময় গর্তের ভেতরের মাটি যেন আলগা না থাকে।

৫। সার ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে গর্ত তৈরি, সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২.১: আঙ্গুর গাছের ডাল ছাঁটাই (ট্রেনিং ও প্রুনিং) করার দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

এ পাঠ শেষে আমরা –

- আঙ্গুর গাছের ডাল ছাঁটাই (ট্রেনিং ও প্রনিং) সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবো।
- আঙ্গুর গাছের ডাল ছাঁটাই সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে করতে পারবো।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩. যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণের পুর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাবস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

আঙ্গুর চাষের জন্য গাছের কাঠামো তৈরি ও ছাটাইকরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। ছাটাইয়ের মাধ্যমে গাছের একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করা হয়। ফলে গাছের আকৃতি ঠিক রাখা যায় এবং ফলন বাড়ে। গাছ ছাটাইয়ের অর্থ হলো গাছের যে কোনো অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দেয়া। ফলের উৎপাদন গাছ ছাটাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। গাছের ডালপালা বৃদ্ধি ও ফলনের সাথে এর শারীরবৃত্তিক দিকের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। গাছে

ফল ধারনের পূর্বে সুগঠিত ও শক্ত কাঠামো প্রদানের জন্য যে ডালপালা ছাটাই করা হয় তাকে ট্রেনিং বলে। আর প্রুনিং হলো সুগঠিত কাঠামো প্রদানসহ ফল ধারন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য
ডালপালা, ফুল ফল, শিকড় ছাটাইকরণ।

উপকরণ ও দ্রব্যাদি

ক) ট্রেনিংয়ের জন্য গাছের চারা

খ) প্রুনিংয়ের জন্য ফলবতী গাছ

গ) প্রুনিং ছুরি (Pruning knife)

ঘ) প্রুনিং কাঁচি (Pruning shears)

ঙ) সিকেটিয়ার (Secateur)

চ) প্রুনিং করাত

ছ) বড় গাছের ডাল কাটা কাঁচি (Tree pruner)

জ) ডাল কাটার দা (Billhook)

ঝ) বর্দো পেষ্ট (Bordeaux paste)

ঞ) গরম মোম (Hot wax)

কাজের ধারা

১) আঙ্গুর গাছ রোপণের পর মাচায় ওঠা পর্যন্ত প্রধান কান্ড ছাড়া অন্য সকল পার্শ্বের শাখা ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

২) গাছ রোপণের প্রথম বছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হালকাভাবে ডাল ছাঁটাই করে দিতে হয় এবং মার্চ-এপ্রিলে ফল পাওয়া যায়।

৩) **প্রথম ছাঁটাই:** মাচায় কান্ড ওঠার ৩৫/৪৫ সে.মি. পর প্রধান কান্ডের শীর্ষদেশ কেটে দিতে হবে, যাতে ঐ কান্ডের দুই দিক থেকে দু'টি করে চারটি শাখা গজায়।

৪) দ্বিতীয় ছাঁটাই: গজানো চারটি শাখা বড় হয়ে ১৫-২০ দিনের মাথায় ৪৫/৬০ সে.মি. লম্বা হবে, তখন ৪ টি শীর্ষদেশ কেটে দিতে হবে, যেখান থেকে আরও পূর্বের ন্যায় দু'টি করে ১৬টি প্রশাখা গজাবে।

৫) তৃতীয় ছাঁটাই: এই ১৬টি প্রশাখা ১৫/২০ দিনের মাথায় ৪৫/৬০ সে.মি. লম্বা হবে, তখন আবার এদের শীর্ষদেশ কেটে দিতে হবে যাতে প্রতিটি প্রশাখার দু'দিকে দু'টি করে ৪ টি নতুন শাখা এবং এমনিভাবে ১৬ টি শাখা থেকে সর্বমোট ৬৪টি শাখা গজাবে। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই যে ৬৪ টি শাখা গজাবে এমন কোন কথা নেই। এই শাখার গিরার মধ্যেই প্রথমে ফুল এবং পরে এই ফুল মটর দানার মত আকার ধারণ করে আঙ্গুর ফলে রূপান্তরিত হবে।

৬) প্রথম বছর ফল পাবার পর শাখাগুলোকে ১৫/২০ সে.মি. লম্বা রেখে ফেব্রুয়ারী মাসে ছেঁটে দিতে হবে, যাতে ওটার গায়ে কেবল দুই থেকে তিনটি চোখ বাকি থাকে। ফলে বসন্তের প্রাক্কালে নতুন নতুন চোখ ও শাখা গজাবে এবং ফুল ধরবে। এই পদ্ধতি ৩/৪ বছর পর্যন্ত চলবে এবং ফলের স্থিতি লাভ করবে।
৭) এরপর যখন ডালগুলো থেকে নতুন শাখা কম গজায় বা ফুল ও ফল কম ধরে, তখন মূল কান্ডটিকে গোড়া থেকে ৭-১০ সেন্টিমিটার উচ্চতায় কেটে দিতে হয়। সেখান থেকে নতুন ডাল গজালে সতেজ দেখে এক-দু'টি ডাল রেখে আগের পদ্ধতিতে নতুন শাখা বের করানো যায়।
৮) যেসব শাখা অতি শক্ত হয়ে যায় তার অধিকাংশই কাটা যেতে পারে। ফলের গুচ্ছ থেকে কিছু কিছু ফল কাঁচি দ্বারা কেটে পাতলা করে দিলে ফল উৎকৃষ্ট হয়।
৯) ছাঁটাইয়ের ৭ দিন আগে এবং পরে গোড়ায় হালকা সেচ দিতে হয়।

কাজের সতর্কতা

১। একটি ধারালো, ভাল-তৈলযুক্ত সেকেটুর দিয়ে স্বাভাবিক হিসাবে কাটতে হবে যেন থেতলিয়ে না যায়।
২। কাটা অংশে আলকাতরার প্রলেপ বা বর্দো পেস্ট বা মোম লাগাতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে আঙ্গুর গাছের ডাল ছাঁটাই করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২.৩: কুল গাছের মিষ্টি আচার তৈরি করার দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

এ পাঠ শেষে আমরা –

- কুল গাছের মিষ্টি আচার তৈরির উপকরণ সম্পর্কে বলতে পারবো।
- কুল গাছের মিস্টি আচার তৈরি করতে পারবো।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩. যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

শীতশেষে বসন্তের সময় বাজারে পাওয়া যায় কাঁচাপাকা কুল বা বরই। আর এই বরই দিয়েই তৈরি করা যায় টক-ঝাল-মিষ্টি আচার। মজাদার এই আচার বানিয়ে খাওয়া যায় বছরজুড়ে। বরইয়ের টক-ঝাল-মিষ্টি আচার হলে জিভে জল ধরে রাখা দায় যে কারো পক্ষে। বরইয়ের টক-ঝাল-মিষ্টি আচার তৈরি করে বয়মে সংরক্ষণ করে অনেকদিন ধরে খাওয়া যায়।

উপকরণ ও দ্রব্যাদি

১. শুকনো কুল বা বড়ই ১ কেজি, ২. আখের গুড় / চিনি ১ কাপ, ৩. সরিষার তেল আধা কাপ, ৪. আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, ৫. রসুন কুঁচি ২ টেবিল চামচ, ৬. শুকনা মরিচ ৮-১০টি, ৭. মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ৮. হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ, ৯. পাঁচফোড়ন গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ১০. ভাজা জিরা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ১১. হোয়াইট ভিনেগার আধা কাপ, ১২. লবন পরিমানমতো।

কাজের ধারা

১) আচার বানানোর আগে ২ ঘণ্টা ধরে বোঁটা ছাড়ানো কুল বা বরইগুলো ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
২) দুই ঘণ্টা পর বড়ইগুলো পানি ছেকে রেখে দিতে হবে।
৩) শুকনা মরিচ ছাড়া বাকি সব উপকরণ একটি পাত্রে ঢেলে ভালো করে মিশিয়ে রাখতে হবে।
৪) অপর একটি পাত্রে তেল দিয়ে গরম হয়ে এলে সবটুকু মসলা দিতে হবে।
৫) এরপর একটু নেড়ে চিনি ও লবণ দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে।
৬) কিছুক্ষণ পর তাতে শুকনো মরিচ ও বরইগুলো দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। অল্প আঁচে বরই নেড়ে শুকিয়ে আনতে হবে। যতোটা সম্ভব শুকানোর পর আচার নামিয়ে আনতে হবে।
৭) এবার একটা ট্রেতে পাতলা করে বিছিয়ে পাতলা কাপড়ে ঢেকে রোদে শুকাতে হবে এবং হালকা ভেজা ভেজা অবস্থায় বয়ামে ভরে সংরক্ষণ করতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। উপকরণগুলো ভালভাবে মিশাতে হবে।
২। উপকরণ মিশ্রিত কুল জ্বাল দেয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন লেগে না যায়।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে আচার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়

উচ্চ মূল্যের ফলের চাষ

(High Value Fruits Production)

বাংলাদেশে কৃষি কার্যক্রম প্রধানত ধানভিত্তিক। ফল চাষের জন্য আমাদের জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। দানাজাতীয় ফসল যেমন: ধান, গম, সরিষা, ভূট্টা ইত্যাদির গড় ফলন হেক্টরে ৪ থেকে ৬ টন। অথচ অধিকাংশ ফল যেমন: পেঁপে, কলা, আনারস, তরমুজের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১৫ থেকে ৫০ বা ১০০ টন পর্যন্ত হতে পারে। ধান, গম, সরিষা, ভূট্টা অপেক্ষা ফলের মূল্য বেশি। বাজারে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকে বিধায় সব সময়ই ফলের দাম বেশি থাকে। তাই ফল চাষ করে কৃষকরা অন্যান্য ফসরের তুলনায় বেশি লাভবান হতে পারে। এক হেক্টর জমিতে পেঁপে চাষ করে বছরে ৭০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা উপার্জন করা সম্ভব। অথচ দানাজাতীয় শস্য চাষ করে এত বেশি লাভ করা সম্ভব না। তাছাড়া বাংলাদেশে চাষাবাদ সম্ভব এমন ফল যেমন: ড্রাগন, কাজুবাদাম, স্ট্রবেরি, অমৌসুমী তরমুজ ইত্যাদির চাষ করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো সম্ভব।

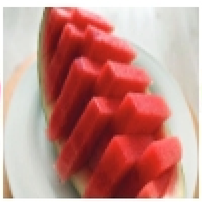
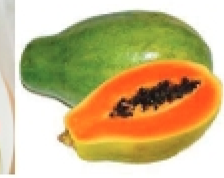

এই অধ্যায় শেষে-

- উচ্চ মূল্যের ফলসমূহের নাম ও পরিচিতি উল্লেখ করতে পারবে
- ড্রাগন, স্ট্রবেরি, কাজুবাদাম, তরমুজ ও পেঁপে পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে
- উপর্যুক্ত ফলগুলোর জলবায়ু, মাটি, বিভিন্ন জাত এবং চাষাবাদের সময় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োজনীয় জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, চারা উৎপাদন, রোপণ ও আন্ত: পরিচর্যা করতে পারবে
- ফলের পরিপক্কতার লক্ষণ, ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি বর্ণনা করতে পারবে

৩.১ ড্রাগন উৎপাদন (Dragon production)

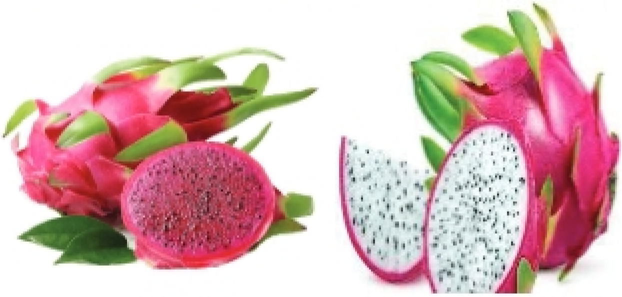

ড্রাগন আমাদের দেশে প্রবর্তিত একটি নতুন বিদেশি ফল। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় চাষ উপযোগী বিদেশি ফলসমূহের মধ্যে ড্রাগন হলো সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ফল। এটি দ্রুত বর্ধনশীল ক্যাকটাস প্রজাতির বহুবর্ষী উদ্ভিদ। অনিন্দ্য সুন্দর ফুলের কারণে একে "সম্ভ্রান্ত নারী" অথবা "রাতের রাণী" নামেও ডাকা হয়। প্রসঙ্গত এর ফুল রাতে ফোটে এবং সকালে বন্ধ হয়ে যায়। ফলের গায়ে লম্বা আঁশ (বৃতি) থাকার কারণে একে ড্রাগন ফল নাসকরণ করা হয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় ১৪০ হেক্টর জমিতে ড্রাগন চাষ হয়ে থাকে যাহার ফলন প্রায় ১১৪০ মে.টন (বিবিএস২০২১) ।

৩.১.১ ড্রাগন ফলের পরিচিতি ও জাত নির্বাচন

ঔষধি ও উচ্চ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ সুস্বাদু এ ফল কাঁচা-পাকা উভয় অবস্থাতেই খাওয়া যায়। ফলটি সরাসরি ভক্ষণ ছাড়াও এ থেকে শরবত, জ্যাম, জেলি, জুস ও ক্যান্ডি তৈরি করার যায়। ফলটি আয়রন, ভিটামিন "সি" এবং এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ অত্যন্ত পুষ্টিকর। এটি ডায়াবেটিস, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগের জন্য উপকারী।বিশেষ করে এই ফল ডায়াবেটিস রোগীর রক্তের ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলের বাজার মূল্য উচ্চ হওয়ায় চাষাবাদ লাভজনক।

ড্রাগন ফলের উৎপত্তি: মেক্সিকো এবং দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা ড্রাগন ফলের উৎপত্তি স্থান।

পুষ্টিগুণ: ১০০ গ্রাম ড্রাগন ফলের মধ্যে ৫৫-৮৫ গ্রাম থাকে ভক্ষণযোগ্য। ভক্ষণযোগ্য প্রতি ১০০ গ্রামে পাওয়া যায়:

পানি	:	৮০-৯০	আয়রন	:	০.৩০-০.৭০ মিলি গ্রাম
শর্করা	:	৯-১৪	ফসফরাস	:	১৬-৩৫ মিলি গ্রাম
প্রোটিন	:	০.১৫-০.৫০	ভিটামিন সি	:	৪-১২ মিলি গ্রাম
আঁশ	:	০.৩৩-০.৯০	বিটা ক্যারোটিন	:	৫-১৫ মিলি গ্রাম
খাদ্যশক্তি	:	৩৫-৫০ কিলো ক্যালরি	ভিটামিন বি$_{১}$ (নায়াসিন)	:	০.২-০.৪৫ মিলি গ্রাম
চবি	:	০.১০-০.৬০ গ্রাম	ভিটামিন বি$_{২}$	:	০.২-০.৪০ মিলি গ্রাম
			(রিবোফাভিন)		
ক্যালসিয়াম	:	৬-১২ মিলিগ্রাম	ভিটামিন বি$_{৩}$ (নিকোটিনিক এসিড)	:	০.২-০.৪০ মিলি গ্রাম

২০২৪

চাষের জলবায়ু: উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু ড্রাগন ফল এর জন্য উপযোগী। মোটামুটিভাবে ২৫-৩৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ১০০০ থেকে ২০০০ মি.মি. সুবিন্যস্ত বার্ষিক বৃষ্টিপাত ড্রাগন চাষের জন্য ভাল হয়।

জাত নির্বাচন: ড্রাগন ফল সাধারণত তিন প্রজাতির হয়ে থাকে-

১) লাল ড্রাগন ফল বা পিটাইয়া। এর খোসার রঙ লাল ও শাঁস সাদা। এই প্রজাতির ফলই বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

২) কোস্টারিকা ড্রাগন ফল। খোসা ও শাঁস উভয়েরই রঙই লাল।

৩) হলুদ রঙের ড্রাগন ফল। এই জাতের ড্রাগন ফলের খোসা হলুদ রঙের ও শাঁসের রঙ সাদা।

বাংলাদেশে উদ্ভাবিত জাতগুলো হলো-

বারি ড্রাগন ফল-১, বাউ ড্রাগন ফল-১ (সাদা), বাউ ড্রাগন ফল-২ (লাল), বাউ ড্রাগন ফল-৩

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি ড্রাগন-১ নামে একটি জাত উদ্ভাবন করেছেন।

বারি ড্রাগন-১ এর বৈশিষ্ট: এটি একটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত।

- ফলের আকার বড়, ফলের খোসা রঙ লাল এবং গড় ওজন ৩৭৫.১১ গ্রাম।
- শাঁস গাঢ় গোলাপী রঙের, রাসালো এবং টিএসএস গড়ে ১৩.২২%।
- বীজ খুব ছোট কালো ও নরম এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৮১%।
- একটি পূণ বয়স্ক গাছ হতে বছরে গড়ে ৩৫ টি ফল পাওয়া যায়, যার গড় ফলন ১৩ কেজি/গাছ বা ৬০ টন/হেক্টর।

৩.১.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

জমি ও মাটি নির্বাচন: উচ্চ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটি গাছের বৃদ্ধি ও বিকাশ ভাল হয়। ড্রাগন ফল মোটেই জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় পানি জমে না এমনি সুনিশ্চিত উঁচু জমিতে ফলটি চাষ করা উচিত। ড্রাগন ফলের জন্য আদর্শ অম্ল-ক্ষারত্ব (p^H) হচ্ছে ৫.৫-৬.৫। অর্থাৎ কিছুটা অম্লীয় মাটিতে ভাল হয়।

বাগানের লেআউট তৈরি: সমতল ভূমিতে বর্গাকার কিংবা ষড়ভূজাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে ড্রাগন ফলের চারা রোপণ করতে হবে। এপ্রিল থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত ড্রাগন ফলের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

গর্ত তৈরি: জমি নির্বাচন করার পর নির্বাচিত জমিতে পরপর কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। তারপর জমিতে উভয় দিকে ২.৫-৩ মিটার দুরত্বে ১.৫ মিটার x ১.৫ মিটার x ১ মিটার আকারের গর্ত করে তা রোদে খোলা রাখতে হবে। গর্ত তৈরির ২০-২৫ দিন পর প্রতি গর্তে ২৫-৩০ কেজি পচা গোবর , ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ১৫০ গ্রাম জিপসাম এবং ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট সার

গর্তের মাটির সাথে ভালো করে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের অভাব হলে প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। গর্ত ভরাটের ১০-১৫ দিন পর প্রতি গর্তে ৫০ সেমি দূরত্বে ৪ টি ড্রাগন ফলের চারা লাগাতে হবে। চারা রোপণের ১ মাস পর থেকে ১ বছর পর্যন্ত প্রতি গর্তে ৩ মাস পর পর ১০০ গ্রাম করে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

৩.১.৩ চারা সংগ্রহ ও রোপণ

চারা/ কলম ও বংশ বিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন: অঙ্গজ উপায়ে অথবা বীজের মাধ্যমে ড্রাগন ফলের বংশ বিস্তার করা যায়। বীজের মাধ্যম উৎপাদিত গাছে ফল ধরতে ৫-৭ বৎসর সময় লাগে এবং উৎপাদিত ফলে হুবহু মাতৃবৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। সেজন্য কাটিং এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা উত্তম। কাটিং এর সফলতা হার প্রায় শতভাগ এবং ফলও তাড়াতাড়ি ধরে এবং হুবহু মাতৃবৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। ফসল সংগ্রহের শেষে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে কাটিং করার উপযুক্ত সময়। কাটিং থেকে উৎপাদিত গাছে ফল ধরতে ১২-১৮ মাস সময় লাগে। সাধারণত ৬ মাস থেকে এক বছর বয়স্ক গাঢ় সবুজ শাখার ১৫ থেকে ৩০ সে.মি. লম্বা খন্ড কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রায় ৩০-৪৫ দিন পরে কাটিং এর গোড়া থেকে শিকড় এবং উপরের প্রান্ত থেকে নতুন কুশি বেরিয়ে আসবে। তখন কাটিংকৃত চারাগুলো মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হবে।

চারা সংগ্রহ: কাটিং থেকে সরাসরি চারা তৈরি করা যায় এবং বাণিজ্যিকভাবে কাটিং থেকে চারা তৈরি করে ড্রাগনের বাগান করা হয়। ড্রাগনের প্রকৃত মাতৃগাছের চারা সংগ্রহের জন্যে জাত উদ্ভাবনকারী সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা ভাল। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার সেন্টার এবং বিএডিসির উদ্যান কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিস্থিত নার্সারী হতে ড্রাগনের কাটিং-এর চারা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

চিত্র: ড্রাগন ফলের বীজ থেকে চারা তৈরি

চারা রোপন: গর্ত ভরার করার ১০-১৫ দিন পর প্রতিটি গর্তে ৫০ সেমি দুরত্বে ৪টি চারা সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে লাগিয়ে চারার চারিদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালোভাবে বসিয়ে দিতে হবে। রোপণের পরপরই পানি সেচ দিতে হবে। এরপর নিয়মিত পানি সেচ ও প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.১.৪ আন্ত:পরিচর্যা

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা: আগাছা অপসারণ করে নিয়মিত সেচ প্রদান এবং প্রয়োজনে চারপাশে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাউনী প্রদান: ড্রাগন ফল অত্যাধিক শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট একটি লতা জাতীয় উদ্ভিদ। চারা লাগানোর পর বিভিন্নভাবে এর বাউনী দেওয়া যায় তবে ড্রাগন ফল যেহেতু কমপক্ষে ২০ বছর স্থায়ী হয় তাই কনক্রিটের টেকসই বাউনী ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। যেহেতু ড্রাগন ফল গাছ লতানো প্রকৃতির এবং ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার লম্বা হওয়ায় সাপোর্টের জন্য চারটি চারার মাঝে একটি সিমেন্টের চার মিটার লম্বা খুঁটি পুততে হবে যাতে করে মাটির উপরে ৩ মিটার অবশিষ্ট থাকে। চারা বড় হ'লে খড়ের বা নারিকেলের রশি দিয়ে সিমেন্টর খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। যাতে গাছ বড় হলে কান্ড থেকে শিকড় বের হয়ে খুঁটিকে আঁকড়ে ধরে গাছ সহজেই বাড়তে পারে। প্রতিটি খুঁটির মাথাই একটি করে মোটর সাইকেলের পুরাতন টায়ার মোটা তারের সাহায্যে আটকিয়ে দিতে হবে। তারপর গাছের মাথা ও অন্যান্য ডগা টায়ারের ভিতর দিতে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। কেননা ঝুলন্তভাবে ফল বেশী ধরে।

গাছে সার প্রয়োগ: বয়স বাড়ার সাথে সাথে গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্খিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিম্নরুপ:

গাছের বয়স	খুঁটি প্রতি সারের পরিমাণ/বছর			
	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি সার (গ্রাম)
১-৩ বছর	৪০-৬০	৫০০-৭৫০	৪৫০-৫০০	৪৫০-৫০০
৩-৬ বছর	৬০-৮০	৭৫০-১২০০	৫০০-৭৫০	৫০০-৭৫০
৬-৯ বছর	৮০-১০০	১২০০-২০০০	৭৫০-১০০০	৭৫০-১০০০
১০ বছরের উর্ধ্বে	১০০-১২০	২০০০-৩০০০	১০০০-১৫০০	১০০০-১৫০০

গোবর ও টিএসপি সার সমান দুই ভাগে ভাগ করে ফেব্রুয়ারি ও আগষ্ট মাসে এবং ইউরিয়া ও এমওপি সার তিন মাস অন্তর ৪ কিস্তিতে ১:৩:২:২ অনুপাতে যথাক্রমে ফেব্রুয়ারি, মে, আগষ্ট ও নভেম্বর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা: ড্রাগন ফল খরা ও জলাবদ্ধতা সয্য করতে পারে না। তাই শুস্ক মৌশুমে ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। এছাড়া ফলন্ত গাছে ৩ বার অর্থাৎ ফুল ফোটা অবস্থায় একবার, ফল মটর দানা অবস্থায় একবার এবং ১৫ দিন পর আরেকবার সেচ দিতে হবে।

আগাছা দমন: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছা মুক্ত রাখা দরকার, বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে নিড়ানী বা কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা হালকাভাবে চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে। আগাছা দমনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

প্রুনিং ও ট্রেনিং: ড্রাগন ফল দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মোটা শাখা (ডগা) তৈরি করে। একটি এক বছরের গাছ ৩০ টি পর্যন্ত শাখা তৈরি করতে পারে এবং ৪ বছর বয়সী একটি ড্রাগন ফলের গাছ ১৩০ টি পর্যন্ত প্রশাখা তৈরি করতে পারে। তবে শাখা-প্রশাখা উৎপাদন উপযুক্ত ট্রেনিং ও ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের ১২-১৮ মাস পর একটি গাছ ফল ধারণ করে। ফল সংগ্রহের পর ৪০-৫০ টি প্রধান

শাখায় প্রত্যেকটিতে ১/২ টি সেকেন্ডারী শাখা অনুমোদন করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রের টারসিয়ারী ও কোয়াটারনারী প্রশাখা কে অনুমোদন করা হয় না। ট্রেনিং এবং প্রুনিং এর কাযক্রম দিনের মধ্য ভাগে করা ভালো। ট্রেনিং এবং প্রুনিং করার পর রোগবালাই এর আক্রমন রোধ করার জন্য কাটা স্থানে অবশ্যই উপযুক্ত ছত্রাকনাশক (কুপ্রাভিট বা বোর্দো পেস্ট) প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায় বিভিন্ন প্রকার রোগ বালাই আক্রমণ করতে পারে।

রোগ ও বালাই ব্যবস্থাপনা

ফলে রোগ বালাই খুবই একটা চোখে পড়েনা। তাবে কখনো কখনো এ গাছে মূলপঁচা, কান্ড ও গোড়া পঁচা রোগ দেখা যায়।

১) মূলপচা

গোড়ায় অতিরিক্ত পানি জমে গেলে মূল পচে যায়। এ রোগ হলে মাটির ভেতরে গাছের মূল একটি দুটি করে পচতে পচতে গাছের সমস্ত মূল পচে যায়। গাছকে উপরের দিকে টান দিলে মূল ছাড়া শুধু কান্ড উঠে আসে।

প্রতিকার:

- তবে এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে উঁচু জমিতে এ ফলের চাষ করা ভালো।
- রোগ দেখা মাত্র গাছের গোড়ায় ও কান্ডে ইন্ডোফিল এম ৪৫ বা কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউপি বা থিয়ভিট ৮০ ডব্লিউজি নামক ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে প্রয়োগ করলে সহজে এরোগ দমন করা যায়।

২) কান্ড ও গোড়া পচা রোগ

ছত্রাক অথবা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হতে পারে। এ রোগ হলে গাছের কান্ডে প্রথমে হলুদ রং এবং পরে কালো রং ধারণ করে এবং পরবর্তীতে ওই অংশে পচন শুরু হয় এবং পচার পরিমাণ বাড়তে থাকে।

প্রতিকার:

এ রোগ দমনের জন্য যে কোন ছত্রাকনাশক (বেভিস্টিন, রিডোমিল, থিওভিট ইত্যাদি) ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করে সহজেই দমন করা যায়।

চিত্র: ড্রাগনের কান্ড পচা

৩) ফল ও কান্ডের বাদামি রোগ: এরোগ ছত্রাক জনিত রোগ।

লক্ষণ: এ রোগ হলে গাছের ফল ও কান্ড প্রথেমে ছোট ছোট হলুদ বা বাদামি দাগ দেখা যায় এবং পরে উক্ত দাগগুলো আকারে বৃদ্ধি পায় এবং একত্রে মিলিত হয়ে বড় আকার ধারণ করে এবং পরবর্তীতে এ অংশ শুকিয়ে যায় ও আক্রান্ত পল নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিকার: এ রোগ দমনের জন্য আক্রান্ত অংশ কেটে অপসারণ করতে হবে এবং কর্তিত অংশে বোর্দো পেস্ট এর প্রলেপ দিতে হবে। ছত্রাকনাশক এমিস্টারটপ/টিল্ট ২৫০ ইসি/ স্কোর ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫০ এমএল বা কনটাফ ৫ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১.০ এমএল মিশিয়ে প্রয়োগ করেসহজেই দমন করা যায়।

পোকামাকড়

জাবপোকা ও মিলিবাগ: ড্রাগন ফলের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় খুব একটা চোখে পড়ে না, তবে মাঝে মাঝে এফিড ও মিলি বাগের আক্রমণ দেখা যায়। এফিডের বাচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক পোকা গাছের কচি শাখা ও পাতার রস চুষে খায়, ফলে আক্রান্ত গাছের কচি শাখা ও ডগার রং ফ্যাকাশে হয়ে যায় ও গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ পোকা ডগার উপর আঠাল রসের মতো মল ত্যাগ করে ফলে শুটিমোল্ড নামক কালো ছত্রাক রোগের সৃষ্টি হয়। এতে গাছের খাদ্য তৈরি ব্যাহত হয়। এতে ফুল ও ফল ধারণ কমে যায়।

প্রতিকার: এ পোকা দমনে সুমিথিয়ন/ডেসিস/ম্যালাথিয়ন এসব কীটনাশক প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২৫ মিলিলিটার বা ৫ কাপ ভালো ভাবে মিশিয়ে স্প্রে করে সহজেই এ রোগ দমন করা যায়।

চিত্র: ড্রাগনের জাবপোকা ও মিলিবাগ

৩.১.৫ ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

পরিপক্কতার লক্ষণ: ড্রাগন ফল নন ক্লাইমেটারিক ফল হওয়ায় সংগ্রহোত্তর ইথিলিন উৎপাদন ও শ্বসনের হার কম থাকে। এই কারনে ফল পরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত ফল ও স্পাইনলেটের রঙ লালচে বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হয়। অপরিপক্ক ফলে মিষ্টতা ও অন্যান্য গুণাবলী পরিপক্ক ফলের তুলনায় অনেক কম থাকে। ভালো বাজার মূল্য পাওয়ার জন্য ফল লালচে বর্ণ ধারণ করার ৫-৭ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা ভালো। গাছের ফল অতিরিক্ত পাকিয়ে সংগ্রহ করলে ফলের চাসরা ফেটে যেতে পারে এবং ফলের সংরক্ষণকাল ও স্বাদ কমে যায়। অধিক পরিপক্ক ফল খুব দ্রুত আদ্রতা হারায় এবং নষ্ট হতে থাকে।

ফল সংগ্রহ: ড্রাগন ফলের কাটিং থেকে চারা রোপনের পর ১ থেকে ১.৫ বছর বয়সের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল যখন সম্পূর্ণ লাল রঙ ধারণ করে তখন সংগ্রহ করতে হবে। গাছে ফুল ফৌটার মাত্র ৩৫-৪০ দিনের মধ্যেই ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। প্রতিটি ফলের ওজন ২০০ গ্রাম থেকে ১.৫ কেজি পর্যন্ত হয়। ১২-১৮ মাস বয়সী ১টি গাছে ৫ থেকে ২০টি ফল পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক ১টি গাছে ২০ থেকে ১০০ টি ফল পাওয়া যায়। পাকা অবস্থায় ফল ৫/৭ দিন সংরক্ষণ করা যায়। হেক্টর প্রতি ফলন ২০ থেকে ২৫ টন। গাছ লাগানোর ১৫ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। বছরে ৫-৬টি পর্যায়ে ফল সংগ্রহ করা যায়। প্রথমত জুন-অক্টোবর, দ্বিতীয় ডিসেম্বর-জানুয়ারি।

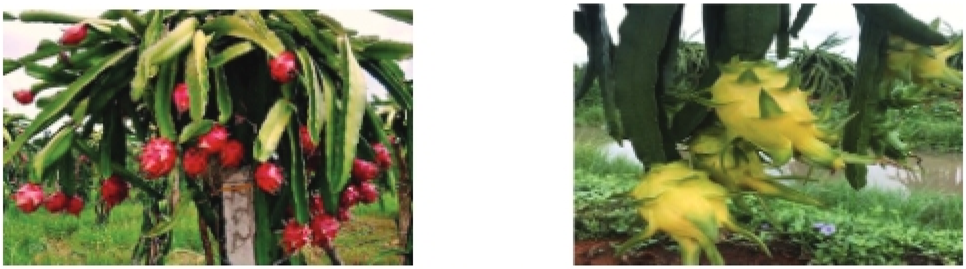

চিত্র: ফল সহ ড্রাগন গাছ

সংরক্ষণ: ফল সংগ্রহের পর স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ৮-১০ দিন সংরক্ষণ করা যায়। ৪-৭° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ড্রাগন ফল প্রায় ৩০ থেকে ৪০ দিন সংরক্ষণ করা সম্ভব। ড্রাগন ফলের পাল্প ডিপ ফ্রিজে বছরব্যাপী সংরক্ষণ করা যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত পাল্প দ্বারা শরবত, জ্যাম, জেলি, জুস ও ক্যান্ডি তৈরি করা যায়।

৩.২ স্ট্রবেরি উৎপাদন (Strawberry production)

আকর্ষণীয় রং, গন্ধ ও উচ্চ পুষ্টিমানের জন্য স্ট্রবেরি অত্যন্ত জনপ্রিয়। স্ট্রবেরি একটি ভিটামিন "সি" সমৃদ্ধ ফল হলেও এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অন্যান্য ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও এন্টি-অক্সিডেন্ট বিদ্যমান। ফল হিসাবে সরাসরি খাওয়া ছাড়াও বিভিন্ন খাদ্যের সৌন্দয ও সুগন্ধ বৃদ্ধিতেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। স্ট্রবেরি একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এটি মৃদু শীতপ্রধান দেশের ফল হলেও উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে চাষোপযোগী স্ট্রবেরির জাত উদ্ভাবন করায় দক্ষিণ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক ভাবে এর চাষ হচ্ছে।

৩.২.১ স্ট্রবেরি ফলের পরিচিতি ও জাত নির্বাচন

উৎপত্তি: স্ট্রবেরির উৎপত্তিস্থল ফ্রান্স।

চাষের জলবায়ু: স্ট্রবেরি মূলত মীত প্রধান অঞ্চলের ফসল। কিছু কিছু জাত তুলনামূলক তাপ সহিষ্ণু এদের গ্রীস্মায়িত জাত বলা যায়। এসব জাতের জন্য দিন ও রাতে যথাক্রমে ২০-২৬° ও ১২-১৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। ফুল ও ফল আসার সময় শুষ্ক আবহাওয়া আবশ্যক। স্ট্রবেরির জাতগুলো বাংলাদেশের আবহাওয়ায় রবি মৌসুমে চাষ উপযোগী।

জাত নির্বাচন: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দীর্ঘদিন ধরে স্ট্রবেরি চাষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে এবং অদ্যাবধি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী স্ট্রবেরির তিনটি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে।

বারি স্ট্রবেরি-১: বৈশিষ্ট

১. গাছ প্রতি গড়ে ৩২টি ফল ধরে যার মোট ওজন ৪৫০ গ্রাম।

২. হৃৎপিন্ডাকৃতির ফল ক্ষুদ্র থেকে মধ্যম আকারের যার গড় ওজন ১৪ গ্রাম।

১০১৪

৩. পাকা ফল আকর্ষণীয় টকটকে লাল বর্ণের।
৪. ফলের ত্বক নরম ও ইষৎ খসখসে।
৫. ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরির বৈশিষ্ট্যপূণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস-১২%)।

বারি স্ট্রবেরি-২: বৈশিষ্ট:

১. গাছ প্রতি গড়ে ৩৭টি ফল ধরে যার মোট ওজন ৭৪১ গ্রাম।
২. তুলনামুলক দৃঢ়, আকারে বেশ বড়, প্রান্তভাগ চ্যাপ্টা।
৩. ফল দেখতে আকর্ষণীয় গাঢ় লাল রঙের।
৪. ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। ফল রসালো, সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (টিএসএস-৮%)।
৫. ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন “সি” বিদ্যমান (৭৬ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম)।

বারি স্ট্রবেরি-৩: বৈশিষ্ট:

১. গাছ প্রতি গড়ে ৩৯টি ফল ধরে যার মোট ওজন ৭৭০ গ্রাম।
২. লম্বা মোচাকৃতি, আকারে বেশ বড়, ফল তুলনামুলক দৃঢ়, প্রান্তভাগ সরু।
৩. ফল দেখতে আকর্ষণীয় লাল রঙের।
৪. ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। ফল রসালো, সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি।
৫. ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন “সি” বিদ্যমান (৭২ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম)।

চিত্র: স্ট্রবেরির ফলের মাঠ

৩.২.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

উপযুক্ত মাটি নির্বাচন: স্ট্রবেরি বৃষ্টির পানি জমে না এ ধরনের উর্বর দো-আঁশ থেকে বেলে দো-অর্আঁশ মাটি স্ট্রবেরি চাষের জন্য উত্তম। মাটির অম্লমান (p^{H}) ৫.৬-৬.৫ স্ট্রবেরি চাষের জন্য উত্তম।

লেআউট তৈরি: সাধারণত আয়তকার পদ্ধতিতে স্ট্রবেরির চারা রোপণ করা হয়ে থাকে।

জমি তৈরিঃ জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। জমি সমতল হতে হবে। আগাছা মুক্ত করে নিতে হবে। জমিতে যদি পুরনো গাছের গোড়া, ইট, পাথর বা অন্য কোন জঞ্জাল থাকে তাহলে সরিয়ে

ফেলতে হবে। স্ট্রবেরি চাষের জন্য জমি খুব ভালোভাবে চাষ করে নিতে হবে তাহলে গাছের শিকড় বৃদ্ধিতে তা সাহায্য করে এবং গাছ মাটি থেকে সহজেই পুষ্টি শোষন করতে পারে।

সার প্রয়োগ: গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চ ফলন পেতে হলে স্ট্রবেরির জমিতে শতক প্রতি নিম্নলিখিত পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	শতক প্রতি পরিমাণ
পচা গোবর	১২২ কেজি
ইউরিয়া	১.০০ কেজি
টিএসপি	৮০০ গ্রাম
এমওপি	৯০০ গ্রাম
জিপসাম	৬০০ গ্রাম

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, ও অর্ধেক পরিমাণ এমওপি সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও অবশিষ্ট এমওপি সার চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে ১৫-২০ দিন অন্তর ৪-৫ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৩.২.৩ চারা সংগ্রহ ও রোপণ

চারা/ কলম ও বংশ বিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন: স্ট্রবেরির বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা যায়। তবে স্ট্রবেরি গুল্ম ও লতাজাতীয় গাছ হওয়ায় বেশ লম্বা ও সরু ডাল মাটির উপর দিয়ে থানকুনির মতো লতিয়ে যায়। এগুলোকে রানার বলে। রানারে গাঁট থেকে শিকড় বের হয়। আর ঐ শিকড়যুক্ত গাঁট কেটে নিয়ে চারা হিসাবে ব্যবহার করলে গাছের ফলের গুণাগুণ মাতৃগাছের মতোই হয়। এই জন্য রানার দ্বারাই স্ট্রবেরির বংশ বিস্তার করা উত্তম।

চিত্র: বীজ থেকে স্ট্রবেরির চারা তৈরি

চারা/ কলম তৈরি: স্ট্রবেরি রানারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে। তাই পূর্ববর্তী বছরের গাছ নষ্ট না করে জমি থেকে তুলে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে রোপণ করতে হবে। উক্ত গাছ থেকে উন্নত রানারে যখন শিকড় বের হবে তখন তা কেটে ৫০ ভাগ ও ৫০ ভাগ পলিমাটিযুক্ত পলিথিন ব্যাগে লাগাতে হবে এবং হালকা ছায়াযুক্ত নার্সারিতে সংরক্ষণ করতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত থেকে চারাকে রক্ষা করার জন্য বৃষ্টির মৌসুমে চারার উপর পলিথিনের ছাউনি দিতে হবে। রানার মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হলে স্ট্রবেরির ফলনের ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। তাই জাতের ফলন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারা ব্যবহার করা উত্তম।

চারা সংগ্রহ: রানার থেকে সরাসরি চারা তৈরি করা যায় এবং বাণিজ্যিকভাবে রানার থেকে চারা তৈরি করে স্ট্রবেরির চাষ করা হয়। স্ট্রবেরির প্রকৃত মাতৃগাছের চারা সংগ্রহের জন্যে জাত উদ্ভাবনকারী সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা ভাল। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার সেন্টার এবং বিএডিসির উদ্যান কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিস্থিত নার্সারী হতে স্ট্রবেরির চারা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

চারা রোপন: বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আশ্বিন মাস (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর) স্ট্রবেরির চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। চারা রোপণের জন্য বেড় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এ জন্য ১ মিটার প্রশস্থ এবং ১৫-২০ সেমি.উঁচু বেড় তৈরী করতে হবে। দুটি বেড়ের মাঝে ৪০-৫০ সে.মি.নালা রাখতে হবে। প্রতি বেড়ে ৫০-৬০ সে.মি.দুরত্বে দুই সারিতে ৩০-৪০ সে.মি. দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে।

৩.২.৪ আন্ত:পরিচর্যা

সেচ ও নিষ্কাশন: জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে প্রয়োজন মতো পানি সেচ দিতে হবে। স্ট্রবেরি জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্ট্রবেরি গাছের মালচিং: সরাসরি মাটির সংস্পর্শে এলে স্ট্রবেরির ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়। কারণ স্ট্রবেরি ফল খুবই নরম। এ জন্য চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর অথবা ফুল আসার পরপরই স্ট্রবেরির বেড় খড় বা কাল পরলথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আর এই পদ্ধতিকে মালচিং বলে। মালচিং এর ফলে আগাছার বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়। মাটির তাপমাত্রা ঠান্ডা থাকে যা স্ট্রবেরি গাছের জন্য বিশেষ উপকার হয় এবং ফলকে মাটির সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করে পচন রোধ করে। খড়ে যাতে উঁই পোকার আক্রমণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ৩ মিলি ডার্সবান-২০ ইসি ও ২ গ্রাম ব্যাভিস্টিন ডিএফ মিশিয়ে ঐ দ্রবনণে খড় শোধন করে নিলে তাতে উঁই পোকার আক্রমণ হয় না এবং দীর্ঘ দিন তা অবিকৃত থাকে। যারা বাণিজ্যিকভাবে স্ট্রবেরির চাষ করেন তারা মালচিং এর জন্য সাধারণত ১২৫-১৫২ সে.মি. প্রস্থের কালো ব্যবহার করে থাকেন।

রানার ছাটাইকরণ: গাছের গোড়া থেকে নিয়মিত রানার বের হয়। উক্ত রানার সমূহ ১০/১৫ দিন পর পর কেটে ফেলতে হবে। অতিরিক্ত রানার কেটে না ফেললে ফলের আকার ছোট হবে এবং স্ট্রবেরি উৎপাদন হ্রাস পায়।

মাতৃগাছ রক্ষণাবেক্ষণ: প্রখর সৌর-তাপ এবং ভারী বৃষ্টিপাত স্ট্রবেরি গাছ সহ্য করতে পারে না। এজন্য মার্চে-এপ্রিল মাসে হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা ফল আহরণের পর মাতৃ গাছ তুলে টবে রোপণ করে ছায়ায় রাখতে হবে। ফল আহরণ শেষ হওয়ার পর সুস্থ-সবল গাছ তুলে পলিথিন ছাউনির নিচে রোপণ করলে মাতৃ গাছকে প্রখর সৌর-তাপ ও ভারী বৃষ্টিপাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। মাতৃ গাছ থেকে উৎপাদিত রানার পরবর্তী সময়ে চারা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

রোগবালাই

১) পাতায় দাগ রোগ: ছত্রাক জনিত কারনে এই রোগটি হয়ে থাকে।

লক্ষণ: এ রোগের আক্রমণে স্ট্রবেরি পাতায় অনিয়মিত আকারের অসংখ্য দাগ পড়ে। দাগের রঙ সাধারণত বেগুনি হয়। দাগের কেন্দ্র সাদা বা খূসর এবং চারিদিকে লালচে বেগুনি থেকে গাঢ় বেগুনি রঙের হয়। পরে অনেকগুলো দাগ একত্রে মিলে যায় এবং পুরো পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। মারাত্মক আক্রমণ হলে পাতা শুকিয়ে যায়।

চিত্র: পাতার দাগ রোগাক্রান্ত স্ট্রবেরি গাছ

প্রতিকার

- রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা।
- রোগমুক্ত চারা ব্যবহার করতে হবে। সম্ভব হলে টিস্যু কালচারের চারা লাগাতে হবে।
- রোগের মাত্রা বেশি হলে সিকিউর নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করে সুফল পাওয়া যায়।

২) ফল পচা রোগ (Fruit rot): এটি সমগ্র বিশ্বেই স্ট্রবেরির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ রোগ।
লক্ষণ: প্রথমত ফুল ও ছোট ফল এ ছত্রাক জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু লক্ষণ প্রকাশ পায় সবুজ এবং পাকা ফলে, ফলের উপর ছোট, হালকা বাদামি দাগ দেখা যায়। দাগগুলো দ্রুত বড় হয়।

চিত্র: রোগাক্রান্ত স্ট্রবেরি

প্রতিকার

- গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখতে হবে।
- আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।
- ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই ব্যাভিস্টিন নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৮-১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

৩) ভার্টিসিলিয়াম উইল্ট রোগ: এটি একটি ছত্রাক জনিত রোগ।
লক্ষণ: আক্রান্ত গাছ শুরুতেই নেতিয়ে পড়ে এবং বয়স্ক পাতার কিনারা ও মধ্যশিরা বাদামি হয়ে যায়। কচি পাতা সবুজ থাকে এবং আস্তে আস্তে আক্রান্ত হয়। গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, খাটো হয় এবং পরিশেষে মারা যায়। আক্রান্ত গাছের মুকুট ন্যাক্রোটিক বা পচে যায়।

চিত্র: ভারটিসিলিয়াম উইল্ট রোগ

প্রতিকার

- জমি শুষ্ক রাখতে হবে।
- রোগ মুক্ত চারা রোপণ করতে হবে।
- কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন- বর্দোমিক্সার (১:১:১০) ৮-১০ দিন পরপর ২-৩ বার গাছের গোড়া ও মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৪) ভাইরাস রোগ: এফিড নামে এক ধরণের ছোট পোকা এই রোগের ভাইরাসের বাহক হিসাবে কাজ করে।

লক্ষণ: আক্রান্ত

- অতক্রান্ত পাতার হলুদ বর্ণ ধারণ করে।
- আক্রান্ত পাতা কুঁচকে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।

প্রতিকার: রোগের বাহক জাবপোকা দমনের জন্য কীটনাশক সাইফানন ৫৭ ইসি অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

পাখি: বুলবুলি পাখি স্ট্রবেরির সবচেয়ে বড় শত্রু। ফল আসার পর সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই পাখির উপদ্রব শুরু হয়।

প্রতিকার: ফল আসার পর সম্পূর্ণ বেড জাল দ্বারা ঢেকে দিতে হবে যাতে পাখি ফল খেতে না পারে।

৩.২.৫ ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফল সংগ্রহ: মাসের মাঝামাঝি (অক্টোবর শুরু) সময়ে রোপণকৃত বারি-১ স্ট্রবেরির ফল সংগ্রহ পৌষ মাসে শুরু হয়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত চলে।

পরিপক্কতার লক্ষণ: ফল পেকে লাল বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হবে।

সংরক্ষণ: স্ট্রবেরির সংরক্ষণ কাল খুবই কম বিধায় ফল সংগ্রহের পর পরই তা টিস্যু পেপার দিয়ে মুড়িয়ে প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা ডিমের ট্রেতে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে ফল গাদাগাদি অবস্থায় না থাকে। ফল সংগ্রহের

২০২৪

পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারজাত করতে হবে। স্ট্রবেরি সংরক্ষণ গুণ ও পরিবহন সহিষ্ণু কম হওয়ায় বড় বড় শহরের কাছাকাছি এর চাষ করা উত্তম।

৩.৩ তরমুজ উৎপাদন (Watermelon Production)

তরমুজ আমাদেরদেশের একটি অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ সুস্বাদু ফল। এ ফলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ, ভিটামিন এ, বি, সি থাকে। তরমুজের রস শরীরকে ঠান্ডা রাখে। এখন বিদেশ কবশেষত জাপান থেকে উন্নত জাতের হাইব্রিড তরমুজের বীজ আসায় এ দেশে ভাল ভাল তরমুজ উৎপাদন হচ্ছে। পতেঙ্গা, গোয়ালন্দ, ঠাকুরগাও, গলাচিপা, কুয়াকাটায় প্রচুর তরমুজ চাষ হচ্ছে। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় ১৬.৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে তরমুজ চাষ হয়ে থাকে যাহার ফলন প্রায় ৩৪৫.৯৬ হাজার মে.টন (বিবিএস২০২১) । গরমকালের ফল হলেও এখন অমৌসুমেও জাতের কল্যাণ তরমুজ চাষ হচ্ছে। বরং মৌসুমের চেয়ে অমৌসুমে চাষ করে অনেকেই বেশি লাভবান হচ্ছে।

৩.৩.১ তরমুজের পরিচিতি ও জাত নির্বাচন

চিত্র: তরমুজ ফলের তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

তরমুজের ফলের উৎপত্তি: তরমুজের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ আফ্রিকা।

জাত নির্বাচন: তরমুজের এখন অনেক ভাল ভাল হাইব্রিড জাত এ দেশে এসেছে। আমাদের দেশের চাষযোগ্য কিছু জাতের সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো:

১. সুগার বেবী: গ্রীস্মপ্রধান এলাকার জন্য উপযোগী।

বৈশিষ্ট্য: আগাম জাত। ফল গোলাকার, রঙ নীলাভ সবুজ এবং ওজন ৪-৫ কেজি।

২. টপ ইল্ড (Top yield): আমাদের দেশে জাতটি ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে। এটি একটি জাপানী হাইব্রিড জাত।

বৈশিষ্ট্য: এ জাতের তরমুজ ডিম্বাকার, রঙ হালকা সবুজ এবং তার উপর সরু ও গাঢ় সবুজ রঙের রেখা আছে, ফলের ওজন ৮-১০ কেজি। প্রতি গাছে ৪টি ফল ধরে এবং ফলের মিষ্টতা ১০.৪%। বীজ বপন থেকে প্রথম স্ত্রী ফুল ফুটতে প্রায় ৭১ দিন সময় লাগে। ফিউজারিয়াম ও এনথ্রাকনোজ রোগ সহনশীল।

৩. ডব্লিউ এম ০০২ (WM 002): এ জাতটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কতৃক উদ্ভাবিত একটি হাইব্রিড জাত।

বৈশিষ্ট্য: এ জাতের তরমুজ আয়ত গোলাকার, রঙ সবুজ এবং ফলের গড় ওজন ৮.৭ কেজি। প্রতি গাছে ৪টি ফল ধরে এবং ফলের মিষ্টতা ১১.২%। খোসা ১.২ সে.মি. পুরু। বীজ বপন থেকে প্রথম স্ত্রী ফুল ফুটতে প্রায় ৫৯ দিন সময় লাগে। এ জাতটি টপ ইল্ড থেকে আগাম ফলন দেয় ও বেশি মিষ্টি।

৪. ডব্লিউ এম ০০৩ (WM ০০৩): এটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কতৃক উদ্ভাবিত একটি হাইব্রিড জাত।

বৈশিষ্ট্য: এ জাতের তরমুজ আয়ত গোলাকার, রঙ হালকা সবুজ এবং ফলের গড় ওজন ৮.২ কেজি। প্রতি গাছে ৫টি ফল ধরে এবং ফলের মিষ্টতা ১১.৮%। খোসা ১.২ সে.মি. পুরু। বীজ বপন থেকে প্রথম স্ত্রী ফুল ফুটতে প্রায় ৫৪ দিন সময় লাগে। এ জাতটি টপ ইল্ড থেকে আগাম ফলন দেয় ও বেশি মিষ্টি।

৫. সাগর কিং (Sagor King): এটি একটি হাইব্রিড জাত।

বৈশিষ্ট্য: এ জাতের তরমুজ ডিম্বাকার, খোসার রঙ কাল, বীজ ছোট, আগাম পাকে এবং ফলের গড় ওজন ৩-৫ কেজি। ফলের শাঁস লাল, মিষ্টি এবং ফলের মিষ্টতা ১৩.৫%। ফল পাকতে ৬০-৬৫ দিন সময় লাগে। এ জাতটি সব মৌসুমেই চাষ করা যায় এবং সংরক্ষণকাল ভাল।

৬. টারবো: বড় আকারের তরমুজ।

বৈশিষ্ট্য: এ জাতের তরমুজ অবডিম্বাকার, খোসার রঙ হালকা সবুজের মধ্যে গাঢ় সবুজ লম্বা রেখা। ফলের গড় ওজন ৮-১০ কেজি। ফলের শাঁস লাল, মিষ্টি এবং ফলের মিষ্টতা ১২-১৩%। ফল পাকতে ৮০ দিন সময় লাগে। এ জাতটি সব মৌসুমেই চাষ করা যায় এবং সংরক্ষণকাল ভাল। ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া ও এনথ্রাকনোজ রোগ প্রতিরোধী। এই জাতটি খরা ও আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে।

৩.৩.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

জমি ও মাটি নির্বাচন: তরমুজ চাষের জন্য চাই প্রচুর রোদ আর শুকনো জমি। বেলে দো-আঁশ মাটি তরমুজ চাষের জন্য বেশি উপযোগী। নদীর চর এলাকায় সহজে তরমুজ চাষ করা যায়।

বীজ বপন/ চারা রোপণের সময়: বীজ বপন/ চারা রোপণের সময় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস।

জমি তৈরি: জমি প্রথমে ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর পুরো জমি চাষ দিলে কয়েক দিন মাটিকে রোদ খাওয়াতে হবে।

২০১৪

বীজ হার: প্রতি শতকে ৪ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ গজানো: স্বাভাবিক পরিবেশে সহজে তরমুজের বীজ গজাতে চায় না। বীজ গজানোর জন্য কমপক্ষে ২৫-৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। ১৫° সেন্টিগেডের নিচে বীজ মোটেই গজায় না। এই জন্য শীতের শেষে বীজ বপন করতে হয়। আগাম তরমুজ চাষের ক্ষেত্রে আগেই বীজ বপণ করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসেই বীজ বপন করতে হয়। শীতকালে খুব ঠান্ডা থাকলে তরমুজের বীজ ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে সদ্য গোবরের গাদার ভিতরে একটা কাপড়ের পুঁটলিতেবেঁধে ২-৩ দিন রেখে দিতে হবে। তাহলেই বীজ গজিয়ে যাবে।

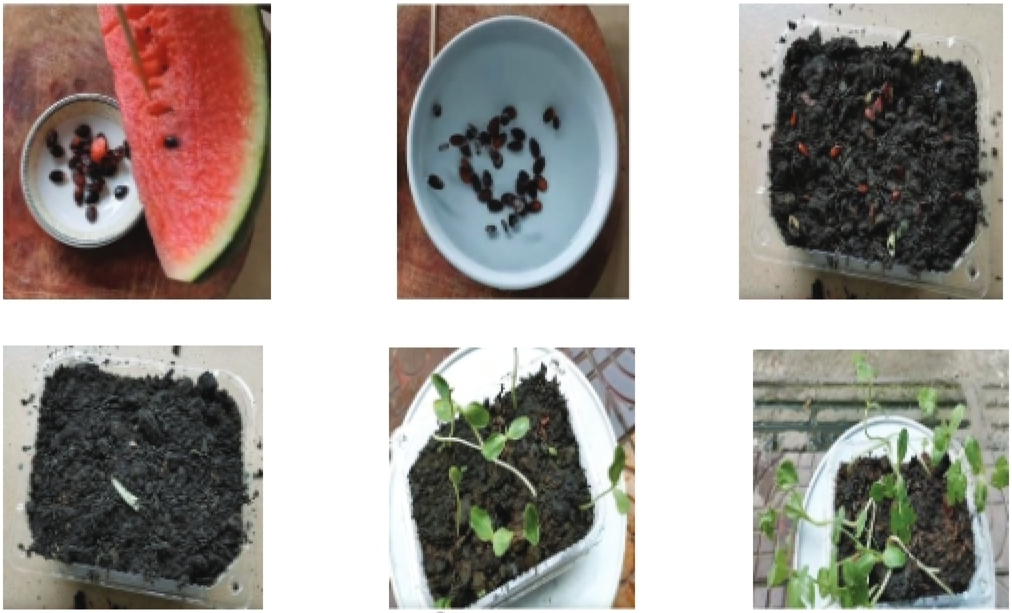

চিত্র: তরমুজ বীজ হতে চারা তৈরি

লেআউট তৈরি: সাধারণত বর্গাকার রোপণ পদ্ধতিতে তরমুজ চাষ করা হয়।

চিত্র:বর্গাকার লেআউট

গর্ত/ মাদা তৈরি: সারি করে মাদা তৈরি করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২ মিটার এবং প্রতি সারিতেও ২ মিটার পর পর মাদা করতে হবে। অর্থাৎ প্রতি মাদা থেকে মাদার দূরত্ব সব দিক থেকে হবে ২ মিটার। বীজ বপনের অন্তত ৮-১০ দিন আগে মাদা তৈরি করতে হবে। প্রতিটি মাদা ৫০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ৩০ সেন্টিমিটার গভীর করে খুড়তে হবে।

মাদায় সার প্রয়োগ: জমি শেষ চাষের পর মাদায় হেক্টর প্রতি ২০ টন গোবর, ৮০ কেজি ইউরিয়া সার, ১০০ কেজি টিএসপি, ও ৫০ কেজি এমওপি সার ভাগ করে প্রত্যেকটা মাদার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

৩.৩.৩ চারা সংগ্রহ ও রোপণ

বীজ বপন ও চারা রোপণ: এ দেশে সরাসরি মাদায় অংকুরিত বীজ বপন করে তরমুজ চাষ করা হয়। তবে সেটা না করে চারা তৈরি করে সেসব চারা মাদায় রোপণ করতে পারলে ভাল হয়। সরাসরি বীজ বপন করলে শ্রম কম লাগে ঠিকই তবে বীজের অপচয় বেশি হয়। কেননা, প্রতিটি মাদায় ৪-৫ টি বীজ বপন করতে হয়। অথচ চারা রোপণ করলে প্রতি মাদায় মাত্র ১টি করে চারা রোপণ করা হয়। চারা লাগানোর জন্য আগেই পলিব্যাগে চারা তৈরি করে রাখতে হবে। চারা তৈরি করে রাখলে আগাম চাষ করতেও সুবিধা হয়। এতে তরমুজ উৎপাদন ৪০-৫০ দিন এগিয়ে যেতে পারে। চারার বয়স যখন ৩০-৩৫ দিন হয় তখন তাতে ৫-৬ টি পাতা হয়। সেরুপ চারাই মাদায় রোপণ করা উচিত।

চারা/ কলম ও বংশ বিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন: তরমুজ সাধারনত বীজে মাধ্যমে চারা তৈরি করে চাষ করা হয়।

৩.৩.৪ আন্ত:পরিচর্যা

আগাছা দমন: তরমুজ জমি সবসময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা: চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন পর প্রথম কিস্তির সার দিতে হবে। এ সময় হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া সার ও ৮০ কেজি এমওপি সার চারার গোড়া থেকে ৫-৭ সে.মি. দূর দিয়ে রিং আকারে দিতে হবে। দ্বিতীয়, তৃতীয়ও চতুর্থ কিস্তির ৬০ কেজি করে ইউরিয়া সার ও ৮০ কেজি করে এমওপি সার যথাক্রমে প্রথম ফুল ফোটার সময়, ফল ধরার সময় ও ফল ধরার ১৫-২০ দিন পর একইভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন: মাটিতে রসের অভাব দেখা দিলে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

খড় বিছিয়ে দেওয়া: ফল ধরার পর মাটির সংস্পর্শ থেকে ফলের খোসার দাগ হতে পারে বা পচন ধরতে পারে। তাই প্রতিটি ফলের নিচে খড়কুটো বিছিয়ে দিতে হবে।

ফল পাতলাকরণ: একটি গাছে বেশি তরমুজ রাখলে তরমুজ বড় হয় না। তাই একটি গাছে ৩-৪ টি ফলের বেশি ফল ধরলে তা ছিঁড়ে ফেলতে হবে। ফল ছিঁড়ে ফেলতে হবে একবারে কচি অবস্থায়। ভাল হয় যদি প্রথম থেকেই গাছ ও ফলের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গাছের ডগা ছাড়তে শুরু করলে হৃষ্টপুষ্ট দেখে ৪ টি ডগা বা লতা রেখে বাকিগুলো কেটে ফেলতে হবে। প্রতিটি ডগায় আবার প্রথমে যে ফুল আসে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

লতায় ৪-৫ টি গিট পরযে ফুল আসবে তাতে যে ফলটি ভাল দাঁড়াবে সেটি রেখে দিতে হবে। এভাবে প্রতিটি লতায় একটি করে ফল রাখতে হবে। সাধারণত প্রতি লতায় ৩০ টি পাতার জন্য একটি ফল রাখলে ভাল হয়।

কৃত্রিম পরাগায়ণ: তরমুজের প্রাকৃতিক পরাগায়ন প্রধাণত: মৌমাছি-বোলতা দ্বারা সম্পন্ন হয়। অযথা ও নির্বিচারে কীটনাশক ছিটানোর কারণে তরমুজের সব ফুলে প্রাকৃতিক পরাগায়ন ঘটে না এবং এতে ফলন কমে যায়। হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করে তরমুজের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। কৃত্রিম পরাগায়নের নিয়ম হলো ফুল ফোটার পর প্রতি দিন সকালে পুরুষ ফুল ছিড়ে ফুলের পাপড়ি অপসারণ করা হয় এবং ফুলের পরাগধানী (Anther-যার মধ্যে পরাগরেণু থাকে) আস্তে করে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে (Stigma) ঘষে দেয়া হয়। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৪-৫টি স্ত্রী ফুলে পরাগায়ন করা যায়। এতে ফল ধরা নিশ্চিত হয় ও ফলের আকার ভাল হয়।

তরমুজের পোকামাকড়

১) তরমুজের মাছি পোকা (Fruit fly): মাছি পোকা তরমুজের একটি মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা।

ক্ষতি লক্ষণ: পুর্ণবয়স্ক ফলের মাছি পোকা সরাসরি ফলের ক্ষতি করে না, এর কীড়া বা ম্যাগোট ফলের ক্ষতি করে। ফলের খোসার ঠিক নিচে স্ত্রীমাছি তার লম্বা সরু ডিম পাড়ার নলের সাহায্যে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া বের হয়ে ফল ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে এবং শাঁস খায়। কচি ফল থেকে শুরু করে পাকা ফল পর্যন্ত এদের আক্রমণ দেখা যায়। ফর আক্রান্ত হলে কীড়ার তৈরি ছিদ্রপথে একটি সুড়ঙ্গ পথ ও ক্ষত সৃষ্টি করে। এতে আক্রান্ত স্থান থেকে ফল পচতে শুরু করে। কচি ফল হলে তা এ পোকার আক্রমণে সম্পূর্ন পেচে যেতে পারে এবং ঝড়ে পড়ে। কচি ফলের গায়ে ছোট ছিদ্র দেখলে সহজেই এ মাছির আক্রমণ সম্পর্ক নিশ্চিত হওয়া যায়।

চিত্র: মাছি পোকা ও আক্রান্ত তরমুজ ফল

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
- প্রতিটি ফল পলিথিন বা কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখতে হবে যাতে মাছি পোকা ডিম পাড়তে না পাড়ে।
- ফলের মাছি পোকা দমনের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো বিষটোপ ফাঁদ ব্যবহার করা।
- কিউলিউর নামক সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে পুরুষ মাছি পোকা আকৃষ্ট করে মাছি পোকাসমূহকে মেরে ফেলা।

চিত্র: ফেরোমোন ফাঁদ

২) লাল পাম্পকিন বিটল (Red pumpkin beetle)

ক্ষতি লক্ষণ: পূর্ণবয়স্ক পোকা তরমুজের পাতা খেয়ে অনিষ্ট করে। এরা পাতায় অসম গোলাকার ছিদ্র করে খায়। অধিক খাওয়ার ফলে অনেক সময় শুধু শিরা উপশিরাগুলো অবশিসবট থাকে। চারাগাছ এদের দ্বারা মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে হাত দিয়ে পূর্ণবয়স্ক পোকা ধরে ধ্বংস করতে হবে।
- ক্ষেত সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে এ পোকার আক্রমণ কম হয়।
- গাছ কিছুটা বড় হলে হাতজাল দিয়ে পোকা ধরে ধ্বংস করা যায়।
- চারা বা গাছে এ পোকার আক্রমণের মাত্রা অধিক হলে ১ লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ফেনিট্রোথিয়ন ৫০ ইসি বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

তরমুজের রোগবালাই

১) পাতায় দাগ (Leaf spot): ছত্রাক জনিত জীবানুর আক্রমণে তরমুজে এ রোগটি হয়।

লক্ষণ: এ রোগের আক্রমণে পাতার ওপর প্রথমে ছোট ছোট পানি ভেজা দাগ পড়ে। দাগগুলো ধীরে ধীরে বড় হয়ে গোলাকার দাগে পরিনত হয়। এসব দাগের রঙ হয় ধূসর বাদামি বা হালকা বাদামি দাগের কেন্দ্রস্থল হয় সাদাটে বা হালকা রঙের। দাগের চারিদিকে গাঢ় বাদামি বা কালো রঙের বেষ্টনী দেখা থাকে। কখনো কখনো দাগের কেন্দ্রস্থল ফুটো হয়ে যায়। এরুপ দাগ দেখতে অনেকটা ব্যাঙের চোখের মতো বলে এরুপ লক্ষণকে "ফ্রগ আই স্পট"ও বলা হয়। অনেকগুলো দাগ এক সাথে মিশে বড় দাগে পরিনত হয় ও পাতাকে শুকিয়ে ফেলে। এতে পাতা মরে যায়।

রোগের ব্যবস্থাপনা

- জমি সবমসয় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- আক্রান্ত গাছের পাতা ও অন্যান্য অংশ সংগ্রহ করে পুড়িয়েফেলতে হবে।
- এরোগ দেখা দিয়ে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল মিশিয়ে ১০ থেকে ১২ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।

চিত্র: পাতায় দাগ পড়া রোগাক্রান্ত তরমুজ পাতা

২) ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া (Fusarium wilt): এক ধরনের ছত্রাক জনিত জীবানুর আক্রমণে তরমুজে এ রোগটি হয়।

ক্ষতি লক্ষণ: মাঝে মাঝে ক্ষেতে তরমুজ গাছের কিছু লতা হঠাৎ নেতিয়ে পড়তে দেখা যায়। নেতিয়ে পড়া সেসব লতায় কোনো পোকা বা রোগ দেখা যায় না। ঢলে পড়া রোগের আক্রমণে এরুপ হয়ে হেয়ে থাকে। গাছের যে কোনো বৃদ্ধির স্তরে ঢলে পড়া রোগ হতে পারে। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে পুরো গাছই দ্রুত ঢলে পড়ে ও মরে যায়। বড় গাছের অনেক সময় অল্প কিছু লতা ঢলে মরে যায়। ঢলে পড়া এসব গাছের কান্ড বা লতা চিরে ফেললে তার ভিতরে বাদামি বা হলুদ রঙের রেখা দেখা যায়।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা:

- রোগ প্রতিরোধী জাতের তরমুজ চাষ করতে হবে।
- একবার এ রোগ দেখা দিলে সেই জমিতে পরের বছর তরমুজ জাতীয় ফসল চাষ না করে অন্য ফসল যেমন ধান চাষ করা।
- আক্রান্ত ফসল সংগ্রহ করে শুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলা।
- একবার ঢলেপড়া রোগ হয়ে গেলে কোনো ছত্রাকনাশক দিয়ে লাভ হবে না। তবে বীজ বপনের আগে প্রতি কেজি বীজ ২.৫ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম দিয়ে শোধন করে নিলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

৩) **অ্যানথ্রাকনোজ (Anthracnose)**: তরমুজ ফলের এটি একটি প্রধান ক্ষতিকর রোগ। ছত্রাক জনিত কারনে এ রোগ টি হয়ে থাকে।

ক্ষতির লক্ষণ: তরমুজ গাছের সব অংশেই অর্থাৎ পাতা, লতা ও ফল-এ রোগে আক্রান্ত হয়। পাতার উপরে প্রথমে হলুদ রঙের ছোট ছোট পানিভেজা দাগ দেখা যায়। সেগুলো পরে কালচে বাদামি এবং দাগের চারপাশে সরু হলুদ রেখার বেষ্টনী থাকে। পাতার দাগগুলো গোলাকার হলেও বোঁটা ও কান্ডের দাগ হয় ডিমের মতো এবং গাঢ় রঙের। ফল পরিণত হওয়ার সময় তার গায়েও দাগ পড়ে। দাগগুলো হয় টোপ খাওয়া বা বসা, কুঁচকনো আক্রান্ত জায়গা পচে যায়। এজন্য একে তরমুজের ফল পচা রোগও বলা হয়।

চিত্র: অ্যানথ্রাকনোজ রোগাক্রান্ত তরমুজ পাতা ও ফল

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা:

- একই জমিতে পরপর এই জাতীয় ফসল চাষ না করা।
- এ রোগের বিকল্প পোষক বা আগাছা পরিষ্কার করা।
- প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম বা ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে বপনের আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে।
- রোগ দেখা দিলে ছত্রাকনাশক বিশেষ করে ম্যানকোজেব গ্রুপের যে কোন ছত্রাকনাশক (যেমন-ডায়াথেন এম-৪৫) প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে গুলে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করতে হবে।

৩.৩.৫ ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

পরিপক্কতার লক্ষণ: ফল পাকলে ফলের গায়ে টোকা দিলে ধাতব পাত্রের মত যদি ঠন ঠন আওয়াজ হয় তাহলে বুঝতে হবে ফল পাকেনি। আর যদি ঢাকের মত ঢ্যাব ঢ্যাব আওয়াজ হয় তাহলে বুঝতে হবে ফল পেকেছে। তাছাড়া তরমুজ উল্টে যদি দেখা যায় মাটি সংলগ্ন অংশ সাদা তাহলে বুঝতে হবে তরমুজ পাকেনি। আর যদি দেখা যায় যে রঙ হলুদাভ হয়েছে তাহলে বুঝতে হবে ফল পেকেছে। পাকা তরমুজ কানের কাছে নিয়ে দুহাত দিয়ে চাপ দিলে তরমুজ যদি খচ খচ আওয়াজ করে তাহলে বুঝতে হবে তরমুজ পেকেচছ। ফলের মুখে যে ফুল থাকে, ফল পাকলে সেটিও একবারে শুকিয়ে যায়। ফলের বোঁটার সঙ্গে যে আকর্শি থাকে তা শুকিয়ে বাদামি রং হয়। এসব লক্ষণ দেখে নিশ্চিত হতে হবে যে ফল পেকেছে কিনা। পরিণত বা পাকা ফল তোলা ভাল।

ফল সংগ্রহ: কোন জাতের তরমুজ কত দিনে পাকে তা জেনে ক্ষেত থেকে পরিপক্ক তরমুজ তোলতে হবে। এর আগে ফল তুললে সে ফলের গুণগত মান ভাল হবে না। যেমন বারি উদ্ভাবিত জাত ডব্লিউ এম ০০২ এবং ডব্লিউ এম ০০৩ জাত দুটির ফল পাকতে ৯০-৯৫ দিন সময় লাগে বা স্ত্রী ফুল ফোটার ৩০-৩৫ দিন পর ফল তোলা যায়। অন্যান্য জাতের বেলায়ও ৮৫-৯৫ দিন লাগে। যদি দূরের বাজারে বিক্রি করতে হয় বা পরিবহনে বেশি সময় লাগে তাহলে একটু কাঁচা থাকতে ফল তুলতে হবে।

২০১৪

৩.৪ কাজুবাদাম উৎপাদন (Cashewnut production)

কাজু বাদাম হলো সুস্বাদু ও অত্যন্ত পুষ্টিকর অর্থকরী ফল। এই বাদামের চাহিদা বাজারে অন্যান্য বাদামের থেকে অনেকাংশে বেশি। কাজু বাদামের দুটি অংশ। কাজু যাকে আপেল বলা হয় আর অন্যটি বাদাম যা দেখতে মানুষের কিডনির মত।

৩.৪.১ কাজুবাদাম ফলের পরিচিতি ও জাতনির্বাচন

আপেল সরাসরি খাওয়া যায়। বাদাম প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ার উপযোগী করা হয়।

পুষ্টিগুণ: কাজুবাদাম একটি পুষ্টিকর খাদ্য। এতে শতকরা ২১ ভাগ প্রোটিন, ৪৭ ভাগ চর্বি, ২২ ভাগ শর্করা এবং খনিজ লবন ও ভিটামিন আছে। তাছাড়া, কাজুবাদামের আপেলের রসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে এবং এই ভিটামিন সি এর পরিমাণ কমলালেবুর চেয়ে পাঁচগুণ বেশি।

কাজুবাদাম উৎপত্তি: কাজুবাদামের উৎপত্তিস্থল ব্রাজিল।

জাত নির্বাচন: ফলের রঙের ভিত্তিতে লাল, হলুদ, গোলাপী জাত নামে চেনা যায়। ভেঙ্গুরলা-১ (Vengurla-1), ভেঙ্গুরলা-৮ (Vengurla-8), উলাল-৩, BLA39-4, BLA-4, BPP-1, BPP-4, Ullal-1, ভাস্করা প্রভৃতি কাজুবাদামের উন্নত হাউব্রিড জাত যা চাষের জন্য বেশ উপযোগী।

৩.১.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

চাষের জলবায়ু: কাজুবাদাম সাধারণত উষ্ণ মন্ডলীয় ফল। কষ্ট সহিষ্ণু ও খরা প্রতিরোধী। প্রখর সূর্যালোক পছন্দ করে এবং ছায়াতে তেমন বৃদ্ধি পায়না। তাপমাত্রা অধিক হলে কচি ফল ঝরে যায়। অধিক বৃষ্টিপাত এবং মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া ফলন কমিয়ে দেয়। ২০-৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০০০-২০০০ মিলিমিটার কাজুবাদাম চাষে বেশ সহায়ক।

চিত্র: কাজুবাদাম গাছ

মাটি নির্বাচন: ভারী বেলে দো-আঁশ এবং লাল মাটির পাহাড়ি ঢালের কাজুবাদাম ভালো জন্মায়। মাটির অম্লমান (pH) ৫-৬.৫ গাছের বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত।

লেআউট তৈরি: সাধারণত বর্গাকার রোপণ পদ্ধতিতে কাজুবাদাম চাষ করা হয়।

বংশ বিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন: কাজুবাদাম বীজ ও কলম উভয় পদ্ধতির চারা দিয়ে বংশ বিস্তার করা যায়। তবে বীজ থেকে উৎপন্ন চারা দিয়ে বাগান না করে কলমের চারা দিয়ে বাগান করার উদ্দেশ্যে হলো:- কলমের থেকে তৈরি চারার মাতৃ গাছের সমস্ত গুণাগুণ বজায় থাকে। অল্প বয়সে গাছ ফলন দিতে শুরু করে বরং বাগানের সব গাছে প্রায় একই রকম ফলন পাওয়া যায়। সাধারণত ক্লেফট গ্রাফটিং পদ্ধতিতে কাজুবাদামের কলম তৈরি করা হয়।

গর্ত/ মাদা তৈরি: কাজুবাদামের জন্য স্কোয়ার রোপণ পদ্ধতিতে সারি থেকে সারি ৭-৮ মিটার দূরত্বে রোপণ করলে হেক্টর প্রতি কমবেশি ১৫০-১৮০ টি কলমের প্রয়োজন। গর্তের মাপ ৬০ সে.মি.× ৬০ সে.মি. × ৬০ সে.মি.। এ দূরত্বে চারা রোপণ করলে ৩-৪ বছর আন্তঃফসল হিসাবে অন্যান্য ফসল আবাদ করা যাবে। কলম লাগানোর ১৫-২০ দিন আগে গর্ত করে রোদ লাগাতে হবে যাতে উই পোকা দমন হয়। তারপর উপরের মাটির সাথে ৫ কেজি অর্বজনা সার এবং ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করতে হবে। কলমের গোড়ায় যাতে পানি না জমে তার নিষ্কাশনের নালা রাখতে হবে।

৩.৪.৩ চারা সংগ্রহ ও রোপণ

বীজ থেকে চারা তৈরি: পাকা ফল গাছ থেকে ঝরে পড়লে যেকান থেকে বীজ সংগ্রহ করা বেশ ভাল। এপ্রিল-মে মাসে পাকা ফলের বাদাম সংগ্রহ করে ৩-৪ দি রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনা বীজ ২৪-৩৬ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে অংকুরিত বীজ জুন মোসে বপন করলে অংকুরোদগম বেশি হয়।

কলমের চারা তৈরি: জুলাই-অক্টোবর মাস পর্যন্ত কলম করা যায়। ২-৬ মাসের চারাকে আদি জোড় (Root stock) হিসাবে নেয়া হয়। কাঙ্খিত গাছের সায়ন (Scion) ক্লেফট গ্রাফটিং পদ্ধতিতে স্থাপন করে নতুন চারা তৈরি করা হয়।

চারা/ কলম ও বংশ বিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন: পেন্সিলের মতো পুরু বাদামি রঙের সায়ন নির্বাচন (৩-৫ মাস) করে বৃন্তের উপরিভাগের পাতাগুলো কেটে ৭-১০ দিন গাছে রেখে দিতে হবে. লক্ষ্য রাখতে হবে বৃন্ত গুলি যেন আপনা আপনি ঝরে পরে। এবার পেন্সিলের মতো পুরু ৪৫-৬০ দিন বয়সের চারা ২৫x ১৫সেন্টিমিটার পলিব্যাগে রুটস্টকের এর জন্য নির্বাচন করতে হবে।

চিত্র:কাজুবাদামের বংশবিস্তার পদ্ধতি

রোপণের সময়: জুন-আগষ্ট চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

কলম রোপণ: সাধারণত ১ বছরের কলমের চারার লাগালে ভাল হয়। চারা লাগানোর সময়, পলিথিন ব্যাগটি খুব সাবধানে খুলে গর্তের ঠিক মাঝখানে বসিয়ে দিতে হবে।

চিত্র:কাজুবাদামের বীজ

চিত্র:কাজুবাদামের চারা

৩.৪.৪ অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

সার ব্যবস্থাপনা: মে-জুন মাসে প্রথমবার এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে দ্বিতীয়বার গছের গোড়ায় রিং পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। ১ বছর বয়সী গাছের গোড়ায় ২ বারে গোবর/জৈবসার ১০ কেজি, ইউরিয়া ২৫০ গ্রাম, টিএসপি ২০০ গ্রাম, এবং পটাশ ১৫০ গ্রাম প্রয়োজর। পরবর্তীতে ২য় বছরে দ্বিগুণ, ৩য় বছরে তিনগুণ এভাবে সারের মাত্রা বাড়াতে হবে। তবে কাঙ্খিত ফলনের জন্য গাছের চাহিদামত যুক্তিসংগত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

বছর	জৈবসার		ইউরিয়া (গ্রাম)		টিএসপি (গ্রাম)		এমওপি সার (গ্রাম)	
	১ম বার	২য় বার	১ম বার	২য় বার	১ম বার	২য় বার	১ম বার	২য় বার
১ম বছর	৫ কেজি	৫ কেজি	১২৫	১২৫	১০০	১০০	৭৫	৭৫
২য় বছর	১০	১০	২৫০	২৫০	২০০	২০০	১৫০	১৫০
৩য় এবং পরবর্তী বছর গুলোর জন্য	১৫	১৫	৩৭৫	৩৭৫	৩০০	৩০০	২২৫	২২৫

খুঁটি দেওয়া এবং মালচিং: চারা লাগানোর পরই গাছটিকে শক্ত খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। মাটির আদ্রতা বজায় রাখতে এবং আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য গাছের গোড়ায় মালচিং করে দিতে হবে।

পানি সেচ: কাজুবাদামে তেমন সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে গ্রীষ্মকালে ফল ধরার সময় একবার সেচ দিয়ে মালচিং করে দিলে বেশ ভাল হয়।

ডালপালা ছাঁটাই: কলমের চারার ক্ষেত্রে জোড়া লাগা স্থানের নিচে গজানো সকল ডাল কেটে ফেলতে হবে। ৩-৪ বছরের মধ্যে ডালপালা কেটে গাছের উপযুক্ত কাঠামো তৈরি করতে হবে। ৪-৫ বছর পর মাটি থেকে ৪-৫ মিটার উপরে গাছের কান্ড কেটে দিতে হবে। তাছাড়া ঘন, রোগাক্রান্ত মরা ডাল ছাঁটাই করে দিতে হবে।

পোকামাকড়:

১) কান্ড ও মূল ছিদ্রকারী পোকা:

লক্ষণ: এ পোকা গাছের কচি কান্ড ও কচি ফল ছিদ্র করে ক্ষতি করে। কীড়াগুলি কান্ডে এবং শিকড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে। গাছের পাতা হলুদ হতে থাকে এবং আক্রান্ত গাছের অংশ থেকে আঁঠালো রস দেখা মাত্রই প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রতিকার:

- সরু তার ঢুকিয়ে কীড়া সমরে ফেলান ব্যবস্থা নেওয়া।
- কার্বারাইল কীটনাশক ২ গ্রাম হারে ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ছিদ্রের ভিতর স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- গাছের গোঁড়াতে আলকাতরা এবং কেরোসিন মিশ্রণ ১:২ অনুপাতে প্রলেপ লাগাতে হবে।

২) ফল ও বাদাম ছিদ্রকারী পোকা:

লক্ষণপোকা গাছের কচি কান্ড ও কচি ফল ছিদ্র করে ক্ষতি করে।

প্রতিকার: মনোক্রোটোফস জাতীয় কীটনাশক ০.০৫% হারে পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যায়।

রোগবালাই:

ডাইব্যাক: গোড়া ও শিকড় পচে যায়। নার্সারিতিই এই রোগ বেশি দেখা দেয়।

প্রতিকার: ক্যাপটান জাতয়ি ছত্রাকনাশক ১ গ্রাম হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজের গাছে ৩-৪ বছর পর এবং কলমের গাছে পরের বছর ফল ধরে। ১০ বছর গাছে পূর্ণ ফলন পাওয়া যায় এবং ২০-২৫ বছর তা অব্যাহত থাকে। গাছের নিচ থেকে শুধু ঝরে পড়া ফলই সংগ্রত করতে হবে। নভেম্বর- জানুয়ারি ফুল ফোটে এবং মার্চ-মে মাসে ফল পাকে। তারপর পরিপক্ক বাদামটি

আপেল থেকে সরিয়ে ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে বীজে ৯-১০% আদ্রতা থাকে এমন অবস্থায় ব্যাগে ভর্তি করে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩.৫ পেঁপে উৎপাদন (Papaya production)

পেঁপে একটি পুষ্টিকর ও ভেষজ গুণ সম্পন্ন ফল। কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই খাদ্য হিসাবে পেঁপে অত্যন্ত পুষ্টিকর। অধিকাংশ দেশেই পেঁপেকে পাকা ফল হিসাবে খাওয়া হয়। বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা ও যশোহরে উৎকৃষ্ট মানের পেঁপে চাষ হয়। আমাদের দেশে ৩.৪১ হাজার হেক্টর জমিতে পেঁপের আবাদ হয় এবং উৎপাদন ১২৫.৭৬ হাজার মেট্রিক টন (বিবিএস ২০২১)।

৩.৫.১ পেপে ফলের পরিচিতি ও জাত নির্বাচন

বাংলাদেশে পেঁপে খুবই জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। পেঁপের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত এটা স্বল্প মেয়াদি, দ্বিতীয় ইহা কেবল ফলই নয় সবজি হিসাবেও এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে, তৃতীয়ত পেঁপে অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং ঔষধি গুণসম্পন্ন। চতুর্থত, বাংলাদেশে যেখানে দীর্ঘমেয়াদি ফল লাগানোর স্থানের অভাব প্রকট, সেখানে যে কোন কৃষকের পক্ষে দুচারটা পেঁপে গাছ লাগানো সম্ভব।

পেঁপের ব্যবহার: অধিকাংশ দেশেই পেঁপেকে ফাকা ফল হিসাবে কাওয়া হয়। আমাদের দেশসহ আরো কয়েকটি দেশে কাঁচা পেঁপেকে সবজি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া পেঁপে থেকে তৈরি হয় বিভিন্ন প্রকার জ্যাম, জেলী, মোরব্বা, আইসক্রীম, শরবত, পায়েস, হালুয়া প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী। কাঁচা পেঁপে থেকে যে কষ বা পেপাইন পাওয়া যায়, শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হয।

ছবি: পেঁপের তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

পেঁপের উৎপত্তি: পেঁপের উৎপত্তিস্থল আমেরিকা

পুষ্টিগুণ: আমের পরেই ভিটামিন "এ" এর প্রধান উৎস হলো পাকা পেঁপে। কাঁচা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন হজমকারী পেপাইন থাকে।

চাষের জলবায়ু: উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পেঁপে চাষের জন্য উপযোগী। মোটামুটিভাবে ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা পেঁপে চাষের জন্য সবজচেয়ে উপযোগী।

পেঁপের জাত নির্বাচন:

শাহী পেঁপে (বারি পেঁপে ১): প্রচুর রাজশাহী অঞ্চল হতে সংগৃহীত স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়অর মাধ্যমে পেঁপের উন্নত জাত"শাহী পেঁপে" উদ্ভাবন করা হয়। শাহী পেঁপে একটি এক লিঙ্গিক জাতের পেঁপে। স্ত্রী ও পুরুষ ফুল আলাদা গাছে ধরে। স্ত্রী গাছের প্রতিটি পত্র কক্ষের একটি বোঁটায় ৩টি করে স্ত্রী ফুল আসে। অপর পক্ষে পুরুষ গাছে লম্বা বোঁটায় একসঙ্গে অনেক পুরুষ ফুল আসে। চারা লাগানোর ৩-৪ মাস পর ফুল আসে। হেক্টর প্রতি ফলন ৪০-৬০ টন।

ওয়াশিংটন: এ জাতের গাছের কান্ড পর্ব ও পত্রবৃন্তঘন বেগুনী বর্ণের। শাঁস হলুদ বর্ণের ও মিষ্টি। পাকা ফলের খোসা উজ্জল পীতাভ বর্ণের। ফল গোলাকার থেকে ডিম্বাকার, মধ্যম থেকে বড় আকারের এবং প্রায় ২০ সেমি লম্বা, ফলের ওজন প্রায় ১ কেজি, প্রতি গাছে ১১-৬৮ টি ফল ধরে।

রেড লেডি: এটি একটি হাইব্রিড জাতের পেঁপে। রেড লেডী জাতের পেঁপের শাঁস লাল। পাকা শাঁস পুরু, লাল, সুগন্ধযুক্ত, শাঁসে চিনির পরিমাণ প্রায় ১৩ শতাংশ। এ জাতটি রিংস্পট রোগ প্রতিরোধী। জাতটি রপ্তানীর জন্য উত্তম।

নো ইউ নাম্বার ১: এ জাতটি একটি হাইব্রিড জাত। পাকা ফলের শাঁস হলুদ, সুস্বাদু ও মিষ্টি। এ জাতে ফল বড়, প্রটি ফলের ওজন ১.৫- ৩ কেজি। গাছ মোট হয় এবং মোজাইক ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী। এ জাতের উভয়লিঙ্গী গাছ আছে। চারা রোপণের পর ৩-৪ মাসের মধ্যেই ফল দরতে শুরু করে। সারা বছর ফল ধরে।

চিত্র: পেঁপের পুরুষ ফুল

চিত্র: পেঁপের স্ত্রীফুল

চিত্র: পেঁপে ফল

৩.৫.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

জমি ও মাটি নির্বাচন: সুনিষ্কাশিত প্রচুর জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ হালকা দো-আঁশ বা পলি দো-আঁশ মটি পেঁপে চাষের জন্য উপযোগী। পেঁপে গাছ জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। এজন্য সুনিষ্কাশিত, পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ উঁচু জমির বেলে দো-আঁশ মাটি পেঁপে চাষের জন্য বেছে নেওয়া ভাল। মাটির অম্লমান বা p^H ৭.০ কাছাকাছি হলে পেঁপে জন্য ভাল।

চিত্র: মাঠে পেঁপে চাষ

জমি তৈরি: উপযুক্ত জমি নির্বাচন করার পর তা কয়েকবার চাষ ও মই দেওয়ার পর তৈরি করে নিতে হবে।

গর্ত তৈরি: জমি ভালভাবে চাষ দেওয়ার পর ২ মিটার চওড়া করে বেড করে নিতে হবে। দুই বেডেরে মাঝে ৩০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ১৫-২০ সেন্টিমিটার গভীর করে নিষ্কাশন নালা রাখতে হবে। বর্গাকার রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করে জাত ভেদে ২×২ মিটার দূরে ৬০×৬০×৬০ সেন্টিমিটার আকারের গর্ত /মাদা খনন করতে হবে। গর্ত প্রতি ১৫ কেজি পচা গোবর, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম, ২০ গ্রাম বরিক এসিড এবং ২০ গ্রাম জিংক সালফেট সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার মিশ্রিত মাটি দ্বারা গর্ত পূরণ করে সেচ দিতে হবে। একই গর্তে দু চারটি গাছ লাগালে পরে ভালটি রেখে অন্যগুলো কেটে ফেলতে হবে।

৩.৫.৩ চারা সংগ্রহ ও রোপণ

চারা/ কলম ও বংশ বিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন: সাধারণত তিনভাবে পেঁপের চারা উৎপাদন করা যায়: বীজ থেকে, কলমের সাহায্যে ও টিস্যু কালচারের মাধ্যমে। তবে আমাদের দেশে বীজ থেকেই চারা উৎপাদন করে পেঁপে চাষ করে থাকে।

চারা উৎপাদন: রোগমুক্ত গাছপাকা সুস্থ সবল, পোকা মাকড়ের আক্রমণমুক্ত ও যে কোন ভালো জাতের পেঁপে থেকে বীজ একটু ছাই দিলে চটকে নিয়ে বীজের উপরের পিচ্ছিল পর্দা সরিয়ে নিতে হবে। এর পরই বীজতলায় বীজ বপন করে দিতে হবে। বীজ বেশি শুকিয়ে গেলে গজানোর হার কমে যায়। বীজ বপন করার আগে ৩ গ্রাম/কেজি বীজ হারে ব্যাভিস্টিন জাতীয় ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করে নিতে হবে। পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করলে রোপণের পর চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৫×১০ সেমি আকারের ব্যাগে সমপরিমাণ বিলি, মাটি, পচা গোবরের মিশ্রন ভর্তি করে ব্যাগের তলায় ২-৩ টি ছিদ্র করতে হবে। এটি ব্যাগে একের অধিক চারা রাখা উচিত নয়। ২০-২৫ দিন বয়সের চারায় ১-২% ইউরিয়া স্প্রে করলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়।

চারা সংগ্রহ: বীজ থেকে সরাসরি চারা তৈরি করা যায়। তবে বাণিজ্যিকভাবে বীজ থেকে চারা তৈরি করে ফেঁপের বাগান করা হয়। পেঁপের প্রকৃত মাতৃগাছের চারা সংগ্রহের জন্যে জাত উদ্ভাবনকারী সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা ভাল। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার সেন্টার এবং বিএডিসির উদ্যান কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিস্তিত নার্সারী হতে পেঁপের চারা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বীজ বপন ও চারা রোপণের সময়: আশ্বিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) এবং পৌষ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) মাসে পেঁপের বীজ বপনের উত্তম সময়। বপনের ৪০-৫০ দিন পর চারা রোপণের উপযোগ হয়।

চারা রোপণ: চারা রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি উলট-পালট করে নিতে হবে। চারা রোপণের সময় প্রতি দুই সারির মাঝ দিয়ে অগভীর নালা তৈরি করে নালার মাটি দ্বারা বেড উঁচু করে দিতে হবে। পরবর্তী কালে এই নালা সেচের জন্য এবং পানি নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহার করা যায়। বর্ষা আগে ও পরে নালাগুলোকে পুনরায় খুঁড়ে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একলিঙ্গি জাতের চাষ করলে প্রতি গর্তে ৩০ সেমি দূরত্বে ত্রিভূজ আকারে ৩টি করে এবং উভয়লিঙ্গি জাতে চাষ করলে ১টি করে চারা রোপণ করতে হয়। বীজ তলায় উৎপাদিত চারার উন্মুক্ত পাতাসমূহ রোপণের পূর্বে ফেলে দিলে রোপণকৃত চারার মৃত্যু হার কমবে এবং চারা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হবে। পলিব্যাগে উৎপাদিত চারা ক্ষেত্রে পলিব্যাগটি খুব সাবধানে অপসারণ করতে হবে যাতে মাটির বলটি ভেঙ্গে না যায়। পড়ন্ত বিকালে চারা রোপণের সর্বোত্তম সময়। রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে চারার গোড়া যেন বীজতলা বা পলিব্যাগের মাটি যতটা গভীরে ছিল তার চেয়ে গভীর না হয়। চারা রোপণের পর চারা গাছে পানি সেচ ও ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৫.৪ আন্ত:পরিচর্যা

গাছ পেঁপে খুবই স্পর্শকাতর গাছ। রোপণ পরবর্তী নিম্ন লিখিত পরিচর্যা গুলো অনুসরণ করলে কাঙ্খিত নিশ্চিত করা যায়।

আগাছা পরিষ্কার: পেঁপে গাছ সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বর্ষা মৌসুমে আগাছা দমন করতে গিয়ে মাটি যাতে বেশি আলগা না হয়ে যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা: ভাল ফলন পেতে হলে পেঁপেতে সময়মত সার প্রয়োগ করতে হবে। উপরি হিসাবে গাছ প্রতি ৪৫০-৫০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৪৫০-৫০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের এক ম্স পর হতে প্রতি মাসে গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছে ফুল আসার পর এই মাত্রা দ্বিগুণ করতে হবে। গাছের গোড়ার চারপাশের মাটি হালকা করে কুপিয়ে সার ছিটিয়ে দিতে হবে। পেঁপে গাছে প্রায়ই বোরণ সারের ঘাটতি দেখা যেতে পারে। বোরণ ঘাটতিজনিত লক্ষণ দেখা দিলে বোরণ সার মাটিতে দিতে হবে বা বোরিক পাউড্র পানিতে গুরে পাতা ও ফলে স্প্রে করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা আবশ্যক।

অতিরিক্ত গাছ অপসারণ: চারা লাগানোর ৩-৪ মাস পর গাছে ফুল আসলে প্রতি গর্তে একটি করে সুস্থ্ সবল স্ত্রী গাছ রেখে বাকিগুলো তুলে/কেটে ফেলতে হবে। তবে সুষ্ঠু পরাগায়ন ও ফল ধারণের জন্য বাগানের বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে শতকরা ৫টি পুরুষ গাছ থাকা অপরিহার্য।

ফল পাতলকরণ: পেঁপের অধিকাংশ জাতের ক্ষেত্রে একটি পত্রকক্ষ থেকে একাধিক ফুল আসে এবং ফল ধরে। ফল কিছুটা বড় হওয়ার পর প্রতি পত্রকক্ষে সবচেয়ে ভাল ফলটি রেখে বাকিগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে। দ্বিতয়ি বা তার পরবর্তী বছরে যে পেঁপে হয় সেগুলো খুব ঠাসাঠাসি অবস্থায় থাকে। ফল ঠিকমত বাড়তি পারে না এবং এদের আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে ছোট ফলগুলো ছাঁটাই করতে হবে। এতে ফলের আকার বড় হয় এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

২০১৪

রোগবালাই:

১) পেঁপের গোড়া ও কান্ড পচা রোগ (Foot and stem rot): গোড়া ও কান্ড পচা পেঁপের একটি প্রধান ক্ষতিকর রোগ। ছত্রাক জীবানু দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়।

ক্ষতি লক্ষণ: এ রোগে চারা ও বয়স্ক উভয় গাছই আক্রান্ত হয়। এ রোগে পেঁপে গাছ আক্রান্ত হলে কান্ডে প্রথমে ভেজা জলবসা দাগ পড়ে। দাগ ধীরে ধীরে বড় হয় ও মাটি সংলগ্ন কান্ডকে ঘিরে ফেলে। আক্রান্ত গাছের পাতা হলদে ভাব ধরে ও অকালে ঝরে পড়ে। ফলও কুঁচকে যায় এবং ঝরে পড়ে। চরম অবস্থায় আক্রান্ত স্থান পচে যায় ও সেখান থেকে পেঁপে গাছ ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে যায়। আক্রান্ত স্থানে আঁশ বেরিয়ে পড়ে এবং শেষে আক্রান্ত গাছ মারা যায়।

চিত্র: পেঁপের গোড়া পচা ও কান্ড পচা রোগাক্রান্ত মাঠ

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- বপন করার আগে ছত্রাকনাশক (ব্যাভিস্টিন) দ্বারা বীজ শোধন করে নিতে হবে।
- অল্প আক্রান্ত গাছের গোড়ায় কান্ডের চারিদিকে ১% বোর্দোমিকচার লাগিয়ে (১০ গ্রাম চুন ও ১০ গ্রাম তুঁতে প্রতি লিটার পানিতে গুলে) অথবা প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রিডোমিল এম জেড-৭২ মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বাগানে আক্রান্ত গাছ দেখলে তা তক্ষুনি তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলার পর সে জায়গায় মাটিতে ফাইটোলন ছত্রাকনাশক বা ফরমালিন পানিতে গুলে স্প্রে করতে হবে।
- বাগানে গাছের গোড়ায় রিং পদ্ধতিতে পানি সেচ দিতে পারলে এই রোগ কম হবে।
- পেঁপে চারা রোপণের সময় মাদার মাটিতে চারার চারপাশে ঘুরিয়ে জৈব সারের সাথে গাছ প্রতি ১৫ গ্রাম ট্রাইকোডারমা (*Trichoderma virid*) মিশিয়ে প্রয়োগ করতে পারলে তা এ রোগ প্রতিরোধে যথেষ্ট কাজ দেয়।

২) পেঁপের মোজাইক ভাইরাস রোগ: ভাইরাস ঘটিত জীবাণু দ্বারা এরোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণ: এই রোগের আক্রমণে পাতা কুঁকড়ে যায়। পাতায় সাদা হলদেটে দাগ দেখা যায়। ক্লোরোপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে পাতায় ছিট ছিট হলুদ মোজাইক দাগ পড়ে এবং গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। গাছের ফল ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

প্রতিকার: রোগের আক্রমণ দেখা দেওয়া মাত্র গাছ ধ্বংস করতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি ডায়াজিনন ৫০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করলে ভাইরাস বাহক কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে এ রোগ নিংন্ত্রণ করা যায়।

৩.৫.৫ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফল সংগ্রহ: রোপণের ৬-৭ মাস পরেই কাঁচা পেঁপে ও পেপাইন সংগ্রহ করা যায়। তবে স্বাভাবিকভাবে ১০-১২ মাস পর পুরোমাত্রায় পরিণত ফল পাওয়া যায়। এ সময় পেঁপের কস জলীয় ভাব ধারণ করে এবং পেঁপের গায়ে নখ দিয়ে চাপ দিলে কষ বের হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জমে যায়। তাছাড়াও ফলের রং ঘন সবুজ থেকে হালকা সবুজাভ হলুদ হতে থাকে। গাছে কখনো পেঁপে পুরোপুরি পাকতে দেওয়া ঠিক নয়। পরিপুষ্ট পেঁপে একটি একটি করে সময়মত জালতির সাহায্যে সংগ্রহ করা উচিত।

ফলন: রোপণের ২-৩ বছর পর্যন্ত ভালো ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীতে ফলন ও গুণগত মান হ্রাস পেতে থাকে। এ জন্য দুই থেকে তিন বছর পরই পেঁপে গাছ তুলে ফেলতে হয় ও নতুন বাগান করতে হয়। সাধারণত প্রতিটি গাছে ২৫-৭৫ টি পেঁপে ধরে। তবে এর কম বেশি হতে পারে। প্রতিবছর জাতভেদে ৩৭-৭৫ টন পেঁপে প্রতি হেক্টর জমিতে উৎপাদিত হয়ে থাকে।

সংরক্ষণ: হিমাগারে ৯-১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৮০-৮৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় পরিণত পেঁপেকে ১-২ সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যায়।

পাঠ সংক্ষেপ

১. ড্রাগন আমাদের দেশে প্রবর্তিত একটি নতুন বিদেশি ফল এবং গাছটি দ্রুত বর্ধনশীল ক্যাকটাস প্রজাতির বহুবর্ষী উদ্ভিদ।
২. সাধারণত তিন প্রজাতির ড্রাগন ফলের চাষ হয়ে থাকে।
৩. কাজুবাদাম সাধারণত উষ্ণ মন্ডলীয় ফল। কষ্ট সহিষ্ণু ও খরা প্রতিরোধী।
৪. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি ড্রাগন-১ নামে একটি জাত উদ্ভাবন করেছেন।
৫. দেশে ১৪০ হেক্টর জমিতে ড্রাগন ফলের আবাদ হয় এবং উৎপাদন ১১৪০ মেট্রিক টন (বিবিএস২০২১)।
৬. মেক্সিকো এবং দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা ড্রাগন ফলের উৎপত্তি স্থান।
৭. আকর্ষণীয় রং, গন্ধ ও উচ্চ পুষ্টিমানের জন্য স্ট্রবেরি অত্যন্ত জনপ্রিয়।
৮. কাজুবাদামের উৎপত্তিস্থল ব্রাজিল।
৯. পেঁপে একটি পুষ্টিকর ও ভেষজ গুণ সম্পন্ন ফল।
১০. আমাদের দেশে ৩.৪১ হাজার হেক্টর জমিতে পেঁপের আবাদ হয় এবং উৎপাদন ১২৫.৭৬ হাজার মেট্রিক টন (বিবিএস ২০২১)।
১১. রেড লেডি পেপের জাতটি প্রায় সারা বছর ফল ধরে।
১২. তরমুজ পরিপক্ক হলে ফলের বোঁটার সঙ্গে যে আকর্শি থাকে তা শুকিয়ে বাদামি রং হয়।
১৩. রোপণের ৬-৭ মাস পরেই কাঁচা পেঁপে ও পেপাইন সংগ্রহ করা যায়।

১৪. ক্লেফট গ্রাফটিং পদ্ধতিতে কাজুবাদামের কলম তৈরি করা হয়।
১৫. কাজুবাদামের চাহিদা বাজারে অন্যান্য বাদামের থেকে অনেকাংশে বেশি।
১৬. রানার দ্বারাই স্ট্রবেরির বংশ বিস্তার করা উত্তম।
১৭. সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে ড্রাগনের কাটিং করার উপযুক্ত সময়।
১৮. হিমাগারে ৯-১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৮০-৮৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় পরিণত পেঁপেকে ১-২ সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যায়।

এসো নিজে করি

ইতিমধ্যে তোমরা উষ্ণমুলের ফলের চাষ সম্পর্কে জেনেছ। নিচের ফল সমুহের একটি করে ক্ষতিকর পোকা ও রোগের নাম লিখ।

ক্র/নং	গাছের নাম	একটি ক্ষতিকর পোকার নাম	একটি ক্ষতিকর রোগের নাম
১	ড্রাগন		
২	স্ট্রবেরি		
৩	তরমুজ		
৪	কাজুবাদাম		
৫	পেঁপে		

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

ইতেমধ্যে তুমি পেঁপে গাছে কিভাবে ফল পাতলাকরণ করা হয় সেসম্পর্কে জেনেছো। তুমি তোমার পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন করে সেখানে কৃষকরা পেঁপে গাছের ফল পাতলাকরণ করে এমন একজন কৃষকের সাথে আলাপ করে তিনি কিভাবে পেঁপে গাছের ফল পাতলাকরণ করছে তা পর্যবেক্ষণ করে তোমার পরামর্শ প্রদান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ড্রাগনের একটি জাতের নাম।
২. ড্রাগন ফুল কখন ফোটে?
৩. "রেড লেডি" কিসের জাত?
৪. কাজুবাদামের একটি জাতের নাম লিখ।
৫. কোন কোন জেলায় পেঁপে চাষ ভালো হয়?

২০২৪

৬. কোন রোগের জন্য ড্রাগন ফল উপকারী?
৭. পেঁপের ভাইরাস ঘটিত রোগের নাম লিখ।
৮. রানার কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কাজুবাদাম কোন পরিবেশে ভাল হয়?
২. তরমুজের পরিপক্কতার লক্ষণ কি?
৩. স্ট্রবেরি গাছে কেন মালচিং প্রয়োজন হয়?
৪. আগাম তরমুজের চাষে বীজ কিভাবে দ্রুত গজানো যাবে?
৫. স্ট্রবেরির অতিরিক্ত রানার কেন ছাঁটাই করতে হয়?
৬. অতিরিক্ত পেঁপে কেন ছাঁটাই করতে হয়?

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. স্ট্রবেরিতে সার দেওয়ার পদ্ধতি সমুহ বর্ণনা কর।
২. পেঁপের রোগ দমন পদ্ধতি আলোচনা কর।
৩. তরমুজের গর্ত তৈরী, গর্তে সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ পদ্ধতি লিখ।

জব ৩.১: ফলের রোগ শনাক্তকরণ ও প্রতিকার করার দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- ফলের বিভিন্ন রোগের আক্রান্ত নমুনা দেখে রোগ শনাক্ত করতে পারবে।
- রোগের লক্ষণ দেখে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু শনাক্ত করতে পারবে।
- রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু শনাক্ত করতে রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১ . প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২ . জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩ . যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪ . কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫ . অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৬ . কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাবস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

ড্রাগনফল, স্ট্রবেরিফল, তরমুজ, কাজুবাদাম ও পেঁপের প্রভৃতি ফলের গুরুত্বপূর্ণ রোগ সনাক্ত ও রোগের লক্ষণ প্রদর্শন:

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

রোগ জীবাণু উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে সেখানে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে। পোষকের দেহের কোষ নষ্ট করে। খাদ্যরস গ্রহণ করে। উদ্ভিদের দৈনন্দিন কাজে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। এ অস্বাভাবিকতার বাহ্যিক প্রকাশকে আমরা রোগের লক্ষণ (Symptom) বলি। এটা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। যেমন পাতা পঁচা, পাতার দাগ, কান্ডের দাগ, কান্ড পঁচা,ঢলে পড়া ইত্যাদি। আবার কোন কোন সময় রোগের এই বাহ্যিক লক্ষণের মধ্রে রোজীবাণু উপস্থিত থাকে। যেমন একটি পাতার দাগের মধ্যে রোগজীবাণুর মাইসেলিয়াম খালি চোখে দেখা যায়। লক্ষনের মধ্যে রোগজীবাণুর আংশিক উপস্থিতিকে চিহ্ন বা সাইন বলে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ সমুহ

১। রোগাক্রান্ত গাছের পাতা, ডাল, ফুল, ফল, বা মূল।

২। কাগজ, পেনসিল, রাবার।

৩। ড্রাগনফল, স্ট্রবেরিফল, তরমুজ, কাজুবাদাম ও পেঁপের প্রধান প্রধান রোগের নমুনা।

কাজের ধাপ

১। সংগৃহীত নমুনা (রোগাক্রান্ত, পাতা, ফুল, ফল, বাকল, ও মূল) টেবিলে নিয়ে আসতে হবে।

২। নমুনাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৩। নমুনার কোন অংশে রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তা খাতায় লিখে রাখতে হবে।

৪। আক্রান্ত অংশের রঙ, আকার, আয়তন ইত্যাদি লিখে রাখতে হবে।

৫। আক্রান্ত অংশে দাগ পড়লে দাগের সংখ্যা নিরুপণ করতে হবে।

৬। লিখিত লক্ষণের সাথে প্রকাশিত বইয়ের লক্ষণের সামঞ্জস্যতা মিলিয়ে দেখতে হবে।

৭। রঙিন স্লাইড প্রদর্শিত হলে, স্লাইডগুলো করে দেখে, আক্রান্ত অংশের রঙের পরিবর্তন লক্ষ করতে হবে।

৮। পুক, ছবি হারবেরিয়াম শিট ও কাচের আধারে রক্ষিত নমুনার বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে রোগকে নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। রোগাক্রান্ত পাতা ডাল, ফল বা মূল সংগ্রহের সময় রোগ না পোকার আক্রমণ বা অন্য কোন কারণ তা দেখে নিতে হবে।

২। রোগাক্রান্ত নমুনাটি সংগ্রহের পরপরই পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শুকিয়ে গেলে অনেক লক্ষণ চেনা নাও যেতে পারে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি ফলের সুনির্দিষ্ট রোগ শনাক্তকরণ করার মাধ্যমে ফলের রোগরে সঠিক প্রতিকার করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ৩.২: ফলের ক্ষতিকর পোকা সংগ্রহ ও হার্বারিয়াম তৈরিকরণ করার দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- ফলের বিভিন্ন পোকার আক্রান্ত নমুনা দেখে পোকা শনাক্ত করতে পারবে।
- ক্ষতিকর পোকা শনাক্ত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে পারবে।
- আক্রান্ত ফসলে সঠিকমাত্রার বালাইনাশক প্রয়োগ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩. যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ জোড়া

ড্রাগনফল, স্ট্রবেরিফল, তরমুজ, কাজুবাদাম ও পেঁপের প্রভৃতি ফলের গুরুত্বপূর্ণ রোগ সনাক্ত ও রোগের লক্ষণ প্রদর্শন:

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় সনাক্তকরণের একটি সহজ উপায় হলো নমুনা স্থাপন কাগজের বা হার্বেরিয়াম শিটের অ্যালবাম তৈরি করা। এত সংগৃহীত ক্ষতিকর পোকর শুষ্ক নমুনা থাকে এবং তার পাশে নামসহ সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য লেখা থাকে। এতে ব্যবহারিক শ্রেণি কক্ষের শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য সংরক্ষিত নমুনা অত্যন্ত কাজে লাগে। শিক্ষার্থীরা ফসলের ক্ষতিকর প্রধান প্রধান পোকার নাম জানা, চেনা, ও সনাক্তকরণের কাজ অতি অল্প সময়ে সহজে করতে পারে।

হার্বেরিয়াম শিটের একটি অ্যালবাম তৈরির একটি নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

পোকার নমুনা নং	পোকার নাম (বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র সহ)	আক্রান্ত ফসল	ক্ষতির প্রকৃতি ও ধরণ	অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ

১। পোকার নমুনা ২। বোর্ড কাগজযুক্ত বড় খাতা ৩। কলম ৪। কসটেপ ৫। বড় পুরাতন খবরের কাগজ বা চোষ কাগজ ৬। পোকা ধরা হাতজাল ৭। কিলিং জার ৮। পেট্রিডিস ৯। ফরসেপ বা চিমটা ১০। ক্লোরফম ভেজা তুলা ১১। স্কেল ১২। ফসলের ক্ষেত বা বাগান ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১। ফসলের ক্ষেত বা বাগান থেকে হাত জাল বা অন্য কোন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোকা ধরে সংগ্রহ করতে হবে।

২। সংগৃহীত পোকা কিলিং জারে রেখে মেরে ফেলতে হবে।

৩। কিলিং জার হতে মৃত পোকা বের করে পেট্রিডিসে নিতে হবে।

৪। পেট্রিডিস হতে সংগৃহীত পোকাগুলো একে একে পুরাতন খবরের কাগজ বা বড় বই-এর ভাজে রেখে শুকাতে হবে।

৫। কয়েকদিন পর সংগৃহীত পোকাগুলো বের করে নিতে হবে।

৬। প্রাসঙ্গিক তথ্য সারণি অনুযায়ী খাতায় ছক কেটে শিরোনামগুলো লেখে নিতে হবে।

৭। পোকার নমুনার শিরোনামের নিচে এক এক করে একাধিক পোকা স্কচটেপ দিয়ে লাগাতে হবে।

৮। শিরোনাম অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি পোকার সামনের ঘরগুলো লিখতে হবে।

৯। এভাবে প্রতি পৃষ্টায় একাধিক ক্ষতিকর পোকার নমুনা লাগিয়ে হার্বেরিয়াম বা অ্যালবাম তৈরি করতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। একটি পোকার নমুনার উপর আর একটি পোকার নমুনা লাগানো যাবে না।

২। পোকা চাপ খেয়ে ভালোভাবে শুকানোর পর লাগাতে হবে।

৩। উন্নত মানের হার্বেরিয়াম বা অ্যালবাম সিট ও কচ টেপ ব্যবহার করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি ফলের ক্ষতিকর পোকা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ৩.৩: বালাইনাশক প্রয়োগে যন্ত্র বা স্প্রে - মেশিন ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- বালাইনাশক ব্যবহারে স্প্রে মেশিন যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবে।
- ক্ষতিকর পোকা সঠিক পদ্ধতিতে দমন করতে পারবে।
- আক্রান্ত ফসলে সঠিকমাত্রার বালাইনাশক প্রয়োগ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩. যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

১) যে ফসলের ক্ষেতে কীটনশক ব্যবহার করতে হবে সে ফসল অনুযায়ী স্প্রেমেশিন নির্বাচন করতে হবে। যেমন মাঠ ফসলের জন্য হ্যান্ড স্প্রেয়ার, শক্তি চালিত ন্যাপসেক স্প্রেয়ার, ব্লোয়ার এবং বৃক্ষজাতীয় ফসল বা ফলবাগানের জন্য ফুট পাম্প ইত্যাদি।

২। আক্রমণকারী পোকার ধরণ ও ফসলের ক্ষেতের আকার ও ফসলের প্রকৃতি অনুযায়ী স্প্রেমেশিন নির্বাচন করতে হবে। ছোট বাগান হলে ফুট পাম্প (Foot pump), বড় বাগান হলে ব্লোয়ার ফুট পাম্প ইত্যাদি।

৩। কীটনাশকের গঠনের উপর ভিত্তি করেও স্প্রেমেশিন নির্বাচন করতে হবে। যেমন: পাউডার জাতীয় কীটনাশকের জন্য ডাষ্টার এবং তরল কীটনাশকের জন্য হ্যান্ড স্প্রেয়ার, পাওয়ার স্প্রেয়ার, ব্লোয়ার ফুট পাম্প ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ

১। হ্যান্ড স্প্রেয়ার/ পাওয়ার স্প্রেয়ার/ফুট পাম্প।

২। কীটনাশক

৩। নাড়ন কাঠি

৪। কীটনাশক প্রতিরোধক পোষাক

৫। ফসলের ক্ষেত (শস্য মাঠফল/ বাগান)

৬। সাদা কাগজ, পেনসিল, রাবার ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১। ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত স্প্রে–মেশিনটি ব্যবহারের উপযোগী আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয় পরীক্ষা করা প্রযোজন হবে।

ক) পাম্প করলে যন্ত্রে বাতাস আটকে থাকে কিনা

খ) নজল দিয়ে পানি সঠিকভাবে নির্গমন হয় কিনা

২। এখন ব্যবহার উপযোগী স্প্রেমেশিনটির চারভাগের একভাগ পরিষ্কার পানি ভর্তি করতে হবে।

৩। তারপর স্প্রেমেশিনে একবারে যতটুকু নির্বাচিত কীটনাশক প্রয়োজন তার চারভাগের একভাগ সেপ্রমেশিনের পানির মধ্যে ঢালতে হবে এবং নাড়ন কাঠি দ্বারা ভালোভারে নেড়েচেড়ে মিশাতে হবে।

৪। এরপর আবার চার ভাগের একভাগ পানি ও পূর্বের সমপরিমাণ কীটনাশক মেশিনে ঢালতে হবে এবং নাড়ন কাঠি দ্বারা নাড়াচাড়া করে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

৫। এবার মেশিনের নির্ধারিত দাগ পর্যন্ত সর্বশেষ পানিটুকু ও কীটনাশকটুকু ঢালতে হবে এবং নাড়ন কাঠি দ্বারা ভালোভাবে মিশাতে হবে।

৬। অতপর কীটনাশক ঢালার পথ অর্থাৎ মেশিনের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে।

৭। এখন হাতলের সাহায্যে পিস্টনের উঠানামা করিয়ে প্রয়োজন মাফিক পাম্প করতে হবে/ফুট পাম্পের ক্ষেত্রে পায়ের সাহায্যে চাপ দিয়ে পাম্প করতে হবে।

৮। এবার কীটনাশক প্রতিরোধক পোষাক পরিধান করতে হবে এবং স্প্রে–মেশিনটি কাঁধে তুলে নিতে হবে।

৯। যে জমিতে কীটনাশক ছিটাতে হবে সে জমির একপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ঘাসের টুকরো, পাতা উড়িয়ে বা ধুয়ার সাহায্যে বায়ু প্রবাহের দিক জেনে নিতে হবে।

১০।এখন স্প্রে মেশিনের ট্রিগারে চাপ দিয়ে বাতাসের অনুকূল সমগতিতে এগিয়ে যেতে হবে এবং স্প্রে করতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে যাতে কীটনাশক গায়ে না পড়ে।

১১। এভাবে জমি বা বাগানের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে পৌছানোর পর প্রথম বার স্প্রে কৃত স্থান বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাস মোতাবেক দূরত্ব নিয়ে আবার জমির পূর্বের প্রান্তের দিকে ফিরে আসতে হবে। এভাবে জমির স্প্রে শেষ করতে হবে। স্প্রেমেশিনের মিশ্রণ শেষ হয়ে গেলে পূর্বের ন্যায় পুনরায় মিশ্রণ তৈরি করে মেশিন ভরে নিতে হবে এবং পূর্বের পদ্ধতিতে জমিতে স্প্রে করা শেষ করতে হবে।

১২। পাতার আক্রমণকারী পোকার জন্য গাছের উপর এবং কান্ড বা নিচের দিকে আক্রমণকারী পোকার জন্য পাতার নিচে স্প্রে করতে হবে।

১৩। ফলের বাগানে উচ্চ বৃক্ষের ক্ষেত্রে ফুট পাম্প ব্যবহার করার সময় প্রয়োজনীয় কীটনাশক ও পানি অনুমোদিত মাত্রায় পৃথক কন্টেইনারে বা বালতিতে মিশিয়ে নিতে হবে এবংস্প্রে মেশিনের সাকশন পাইপের নিম্ন প্রান্ত কন্টেইনারে বা বালতির ভিতর মিশ্রিত কীটনাশককে ডুবিয়ে স্প্রে করার কাজ শেষ করতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। স্প্রে মেশিন ব্যবহারের কলাকৌশল অনুশীলন কালে কোনরুপ ধূমপান করা যাবে না বা অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না।

২। কলাকৌশল অনুশীলনের পর হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

৩। স্প্রে কার্যক্রম শেষে পরিধেয় সকল কাপড় এবং স্প্রে মেশিন ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতেহবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি সঠিকভাবে কীটনাশক ব্যবহারে স্প্রে মেশিন ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়
ফল ও শাকসবজি বিপণন
(Fruits and vegetable marketing)

সাধারণ লোকজন বিপণন কার্য বলতে শুধুমাত্র ক্রয় ও বিক্রয়কেই বুঝে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিপণন কার্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত। বিপণন কার্যাবলীতে সাধারণত ফল ও শাকসবজি সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিসমূহ যেমনঃ ফল ও শাকসবজি বাছাইকরণ, পণ্য ঠান্ডাকরণ, গ্রেডিং অথবা শ্রেণিকরণ, পরিষ্কারকরণ, প্যাকেজিং, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণ ধাপগুলো জড়িত। অর্থাৎ উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে পণ্য ও সেবার আদান-প্রদানে যেসব কার্যাবলি জড়িত থাকে সেগুলো বিপণন কার্যের আওতায় পড়ে। একটি বিপণন কার্য উৎপাদক নিজে কিংবা ব্যবসায়ী (পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী, আড়তদার) বা ভোক্তারা সম্পাদন করতে পারে।

এই অধ্যায় শেষে-

১। বাজারজাতকরণের জন্য ফল ও শাকসবজি সঠিকভাবে বাছাই করতে পারবে ।

২। বাজারজাতকরণের জন্য ফল ও শাকসবজি ঠান্ডাকরণের মাধ্যমে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সঠিকভাবে ফল ও শাকসবজির গ্রেডিং করতে পারবে ।

৩। বাজারজাতকরণের জন্য ফল ও শাকসবজি পরিষ্কারকরণের মাধ্যমে সঠিকভাবে প্যাকেজিং করতে পারবে।

৪। বাজারজাতকরণের পূর্বে কিভাবে ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণ করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।

৫। বাজারের দূরুত্ব অনুযায়ী ফল ও শাকসবজি বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহণ নির্বাচন করতে পারবে।

৪.১ ফল ও শাকসবজি সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি

বাজারজাত করার পূর্ব পর্যন্ত ফল ও শাকসবজি নাড়াচাড়াসহ কিছু ব্যবস্থাপনা এবং কৌশলাদি যার মাধ্যমে ফল ও শাকসবজির গুণগতমান রক্ষা করা সম্ভব হয়।

৪.২ ফল ও শাকসবজি সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা

১। তাজা পণ্যের গুণগতমান বজায় রাখা

২। তাদের সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো

৩। তুলনামূলক অপচয় কমানো

৪। ভোক্তার নিকট আকর্ষণীয়ভাবে পণ্য উপস্থাপন করা

৫। খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষা করা।

৪.৩ ফল ও শাকসবজি সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তির ধাপসমূহ

ফল ও শাকসবজি বিপণনের জন্য উত্তমভাবে সংগ্রহোত্তর কার্যাদি সম্পাদনের অনেকগুলো ধাপ রয়েছে যা সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করা প্রয়োজন। ধাপগুলো হলঃ

১। ফল ও সবজি সর্টিং অথবা বাছাইকরণ

২। পণ্য ঠান্ডাকরণ

৩। গ্রেডিং অথবা শ্রেণিকরণ

৪। পরিষ্কারকরণ

৫। প্যাকেজিং

৬। পরিবহন ও বাজারজাতকরণ

৭। সংরক্ষণ

৪.৪ প্যাকহাউস স্থাপন

বাণিজ্যিকভাবে উত্তম কৃষি পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হলে মাঠের পাশে একটি প্যাকহাউস স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। ফল ও সবজির সব ধরনের সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি প্যাকহাউস এর গুরুত্ব অপিরিসীম।

একটি প্যাকহাউসের অবস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে-

১। যতদূর সম্ভব এটি যাতে কৃষি খামারের কাছাকাছি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২। পণ্য এবং পণ্যের প্যাকেটগুলো পরিবহনে উঠানো ও নামানোর সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে।

৩। বাজার এবং পরিবহন টার্মিনালে যাতে সহজেই প্রবেশ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

চিত্রঃ প্যাক হাউজ

মূলত একটি সাধারণ প্যাকহাউসে সংগ্রহোত্তর যে সকল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তা হলো-

১. ফল ও সবজি/পণ্য গ্রহণ।

২০২৪

২. সর্টিং অথবা বাছাইকরণ

৩. পণ্য ঠান্ডাকরণ

৪. গ্রেডিং অথবা শ্রেণিকরণ

৫. পরিষ্কারকরণ

৬. প্যাকেজিং

৭. পরিবহন ও বাজারজাতকরণ

৮. সংরক্ষণ

১। সবজি বা পণ্য গ্রহণ

প্যাকহাউসে সবজি আসার পর জাত এবং উৎপাদনের স্থানসহ ওজন নথিবদ্ধ করা হয়। সবজি বাজারজাতকরণের জন্য বিশেষ করে উন্নত বাজারে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নথি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২। সর্টিং অথবা বাছাইকরণ

সংগ্রহের পর অতিরিক্ত পাকা, কাটা ও ফাটা, ত্রুটিপূর্ণ বা অন্যভাবে আঘাতপ্রাপ্ত, পরিপক্ক ও অপরিপক্ক ফসল বাছাই করে নিতে হয়। নতুবা সঠিক বাজার মুল্য পাওয়া যায় না। সর্টিং কার্যক্রমের মাধ্যমে পণ্যে ৪০-৬০% মুল্য সংযোজন করা সম্ভব। সর্টিং এর মাধ্যমে নিম্নলিখিতভাবে সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানো যায়-

ক) রোগের সংক্রমণ হতে সুস্থ পণ্যকে পৃথক রাখা সম্ভব।

খ) ক্ষতযুক্ত ও পাকা ফলের সহিত ভালো ফল/সবিজ রাখলে উৎপাদিত ইথিলিনের দ্বারা ভালো সবজিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে সর্টিং এর মাধ্যমে পণ্যের ক্ষতের পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়।

চিত্রঃ প্যাক হাউজে ফল সর্টিং

৩. পণ্য ঠান্ডাকরণ

প্যাকহাউসে সবজি সর্টিং করার পরের কাজ হচ্ছে সবজি ঠান্ডাকরণ। স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পানিতে বরফ কুচি মিশিয়ে তারপর এতে সবজি রাখলে সবজির তাপমাত্রা লক্ষণীয়ভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। এভাবে ঠান্ডা করলে সবজির তাপমাত্রা প্রায় ১৩-১৭ সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত নামিয়ে আনা যায়। ঠান্ডাকরণের মাধ্যমে শ্বসনের হার কমিয়ে আনা যায় এবং ফল ও সবজির জীবনকাল বেড়ে যায়।

৪। গ্রেডিং অথবা শ্রেণিকরণ

গ্রেডিং স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে পণ্য বাণিজ্যের বিশ্বজনীন প্রতীক। গ্রেডের মান অনুযায়ী বাজারে পণ্যেও চাহিদা নির্ধারিত হয় এবং সেই অনুযায়ী প্যাকহাউসের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সর্টিংকৃত পণ্যসমূহ নির্দিষ্ট আকার, ওজন ও পরিপক্বতার ওপর ভিত্তি করে গ্রেডিং বা শ্রেণিকরণ করা হয়। সর্টিং এর পরে বা প্যাকেজিং এর ঠিক পূর্বে গ্রেডিং করা প্রয়োজন।

চিত্রঃ ফলের গ্রেডিং

৫। পরিষ্কারকরণ

বাজারে উচ্চ মূল্য পাওয়ার জন্য ফল ও সবজি বা পণ্য পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার করার মাধ্যমে ফল ও সবজিতে জীবাণুর সংক্রমণ, শারীরিক ক্ষত এবং পরিবহন খরচ হ্রাস করা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে সবজি বা পণ্য পরিষ্কার করতে হবে:

১। বেগুন ও টমেটোর বোঁটা, সরিষা পাতার মূল, ফুলকপি ও বাঁধাকপির পাতা ও বাড়তি শিকড় ছাঁটাই করতে হবে।

২। বাঁধাকপির ক্ষেত্রে ৩-৪টি মোড়ানো পাতা রাখতে হবে।

৩। পরিষ্কার নরম কাপড় দিয়ে টমেটো, বেগুন বা শসা মুছে নিতে হবে।

৪। পরিষ্কার পানি দিয়ে ফল ও সবজির সাথে লেগে থাকা মাটি ও অন্যান্য আবর্জনা ধৌত করতে হবে।

৫। পণ্য যেন কোনোভাবেই সরাসরি মাটির সংস্পর্শে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ মাটি হলো বিভিন্ন জীবাণুর অন্যতম উৎস, যার সংস্পর্শে রোগের সৃষ্টি হয়।

চিত্রঃ ফল পরিস্কারকরন যন্ত্র

৬। প্যাকেজিং অথবা পণ্যের মোড়কীকরণ

প্যাকহাউসের প্রধান কাজ হলো পণ্যকে প্যাকেজিং করা। যা সতেজ পণ্যকে ক্ষত হওয়া ও বাহিরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। দুর্বল ও অনুপোযুক্ত প্যাকেজিং ব্যবস্থার কারণে পণ্য গন্তব্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে পরিবহন ও হ্যান্ডলিং এর সময় সবচেয়ে বেশি সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হয়। বাজারে বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজিং দ্রব্য বা কন্টেইনার পাওয়া যায়। সবজির প্রকৃতি, বাজারে দূরত্ব, যানবাহনের ধরন এবং রাস্তার অবস্থার উপর নির্ভর করে মোড়কের সামগ্রী কেমন হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। সতেজ সবিজ বা ফল পরিবহনের ক্ষেত্রে প্যাকেজিং এর জন্য কাঠের বাক্স বা প্লাস্টিক ক্রেটস-ই অধিকতর উপযোগী। তবে এই পাত্রসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাইনার হিসেবে মুদ্রণবিহীন নিউস পেপার, পরিষ্কার কলার পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

চিত্রঃ প্যাকেজিং অথবা পণ্যের মোড়কীকরণ

৪.৫ ফল ও সবজির উত্তম প্যাকেজিং-এর জন্য আবশ্যিক কার্যক্রম

১। সবজি প্যাকেজিং এর জন্য পরিষ্কার পাত্র ব্যবহার করতে হবে।

২। যদি যান্ত্রিকভাবে সবজির প্যাকেট হ্যান্ডলিং এর ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে একক প্যাকেটের ওজন ২৫ কেজির নিচে হতে হবে, যাতে করে একজন শ্রমিক একাই একটি প্যাকেট সহজে তুলতে বা নামাতে পারে।

৩। পাত্রের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী সবজি ভরতে হবে। কারণ ধারণক্ষমতার বেশি হলে সবজিতে চাপজনিত ক্ষত সৃষ্টি হবে। আবার পরিমাণ কম হলে কম্পনজনিত (ভাইব্রেশন) ক্ষত সৃষ্টি হবে।

৪। একটি পাত্রে কেবলমাত্র একই ধরনের পরিপক্বতা বিশিষ্ট সবজি বা পণ্য রাখতে হবে।

৫। প্যাকেজিং পাত্রে সবজিকে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে নড়াচড়া করতে না পারে।

৬। সবজিকে ভরার সময় পাত্রকে মৃদুভাবে নড়াচড়া করতে হবে যাতে করে পাত্রের ভেতরের ফাঁকা স্থান সবজি দ্বারা পূর্ণ হয়।

৭। প্যাকেজিং এর পর পাত্রকে সঠিকভাবে বেঁধে দিতে হবে।

৮। অতঃপর প্যাকেটকৃত সজি বাজারজাতকরণের পূর্বে শীতল স্থানে রাখতে হবে।

৪.৬ পরিবহন

পরিবহন বাজারজাতকরণের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজের মাধ্যমে পণ্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। যে কাজের মাধ্যমে উৎপাদকের নিকট হতে ক্রেতার নিকট পণ্য পৌছে দিয়ে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তাকে পরিবহন বলে। অর্থাৎ পরিবহন হলো পণ্য উৎপাদনের স্থান হতে ক্রয়ের বা ব্যবহারের স্থানে স্থানান্তর করা এবং এভাবে পণ্যের সময়মতো ও স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

পরিবহন দুভাবে পণ্য বণ্টন প্রণালিতে সাহায্য করে। যাদের একটি হলো উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল শিল্পে পৌছে দিয়ে এবং অন্যটি হলো শিল্প উৎপাদিত পণ্য ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট পৌছে দিয়ে। পরিবহন ব্যবস্থা পণ্য মূল্যের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পণ্য পরিবহন যত দ্রুত ও সহজ হবে, পণ্যের মূল্যও তত হ্রাস পাবে। ফলে ক্রেতারা স্বল্প মূল্যে তাদের কাংখিত পণ্যটি ক্রয় করতে পারবে। পণ্যসামগ্রী যে স্থানে উৎপাদিত হয়, সে স্থানে ভোগ হবে এমন নয়। উৎপাদনের স্থান হতে ভোগ স্থানের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে পরিবহন উৎপাদক এবং ভোক্তার নিকট পৌছিয়ে দেয় ফলে তাদের মধ্যে যে স্থানগত বাধা থাকে, তা দুর হয়। ক্রেতাদের মাঝে যথোপোযুক্ত সময়ে সরবরাহ করার জন্য পণ্য উৎপাদন করা হয়। বিপণনকারীর মূল লক্ষ্য থাকে ক্রেতাদের হাতের নাগালে পণ্য নিরাপদে সরবরাহ করা। পরিবহনের মাধ্যমে উৎপাদকের নিকট হতে বিভিন্ন হাত ঘুরে পণ্যটি চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট সরবরাহ করা হয়। ফলে বিপণনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

চিত্রঃ কোলিং ভ্যান

ভোক্তার সন্তুষ্টি বিপণনকারীর মূল উদ্দেশ্য। পণ্য হতে ক্রেতাদের প্রত্যাশা পূরণ হলে ভোক্তারা সন্তুষ্ট হয়। তবে ক্রেতারা শুধুমাত্র পণ্যের গুণগত মান, আকার, পরিমাণ ইত্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না। তারা পণ্যটি হাতের নাগালে পাওয়ারও প্রত্যাশা করে। ক্রেতাদের এরূপ প্রত্যাশা পূরণ কেবলমাত্র পরিবহনের দ্বারাই সম্ভব।

পণ্য বিভিন্ন পথে পরিবাহিত হয়। এগুলো হলো স্থলপথ (সড়ক ও রেল পরিবহন), আকাশ পথ (বিমান পরিবহন) এবং জল পথ (নৌপরিবহন ও সামুদ্রিক পরিবহন)।

পণ্য পরিবহনে অনুসরণীয়

১। পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত গাড়ির অবশ্যই লাইসেন্স থাকতে হবে এবং চালকেরও ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

২। যে সকল কর্মীরা মালামাল গাড়িতে উঠানো বা নামানোর কাজে অংশগ্রহণ করবে তাদের অবশ্যই জীবাণুমুক্ত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

৩। পরিবহনের সময় অবশ্যই সবজির ধরন, পরিমাণ, তারিখ, সবজি উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা এবং পরিবহন চালকের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং নিয়মিত এর রেকর্ড রাখতে হবে।

৪। সবজি পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিবহনকারী যান পরিবহনের পূর্বে এবং পরে নিয়মিত পাম্প এর পানির মাধ্যমে ভালোভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

৫। খোলা ভ্যানে পরিবহন করলে উপরে অবশ্যই ছাউনি থাকেত হবে। তা না হলে বৃষ্টির পানি, রোগ বালাই ও ধুলাবালি দ্বারা সবজির গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে।

৬। একই পরিবহনে সবজির সাথে অন্য কোনো দ্রবাদি যেমন- রাসায়নিক সার, কীটনাশক/বালাইনাশকের প্যাকেট ইত্যাদি যেন পরিবহন না করা হয় সে দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

৭। গাড়ি অতিরিক্ত বোঝাই দেওয়া যাবে না।

৮। প্যাকেজ সঠিকভাবে সারিবদ্ধভাবে করতে হবে।

৯। পরিবহনকালে অবাধ বাতাস চলাচলের সুবিধা থাকতে হবে যাতে বাইরের আলো-বাতাস পণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পায় এবং পণ্যের শ্বসনজনিত গ্যাস ইথাইলিন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি সহজেই বের হয়ে যেতে পারে।

১০। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত কাভার্ডভ্যানে ফল ও সবজি পরিবহন সর্বোত্তম পন্থা।

৪.৭ নির্বাচিত সবজির সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ফল ও সবজির গুণগত মান রক্ষা ও সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধে সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফল ও সবজি যেসব কারণে সংরক্ষণ করা হয় বা সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়, তা সাধারণত নিম্নরূপ

২০১৪

১। মাঠ থেকে সংগ্রহের পর বাজারজাতকরণের পূর্বে ও বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে;

২। খুচরা বাজারেও সরবরাহের আগে সাময়িক সংরক্ষণের জন্য;

৩। বৈদেশিক বাজারে রপ্তানির পূর্বে গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে:

৪। পচন থেকে রক্ষা করে প্রয়োজনমতো ভবিষ্যতে বা অমৌসুমে বিক্রি বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।

সংরক্ষণাগার এর পরিচর্যা

১। সংরক্ষণাগার অবশ্যই ময়লা ও রোগ জীবাণুমুক্ত, শুষ্ক এবং বাতাস চলাচলের সুবিধাযুক্ত ঠান্ডা জায়গা হতে হবে।

২। মেঝের ওপর ফসল রাখা যাবে না। ফল ও শাকসবিজ ক্রেটের মাধ্যমে মেঝে থেকে ১ ফুট উপরে তাকের মধ্যে সাজিয়ে স্টোর করতে হবে। এতে করে সংগ্রহোত্তর রোগ বালাই বা কীটপতঙ্গ থেকে ফসলকে অনেকাংশে রক্ষা করা যাবে।

৩। উত্তম গুণাগুণ সম্পন্ন পণ্য সংরক্ষণ করা;

৪। ক্ষতযুক্ত বা রোগজীবাণুযুক্ত পণ্যকে সংরক্ষণ না করা;

৫। সংরক্ষণের আগে পণ্যকে অবশ্যই প্রাক শীতলীকরণ করা;

৬। যে পাত্রে পণ্য সংরক্ষণ করা হবে সেই পাত্রটির মধ্য দিয়ে যাতে সহজে বায়ু চলাচল করতে পারে সে ব্যবস্থা রাখা;

৭। দুইটি সংরক্ষণ পাত্রের মধ্যে অবশ্যই কিছু ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে;

৮। যখন বিভিন্ন ধরনের পণ্য একসঙ্গে সংরক্ষণ করা হবে তখন লক্ষ্য রাখতে হবে যে পণ্যগুলো যেন একই ধরনের তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন হয়;

৯। নির্বাচিত ফল ও সবজি সংরক্ষণের উপযুক্ত তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা

পাঠ সংক্ষেপ:

১। বাণিজ্যিকভাবে উত্তম কৃষি পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হলে মাঠের পাশে ফল ও সবজির সব ধরনের সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি প্যাকহাউস স্থাপন অত্যন্ত জরুরি।

২। ফল ও সবজি সংগ্রহের পর অতিরিক্ত পাকা, কাটা ও ফাটা, ত্রুটিপূর্ণ বা অন্যভাবে আঘাতপ্রাপ্ত, পরিপক্ব ও অপরিপক্ব অংশ সর্টিং বা বাছাই করে নিতে হবে। সর্টিং বা বাছাই কার্যক্রমের মাধ্যমে পণ্যে ৪০-৬০% মূল্য সংযোজন করা সম্ভব।

৩। সর্টিংকৃত পণ্যসমূহ নির্দিষ্ট আকার, ওজন ও পরিপক্বতার ওপর ভিত্তি করে গ্রেডিং বা শ্রেণিকরণ করতে হবে। সর্টিং এর পরে বা প্যাকেজিং এর ঠিক পূর্বে গ্রেডিং করা প্রয়োজন।

৪। ফল ও সবজির প্রকৃতি, বাজারে দূরত্ব, যানবাহনের ধরন এবং রাস্তার অবস্থার উপর নির্ভর করে প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল কেমন হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। সতেজ সবিজ বা ফল পরিবহনের ক্ষেত্রে প্যাকেজিং এর জন্য কাঠের বাক্স বা প্লাস্টিক ক্রেটস-ই অধিকতর উপযোগী।

৫। ফল ও সবজি পরিবহনকালে অবাধ বাতাস চলাচলের সুবিধা থাকতে হবে যাতে বাইরের আলো-বাতাস পণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পায় এবং পণ্যের শ্বসনজনিত গ্যাস ইথাইলিন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি সহজেই বের হয়ে যেতে পারে।

এসো নিজে করি

ইতিমধ্যে তোমরা ফলও শাকসবজি বিপনন সম্পর্কে জেনেছ। নিচের গ্রুপ এ এবং বি হতে প্রয়োজনীয় শব্দগুলো বাছাই করে খালি ঘরে সঠিক উত্তর লিখ।

উত্তর	গ্রুপ - এ	গ্রুপ - বি
	১। সর্টিং	(ক) পণ্যসমূহ নির্দিষ্ট আকার, ওজন ও পরিপক্কতার ওপর ভিত্তি করে আলাদা করা হয়।
	২। গ্রেডিং	(খ) পণ্যকে ক্ষত হওয়া ও বাহিরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।
	৩। প্যাকেজিং	(গ) ফল ও সবজি পরিবহনের সর্বোত্তম পন্থা।
	৪।প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল	(ঘ) পণ্যের ৪০-৬০% মূল্য সংযোজন করা সম্ভব।
	৫। কোলিং কাভার্ডভ্যান	(ঙ) প্লাস্টিক ক্রেটস

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

তুমি ফল ও সবজি বিপনন সম্পর্কে জেনেছ। তুমি একটি বাণিজ্যিক প্যাক হাউজ পরিদর্শন করে,প্যাক হাউজ স্থাপন করতে প্রাথমিক ভাবে কি কি বিষয় সমুহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তার একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

২০১৪

প্রশ্নবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। প্যাক হাউজ কি?

২। প্যাক হাউজে ফল ও সবজি বিপণনের জন্য কি ধরনের কাজ করা হয়?

৩। ফল ও সবজি সর্টিং বা বাছাইকরন কি?

৪। ফল ও সবজি কেন গ্রেডিং করা হয়?

৫। প্যাকেজিং কি?

৬। বিপণনের জন্য ফল ও সবজি কি কি পথে পরিবাহিত হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ফল ও সবজি কেন সর্টিং করা হয়?

২। ফল ও সবজি বিপণনের জন্য পরিস্কারকরন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৩। সহজলভ্য কয়েকটি পেকেজিং মেটেরিয়ালস এর নাম লিখ।

৪। ফল ও সবজি বিপণনের জন্য পরিবহন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৫। ফল ও সবজি বিপণনের জন্য কি ধরনের সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য থাকা উচিত।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। ফল ও সবজি বিপণনের জন্য সর্টিং এবং গ্রেডিং এর প্রয়োজনীয়তা বর্ননা কর।

২। ফল ও সবজির উত্তম প্যাকেজিং-এর জন্য আবশ্যিক কার্যক্রমগুলো বর্ননা কর।

৩। ফল ও সবজি বিপণনের জন্য সঠিক পরিবহন নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট বিবেচনা করা হয় তা বর্ণনা কর।

সমাপ্ত

বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ জয়

২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এই জয় বাংলাদেশের ক্রিকেটে একটি স্মরণীয় সাফল্য। আকবর আলির অধিনায়কত্বে ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে এই শিরোপা অর্জন করে বাংলাদেশ দল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উচ্ছ্বসিত হয়ে জয়ী দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং এই জয়কে মুজিববর্ষে জাতির জন্য সেরা উপহার হিসেবে অভিহিত করেছেন।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-২

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য